সুখ দুঃখ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রেসিডেন্সী কলেজের
দর্শন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও
বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য

১৯৩২

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

কুন্তলীন প্রেস
৬১।২ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত

মাতৃ-চরণে

ভূমিকা

ইন্দীবরদলশ্যামমিন্দিরানন্দকন্দলম্।
বন্দারুজনমন্দারং বন্দেঽহং যদুনন্দনম্॥

বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি বা যে সকল বক্তৃতা দিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহার প্রায় সমস্ত গুলিই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহারা সে সময়ে তাঁহাদের সুপ্রথিত পত্রিকায় এ গুলিকে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বহুদিন পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা এখন হয়ত আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি না। তাহা হইলেও প্রবন্ধগুলি যথাযথ মুদ্রিত হইল। এখন যাহা আমার অভিমত, তাহাই যে ঠিক, এমন নাও হইতে পারে। মতামত যাহাই হউক, আমার বিশ্বাস যে সকল বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। সত্যের আলোচনা যত হয়, ততই ভাল। এই উদ্দেশ্য লইয়াই প্রবন্ধগুলি সযত্নে সঙ্কলিত হইল।

বালিগঞ্জ— লেখক

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

সূচী

সুখ দুঃখ

সুখ

কি সে আনন্দ যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি !

কোথায় সে আনন্দের প্রস্রবণ, যাহার ধারা চতুর্দ্দিকে উৎসারিত হইয়া এই সমগ্র চরাচর বিশ্বকে সুখময়, শান্তিময়, প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছে! যে দিন প্রথম প্রভাতে ইতস্ততঃ আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় নাই, যে দিন বিহগ-বিরাবে সঙ্গীতের কল-কাকলি শ্রুত হয় নাই, যে দিন গগনে, প্রান্তরে, শৈল-সিন্ধুতে, বন উপবনে আনন্দের বেণু-বীণা বাজে নাই, সেদিন বিশ্বসৃষ্টি তাহার প্রলয় রাত্রির জড়ত্ব পরিহার করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেদিন হয়ত সঙ্গীত ছিল, মধুরতা ছিল না; রূপ ছিল, প্রেম ছিল না; কুসুম ছিল, সৌরভ ছিল না; প্রাণ ছিল, কামনা ছিল না; চরিত্র ছিল, মহনীয়ত্ব ছিল না। তার পর এক দিন কোন এক শুভ-মুহূর্ত্তে কাহার ইচ্ছায় আনন্দের একটি ঢেউ বহিয়া গেল, আর অমনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন তড়িতের প্রভাবে কম্পিত, মুগ্ধ, অনুরণিত হইয়া উঠিল, ঈষদুদ্ভিন্ন দূর্ব্বাদল হইতে সুদূর গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত একটি দিব্য-

স্পন্দন অনুভূত হইল—সে স্পন্দন আনন্দের স্পন্দন, মহাপ্রাণের এক বিশাল বিরাট আনন্দোৎসব। যেখানে যাহা কিছু আছে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, নিকটে কি দূরে, ভূগর্ভে কি অন্তরীক্ষে, সকলেই সেই আনন্দ-সত্তার সংক্রামক স্পর্শে চঞ্চল ও বিচিত্র হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতে বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মরে কত ছন্দ কত সঙ্গীত, নদী তরঙ্গে কত বিচিত্র তান-লয়-লীলা, পতঙ্গের পক্ষপুটে কত নিপুণ বর্ণ-সমাবেশ, গগনের সীমাহীন বিশালতায় কত রহস্যপূর্ণ মহান্ ভাবের আবির্ভাব! সৃষ্টির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন রূপ, রস, সঙ্গীত, সৌরভের এক অমৃত বন্যা বহিয়া গিয়াছে!—আর তাহারই ক্ষুদ্র বৃহৎ লহরীগুলি ধরিবার জন্য মানবের চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র হইতে ব্যাকুলতা জানাইতেছে।

যখন বিশ্বস্রষ্টার চরণ হইতে আনন্দের পূত মন্দাকিনী ধারা উত্থিত হইয়া সমগ্র বিশ্বচরাচরকে স্নিগ্ধ, শীতল, সমৃদ্ধ করে নাই, তখন সে অন্ধতমসাচ্ছন্ন যুগে এক নীরব নিস্পন্দ প্রাণহীন বধিরতা বিরাজ করিত সন্দেহ নাই। আর তাহার পরে যখন সৃষ্টি-প্রণালীর চরম উৎকর্ষ স্বরূপ সমুদ্র-মন্থনের ফলে আনন্দ-সুধা উত্থিত হইয়াছিল এবং যখন ভগবান মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সে সুধা আপন হস্তে পরিবেশন করিয়া ছিলেন, * তখন সৃষ্টির সারভূত দেবকল্প মানব সেই অপার্থিব ব্রহ্মানন্দ সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহার পর হইতেই এবিশ্ব আলোক-সঙ্গীত-রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এবং যে সুস্থ সরল অনাবিল উত্তেজনা প্রাণের স্পন্দন বিধান

* "If there is anything in the world that is a gift of the gods to men, it is reasonable to suppose that happiness is a divine gift." Aristotle—Nicomachean Ethics.

করে, দিগ্‌দিগন্তে তাহার উদ্বোধন হইয়াছিল। প্লেটোর ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, যে সুখের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে মানবের আত্মা জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহারই ক্ষীণ স্মৃতি প্রতি পদে তাহাকে সেই সুখের অনুসন্ধানে ধাবিত করিতেছে।

জীব-জগতে জীবনের যে প্রথম অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাণের যে ক্ষীণ স্পন্দনটি অনুভূত হয়, তাহার মূলে সুখের প্রতি আগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচ্য দার্শনিকেরা ইহাকে বলিয়াছেন "জীবন-রক্ষা-প্রযত্ন"। এই যে প্রাথমিক যত্ন জীব জগতের অতি নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিতেছে, ইহা সুখের অভীপ্সা হইতে জন্মলাভ করিয়া সুখমাত্রে পর্য্যবসিত হয় না। জীবনের স্থায়িত্ব, বংশ পরম্পরার স্থিরত্ব এবং জগতে ও জীবে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য প্রত্যেক জীবের অন্তরে এই সুখের প্রবৃত্তি নিহিত রহিয়াছে। এই জীবন-রক্ষা-প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজীতে Instinct of self-preservation বলে, ইহা জীবমাত্রকে জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে, সে সংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত উদ্যম ও চেষ্টা প্রদান করে এবং পরিশেষে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সংঘটন করে।

এই যে অন্ধ অতীন্দ্রিয় প্রবৃত্তি, যাহা জ্ঞানের অন্তরালে ক্রিয়া করিয়া জীব জগৎকে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছে, ইহার মূল কোথায়, তাহা জানা যায় না। কোন্ অদৃশ্য রহস্যময়ী শক্তি যবনিকার অন্তরাল হইতে এই বিশ্ব সংসারকে সুখ-প্রবৃত্তির অচ্ছেদ্য সূত্রের দ্বারা এক বিপুল নৃত্যে নিয়োজিত করিতেছে, তাহা মানবের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিতন্ত্রের একটি সুবৃহৎ উদ্দেশ্য এই সুখ-চেষ্টা হইতে সংসাধিত হইতেছে। মধুমক্ষিকা যখন মধু

আহরণ ও সঞ্চয়ের জন্য অতি নিপুণতার সহিত তাহার রাষ্ট্র-তন্ত্র নির্ম্মাণ করে, ঊর্ণনাভ মক্ষিকা ধরিবার জন্য যে অপূর্ব্ব ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেপিয়া শত্রুর চোখে ধাঁধাঁ দিবার জন্য যখন তাহার শরীরাভ্যন্তরস্থ মসীর ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়, তখন আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে, এই সকল প্রাণ-হিতকর ব্যাপারের পশ্চাতে কোনও অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়া করিতেছে না। তাই বলিতেছিলাম, কি সে আনন্দ, যাহার এক কণিকা বিস্ফুলিঙ্গের মত প্রাণি-জগতে এক আশ্চর্য্য তুমুল চঞ্চলতা আনয়ন করিয়াছে! প্রাণ যদি কোন এক রূপ স্পন্দন মাত্র হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আনন্দই প্রাণ; কেননা আনন্দই সর্ব্ববিধ স্পন্দনের জনক।

এই অন্ধ সুখান্বেষণের রাজ্য অতিক্রম করিয়া যখন আমরা চৈতন্যোপহিত নৈতিক রাজ্যে প্রবেশ করি, তখন আমরা সুখেচ্ছার প্রভাব আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কারণ জীবজগতের নিম্নস্তরের ব্যাপার অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের অনুমানের বিষয়; নৈতিক জগতের ব্যাপার আমাদের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। মানবের নৈতিক জীবন যে সকল উপাদানে গঠিত হয়, তাহার মধ্যে সুখের স্থান অতি বৃহৎ। মানব জীবনে সুখেচ্ছা যে কি গভীরভাবে ক্রিয়া করে, তাহা আমাদের নৈতিক ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে অতি সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যায়। ইতর শ্রেণীর প্রাণিগণ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। তাহাদের অন্তরে সুখের প্রবৃত্তি, বাঁচিবার ইচ্ছা, আত্মরক্ষার চেষ্টা অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিয়া কোন্ এক বিশ্বপ্রাণের ধারা রক্ষা করিতেছে, কে জানে? এই সকল ইতর জীব খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবার জন্য কোনও স্বাস্থ্য-সমিতির উপর নির্ভর

করে না। এক দৈব শক্তি বলে তাহারা সাধারণতঃ হেয়কে বর্জ্জন এবং উপাদেয়কে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এমন কি শত্রুর আগমন পর্য্যন্ত বুঝিবার শক্তি ইহারা নিসর্গতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "বিমলং কলুষীভবচ্চ চেতঃ, কথয়ত্যেব হিতৈষিণং রিপুং বা।" প্রকৃতি এই সকল অজ্ঞ, মূক এবং বিচারহীন প্রাণিগণকে যে সম্পদ্ দিয়াছেন, মানব তাহা হইতে বঞ্চিত। বংশ পরম্পরানুক্রমিক দায়াধিকার অথবা Heredity এইখানে কেবল ব্যর্থ হয়। জীবজগতের সমস্ত সম্পদ্ই মানবে আসিয়া পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু এই নৈসর্গিক সংস্কার অগণিত জীব-ধারার মধ্য দিয়া মানবে আসিয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। অন্ধসংস্কারের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াই জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্য বাল্যে সংস্কার যতটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, যৌবনে তাহা অনেক কমিয়া আসে।

মানব জ্ঞানের দ্বারা, বিচারের দ্বারা, চৈতন্যের দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করিতে অভিলাষী, সেই জন্যই বোধ হয় প্রকৃতি অনেক সময় তাহার উপর বিরূপ। হাক্স্লী (Huxley) তাঁহার Evolution and Ethics নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে প্রকৃতি ও নৈতিক শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে জগতে ক্রিয়া করিতেছে, প্রকৃতি মানবকে নানা রূপে সংসার হইতে বিদায় করিয়া দিতে চাহে; মানব চিকিৎসা-শাস্ত্র উদ্ভাব করিয়া, চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রকৃতির ইচ্ছা ব্যাহত করিতে চেষ্টা করে। প্রকৃতি পদে পদে মানবকে বিপদে ফেলিতে চায়, মানব পরস্পরের সাহায্যকল্পে যৌথপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া, পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া, কূপতড়াগ খনন করিয়া নানামতে আপনাকে বিপদ্জাল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট। বিধাতার বিধানে জড়প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানবই জয়ী।

জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য মানবের যে অশ্রান্ত

চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহাও সুখানুসন্ধিৎসা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। মানব প্রতিনিয়ত তাহার আপনার সুখ বা পরের সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের সমস্ত কর্ম্মের মূলে এই সুখলালসা নিহিত থাকিয়া মানবজীবনকে এক বিশাল বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। সুখ-প্রবৃত্তির এই উষ্ণ প্রস্রবণ যেদিন শীতল হইয়া জমিয়া যাইবে, সেদিন মানবের সমস্ত চঞ্চলতা, সমস্ত ব্যস্ততা শান্ত হইয়া যাইবে। পরহিত-চেষ্টাকে সুখের চেষ্টা বলিয়া গণ্য করা যায় কি না, এ প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে উদিত হইতে পারে। তাহার উত্তরে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, পরহিত-সাধন প্রবৃত্তির মধ্যে এতটা আত্মসুখ অন্তর্নিহিত থাকে যে, এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা পরহিত-চেষ্টাকেও আত্মসুখ-চেষ্টার রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা বলেন যে, প্রথমতঃ মানব প্রত্যুপকারের আশায় পরের উপকার-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ যেখানে মানব নিজের সুখ বলিদান করিয়া পরের সুখ, দেশের কল্যাণ বা মানবজাতির হিতসাধনে যত্নবান হয়, সেখানেও সে মুখ্যভাবে নিজের সুখে ইন্ধন যোগাইতেছে। পরের জন্য আত্মবলিদান করিয়া যে সুখ, সেই পরম সুখের জন্য সে লালায়িত হইয়াছে!

অবশ্য আত্মসুখবাদিগণের এই যুক্তি-বল-সম্পন্ন কূটস্বার্থপর নীতির পক্ষপাতী না হইয়াও ইহা বলা যায় যে, আত্মসুখ-চেষ্টা এবং পরহিত-কামনা এই উভয় প্রবৃত্তির বীজই মানব প্রকৃতির মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে। সমাজবদ্ধ সমস্ত মানবের মন এক সুরে বাঁধা। তোমাতে আমাতে যে প্রভেদ, সে প্রভেদের সার্থকতা, সমগ্রতা ঐক্যে। তোমার সুখ এবং আমার সুখ যেখানে আমাদের মধ্যে পার্থক্য, বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা সম্পাদন করিতেছে, সেখানে আবার আমাদের মূল প্রকৃতিগত সাম্য, ঐক্য, অভিন্নতা আসিয়া মিলন, সন্ধি ও সখ্যের বন্ধন বাঁধিয়া দিতেছে। আমাদের

পরস্পরের সুখ, স্বার্থ, প্রয়োজনের নিম্ন দিয়া পরার্থপরতার অন্তঃসলিল বহিয়া যাইতেছে, তাই পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানব সমাজে একই চিন্তার ধারা প্রবাহিত হয় এবং একই প্রকার সুখ-দুঃখের স্পন্দন অনুভূত হয়।

স্বার্থকে আমরা যত বড় করিয়াই দেখি না কেন তাহার মধ্যে পরার্থ-চিন্তা অনেক বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এমন নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপরতা কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে কেবল নিজের সুখের কল্পনাই বিরাজ করে। মানুষ যখন মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে চলিয়াছে, তখনও সে নিজের চিন্তা অপেক্ষা পুত্র-কলত্রাদির চিন্তাতেই অধিক আকুল হয়। পুত্র-কলত্রাদির চিন্তাকে স্বার্থচিন্তা বলিয়া পরিগণিত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ প্রকৃত পরার্থ-চেষ্টা নিজের পরিবারের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে সমগ্র মানব-সমাজ এমন কি সমস্ত জীবজগৎকে আলিঙ্গন করিতে পারে।* সুতরাং আমরা যাহাকে স্বার্থ বলি, তাহা পরার্থপরতার প্রথম সোপান মাত্র। যে নিজেকে ভালবাসে না, যে নিজের সুখের মূল্য কখনও বুঝে নাই, সে যদি জগৎকে ভাল বাসিতে চায়, এবং পরের সুখানুসন্ধানে যত্নবান হয়, তবে তাঁহার সে চেষ্টা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। আমাদের অতি নিবিড় স্বার্থপরতার মধ্যেও যে পরার্থচিন্তা নিহিত রহিয়াছে, ইহা বিধাতার একটি অপূর্ব্ব বিধান। নিজের সুখ এবং পরের সুখ যদি সত্য সত্যই একান্ত বিরোধী হইত, তাহা হইলে সমাজ-প্রণালী কখনও গঠিত হইত না; সমাজ-প্রণালী অসম্ভব হইলে প্রকৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় মানব কখনও জয়লাভ করিতে পারিত না, এবং যেখানে মানব জীবনের চরিতার্থতা—সেই নৈতিক জীবনও সম্ভব হইত না।

* Charity begins at home.

কারণ নৈতিক জীবন মানবের সামাজিক নানাবিধ সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বার্থ ও পরার্থকে একান্ত বিরোধী কল্পনা করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কি বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা চরিত্র-নীতির পাঠকেরা অবগত আছেন। এইরূপ ধারণা হব্‌স্‌কে (Hobbes) স্বার্থবাদী করিয়া তুলিয়াছিল, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক স্পেন্সার প্রমুখ পণ্ডিতগণের চরিত্রনীতিকে জীবতত্ত্বে পরিণত করিয়াছিল।

বস্তুতঃ এই সকল প্রবীণ দার্শনিকগণের যুক্তির আড়ম্বরপূর্ণ অকৃতকার্য্যতা দেখিলে মনে হয় যে, স্বার্থ এবং পরার্থকে একবার বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে আর শত চেষ্টাতেও তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। পরন্তু যাঁহারা স্বার্থ এবং পরহিত এতদুভয়ের মৌলিক সংস্থান সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সকল আগন্তুক বাধা বিঘ্ন অনর্থ ঘটাইতে পারে নাই। মানব প্রকৃতির মৌলিক যোগ উপলব্ধি করিয়া কাণ্ট (Kant) অসাধারণ যুক্তিবলে এক অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। সে তত্ত্ব নৈতিক জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক বিধি এই যে, প্রত্যেকে যদি মনে করে যে তাহার কার্য্যটি সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় বা অনুষ্ঠান-যোগ্য, তাহা হইলে তাহার কার্য্য কখনও মন্দ হইতে পারে না। যাহা আমার পক্ষে বিধেয়, তাহা সকলের পক্ষেই বিধেয়, ইহা চিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে নীতিমার্গ হইতে স্খলিত হইতে হয় না।

বলা বাহুল্য যে, এই নৈতিক বিধির অনুসরণ করিলে স্বার্থের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না। কারণ স্বার্থ ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব; স্বার্থ সমস্ত জগৎ হইতে একজনকে স্বতন্ত্র করিয়া দেয়, মানুষে মানুষে বিরোধ ঘটাইয়া দেয়। কিন্তু প্রতি কার্য্যের সময় যদি মানুষ আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য

ভুলিয়া জন সাধারণ বা সমগ্র মানব সমাজের দিক দিয়া তাহার কার্য্যটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে দিব্য দৃষ্টির নিকট স্বার্থ, নীচতা, সমস্ত ব্যাহত হইয়া যায়। পরের দিক দিয়া নিজের কার্য্যের বিচার করিতে যাওয়া সব সময়েই যে সহজ, তাহা নহে। কেননা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে সকল উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-নিচয় অন্তর্জগতে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগকে দমন করিয়া নৈতিক জীবন বা ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ষড়্‌রিপুকে বশীভূত করা সহজ নহে। "স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।" সেই জন্যই কর্ত্তব্য এত কঠোর।

কর্ত্তব্যপালনে সুখ বা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, ইহা মনে করিয়া কার্য্য করিলে কাণ্টের মতে প্রকৃত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতা দেখান হইল না। কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে চলিবে না। যেখানে কামনা আছে, যেখানে সুখের চিন্তা আছে, যেখানে সঙ্কীর্ণতা আছে, সেখানে কর্ত্তব্যের জ্ঞান থাকিতে পারে না। এই সকল কামনা, আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তিকে বলিদান করিয়া, তবে জীবনে চরিত্রনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মনুষ্য-প্রকৃতির নিম্নভূমি পরিত্যাগ করিয়া উচ্চভূমিতে অধিরোহণ করিতে পারিলে; তবেই আমরা কর্ত্তব্যের সন্ধান পাই। যে নৈতিক অনুশাসন আমাদিগকে সকলের দিক হইতে নিজ নিজ কার্য্য বিচার করিতে প্রণোদিত করিতেছে, তাহাও আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন অশান্ত কোলাহলময়ী প্রবৃত্তিরাজি বিরাজ করিতেছে, তেমনই অপরদিকে কর্ত্তব্যের বিমল স্নিগ্ধ আলোক মানব চরিত্রকে চিরগৌরবময় করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য জার্ম্মাণ দার্শনিক নৈতিক বিধির গৌরব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন যে, জগতের মধ্যে দুইটি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে

বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়,—উপরে নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ এবং অন্তরে চরিত্রনীতির বিধি।

কাণ্টের এই নৈতিক বিধির মূলে আমরা দেখিতে পাই, সমগ্র মানবমণ্ডলীর মূলতঃ ঐক্য-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই মৌলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কাণ্ট্ মানবপ্রকৃতির একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ;—নৈতিক রাজ্য হইতে সুখ দুঃখকে একেবারে নির্ব্বাসিত করা আবশ্যক হইয়াছিল। এইজন্য কাণ্টের চরিত্রবিজ্ঞান নীরস এবং কঠোর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুখকে বিদায় দিলে চারিত্র-দার্শনিকের কার্য্য সহজ হইতে পারে, কিন্তু সুখস্বাদবিহীন মানব-চরিত্র রক্তমাংস-বিবর্জ্জিত কঙ্কাল মাত্রের কল্পনার ন্যায় হইয়া পড়ে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানব যন্ত্র নহে—মানবজীবন স্থিতিশীল নহে, পরন্তু গতিশীল। এই গতিশীলতার মূলে সুখের উপলব্ধি বিরাজ করিতেছে। সুতরাং সুখকে বাদ দিয়া চরিত্রনীতির কল্পনা অস্বাভাবিক। কাণ্ট্‌কেও প্রকারান্তরে এই কথা পরিশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি যখন দেখিলেন যে, যদি ধার্ম্মিক এবং চরিত্রবান্‌দিগের কঠিন এবং দুঃখ-বহুল পরীক্ষার কিছু পুরস্কার না থাকে, তবে এই নৈতিক রাজ্য বিফল হইয়া যায়, তখন তিনি নৈতিক জীবনের পুরস্কার স্বরূপ সুখের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নৈতিক জীবনের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া আমরা যখন ধর্ম্মতত্ত্বের অবাধ ক্ষেত্রে উপনীত হই, তখনও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় মানবের কল্পনায় আমরা সুখের প্রভাব দেখিতে পাই। প্রাকৃতজন পৃথিবীর নানাবিধ দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া কল্পনার বিচিত্র বর্ণে তাহার পরলোক রচনা করে। যখন সাধারণ মানব দুঃখের ক্লেশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভগবানের বিচারের

উপর একান্ত নির্ভর করে, তখন সে মনে করে যে, ভগবান্ পরকালে অবশ্য ইহার প্রতিকার করিবেন; ইহজীবনের এই চিরন্তন নির্ম্মম অসামঞ্জস্যকে তাঁহার ন্যায় বিচারে ও অসীম করুণায় সমঞ্জসীভূত করিয়া দিবেন। পরকালে পুত্রহীনা তাহার পুত্রের মুখ দেখিতে পাইবে, পতিবিয়োগবিধুরা তাহার পতির সহিত মিলিত হইবে, আজন্ম-শত্রুতা-সাধন-প্রয়াসী তাহার স্বভাবজ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া সখ্যভাব অবলম্বন করিবে—এই সকল সুখের কল্পনার দ্বারা আমাদের পরলোক রচিত! পূর্ব্ব-মীমাংসাকার অসংখ্য যাগযজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন করিয়া এই পার-লৌকিক সুখ অথবা স্বর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন ঃ—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদং।

যেখানে দুঃখের ছায়া-কালিমায় সুখকে মলিন করে না, যেখানে সুখের পর অবশ্যম্ভাবী দুঃখ আসে না, যেখানে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করে, সেই সুখ নিকেতনই হিন্দুর স্বর্গ। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই স্বর্গ লাভ করা যায়। কিন্তু স্বর্গের এই সংজ্ঞাটির মধ্যে যেন একটি করুণ সুর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। জীবনের ক্ষণিক এবং দুঃখ-সম্ভিন্ন সুখে মানব তৃপ্তিলাভ করে না। যখন তাহার অতি প্রিয় বাসনাগুলি কাচের বাসনের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়া তাহার পরলোক সাজাইয়া লয়। ইহজীবনে যে সকল কামনা অতৃপ্ত রহিয়া যায়, পরজীবনে তাহা তৃপ্ত হয়; ইহলোকে যে ন্যায়-বিচার প্রতিহত হয়, পরলোকে তাহার সম্পূর্ণতা হয়; এখানে যে নৈতিক রাজ্য সংশয়াচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, সেখানে তাহা সনাতন ধ্রুব সত্যরূপে পরিণত হয়;—ইহাকেই মানবের সুখ-কামনা স্বর্গ বা পরলোক

নামে অভিহিত করে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে পরলোকের কল্পনায় এই সুখের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বমীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া মার্টিনো (Martineau) পর্য্যন্ত কেহই সুখের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

অবশ্য সকল দার্শনিকই যে পরলোকের এবম্বিধ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি না। যাঁহারা স্বর্গ অপেক্ষা মোক্ষের জন্য বেশী লালায়িত হইয়াছেন, অথবা নির্ব্বাণের সর্ব্ব প্রকার দ্বৈতশূন্য অনির্ব্বাচ্য চরম বিলয় কামনার বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পনার মধ্যেও সুখানুসন্ধিৎসার লেশ যে না দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নহে! তুমি ইহজীবনের ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহ, তুমি জগতের ক্ষণিকত্ব ও দুঃখ-বাহুল্য দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল অতিক্রম করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছ; তুমি দেশকাল-সীমা অতিক্রম করিয়া মায়ার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরব্রহ্মে আপনাকে মিলাইয়া দিতে চাহ,—তোমার এ সমস্ত কামনা, সমস্ত কল্পনার মধ্যে দুঃখ-বর্জ্জন ও সুখ-প্রাপ্তির আশা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! বস্তুতঃ ষ্টোয়িকগণ (Stoics) যখন জীবনের দুঃখসত্ত্বার উপলব্ধি করিয়া সুখের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, মধ্যযুগের মঙ্ক (monk) গণ বা আমাদের সন্ন্যাসীরা যখন জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, কাণ্ট যখন নীতিসূত্রের গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য সুখের আশায় দোষারোপ করিয়াছেন, তখন সে সকলের মূলে যে সুখ-শান্তি-লিপ্সা—অন্ততঃ দুঃখ-পরিহার-বাসনা—প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে?

এতক্ষণ সুখের প্রভাব সম্বন্ধেই বলিয়াছি; সুখ নহিলে, সুখের কামনা না থাকিলে যে সংসার চলে না, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। জীব-জগতের বিভিন্ন স্তর, চরিত্রনীতির উপ-

ত্যকা এবং ধর্ম্মনীতির অত্যুচ্চ শিখর সমস্তই সুখের তীব্র, শান্ত অথবা স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত। জীবের প্রথম জীবন-ব্যাপার হইতে মানবের যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুখলালসার পরিচয় বিদ্যমান। কিন্তু, কি সে সুখ, কি সে আনন্দ, যাহার অন্বেষণে সমগ্র জীব-জগৎ এমন ভাবে চঞ্চল ?—যাহার কিরণপাতে চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির ন্যায় জীবের কর্ম্মপ্রপাত শত তরঙ্গভঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে ?

সুখ যে কি, তাহা অনুভব করা সহজ, কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা সহজ নহে। যাহা অনুভবের বিষয়, তাহাকে ব্যক্ত করা সকল সময়ে সম্ভবপর নহে। আমরা সকলেই জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে সুখের আস্বাদ পাইয়াছি, সকলেই জানি সুখ কাহাকে বলে। সেইজন্য কখনও দুঃখ পাইলে, সুখ পাইয়াছি মনে করিয়া হাসিয়া আকুল হই না। সুখ কি, এ বিষয়ে কোনও দার্শনিক সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারুন বা না পারুন, অতি নিরক্ষর ব্যক্তিও আপনার হৃদয়ের কাছে এ প্রশ্নের অতি সরল, সুন্দর, সংশয় শূন্য মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুখ সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ হইলেও সুখের প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ নহে। আমাদের মধ্যেই হয়ত কেহ অর্থ, কেহ পদগৌরব, কেহ বিদ্যা কেহ ধর্ম্ম ভালবাসেন। কেহ কর্ম্মে পর্য্যাপ্ত সুখ পান, কেহ চুপচাপ পড়িয়া থাকিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করেন; কেহ পরের সেবা শুশ্রূষা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, কেহ ভোজনেই জীবনের সারসুখ অনুভব করেন। সুতরাং সুখের স্বরূপ, সম্বন্ধে একটী সার্ব্বজনীন অথচ অভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যিনি পরমার্থ-চিন্তায় আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন, দেহের তৃপ্তি বা ইন্দ্রিয়ের যে চরিতার্থতাকে প্রাকৃতজন

সুখের বিষয় বলিয়া মনে করে, তিনি তাহাকে দুঃখের আকর বলিয়া গণ্য করিবেন। সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে শুধু যে প্রাকৃতজনের মন সংশয়াপন্ন, তাহা নহে। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও এ বিষয়ের মীমাংসায় যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক বলেন,—

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

এপিকিউরিয়াস বলেন, Eat, drink and be merry. স্পেন্সার বলিবেন যে, যাহা জীবনের বিবৃদ্ধি সম্পাদন করে, তাহাই সুখ; যাহা জীবনের অন্তরায়, তাহাই দুঃখ। অনুকূল-বেদনীয়ং সুখং, প্রতিকূল-বেদনীয়ং দুঃখং—ইহা ভারতীয় ঋষির সিদ্ধান্ত। কাণ্ট্ বলিবেন কর্ত্তব্যপালনই সুখ। ধর্ম্মজীবনের পুরস্কার স্বরূপ বিধাতাই এই সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন!

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ, তস্মাৎ ধর্ম্মপরো ভব॥

চরকের মতে "সুখানাং কারণং সমঃ" অর্থাৎ "কালবুদ্ধীন্দ্রিয়া-র্থানাং সমযোগঃ সুখানাং কারণং।" যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মনের, প্রবৃত্তির সঙ্গে জ্ঞানের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সমযোগ বা সামঞ্জস্য আছে, সেইখানেই সুখ। শ্রুতি একস্থলে পাপপুণ্যাতীত সাম্যের অবস্থাকেই চরম উৎকর্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যং উপৈতি।
(মুণ্ডকোপনিষৎ)

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন যে Equilibrium is the state of pleasure. বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে এই সামঞ্জস্যকেই ধর্ম্ম-জীবনের বা চরিত্রনীতির চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবৃত্তিসকলকে একেবারে নিগৃহীত, নিপীড়িত না করিয়া যদি তাহাদের অনুশীলনে একটা

সামঞ্জস্যের ভাব সংস্থাপিত করা যায়, তবেই জীবনের চরম সফলতা-লাভ হয়। যেখানে এই সামঞ্জস্যের ভঙ্গ হয়, সেখানেই দুঃখ, সেখানেই নিষ্ফলতা। শরীরের সকল অংশের ক্রিয়ার মধ্যে যখন একটা সামঞ্জস্য থাকে, তখন যেমন তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায়, তেমনই সকল প্রকার সামঞ্জস্যকে সুখের অবস্থা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানব-মনের সামঞ্জস্যকে স্পেন্সারও সুখের কারণ বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু এই সামঞ্জস্য ত সব সময়ে ঘটিয়া উঠে না। যেখানে আমরা পরের প্রত্যাশী, যেখানে আমরা বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হই, সেখানে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা কোথায়? সেই জন্য মনু ব্যবস্থা করিলেন—

সর্ব্বমাত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।

যে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে না, যে সর্ব্বতোভাবে আপনার ক্ষুদ্র সংসার আপনি গঠন করিয়া লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে, সে প্রকৃতই সুখী। যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে এই কথাই বলিয়াছিলেন,—

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে জাতি পরবশকে দুঃখের নামান্তর বলিয়া মনে করিত, তাহারাই নাকি স্বাধীনতার স্পৃহা ইয়ুরোপ হইতে শিক্ষা করিয়াছে! যে জাতি আত্মবশের মন্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছিল, তাহারা যে স্বার্থ-সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্যাভিলাষী অন্য জাতির নিকট স্বাধীনতার গৌরব শিক্ষা করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে ভারতে এই আত্মবশের সূত্র কেবল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। সর্ব্ব প্রকারে পরের এবং জগতের নিরপেক্ষ হওয়াই এদেশে কামনার বস্তু বলিয়া

পরিগণিত হইয়াছিল। এই আত্ম-তন্ত্রতা এখানে কোন দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা শঙ্করাচার্য্যের সুখের কল্পনা হইতে বুঝিতে পারা যায় :—

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

সুখকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত করিবার চেষ্টা, এত অল্পে সন্তুষ্ট হইবার কল্পনা অন্য কোনও দেশে, অন্য কোন জাতির মধ্যে এমন ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল কিনা আমি জানি না।

সুখের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে এই বৈরাগ্যতত্ত্বটিকেই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ না করিলেও, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে জাতি সুখের এই তত্ত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে, দারিদ্র্য তাহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, নিরাশা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, পরাধীনতা তাহাকে ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত করিতে পারে না, এবং দুঃখ তাহার প্রাণের শান্তি হরণ করিতে পারে না।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে বোধ হয় এরিষ্টট্‌ল সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মকে সুখের সাধন বলিয়া মনে করেন। জীবগণ কর্ম্ম হইতে প্রভূত আনন্দ লাভ করে। তবে চৈতন্যধর্ম্মী মানবের পক্ষে কর্ম্মমাত্রই সুখের আকর নহে; এরিষ্টটলের মতে ন্যায়ানুমোদিত কর্ম্মই মানবের সুখের প্রকৃত নিলয়।

দার্শনিকদিগের এই দ্বিধাসন্দেহাকুল বিচার বিতর্কের রাজ্য হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সুখের আকাঙ্ক্ষা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়। সাধারণ নিম্নশ্রেণীর জীবগণ আহার বিহার ভোজনেই সুখ

লাভ করে এবং এই সকল ব্যাপারে তাহাদের যে শক্তি নিয়োজিত হয়, তাহাও সুখের অন্যতম কারণ। বস্তুতঃ জীবনের অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতে যে কর্ম্ম-প্রবণতা বা Impulse বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার চরিতার্থতাই সুখের একটি প্রধান কারণ। ক্ষুৎ-পিপাসা ও যৌন-সম্মিলন-চেষ্টায় প্রাণিগণ নিয়ত যে পরিশ্রম বা কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ফলের নিরপেক্ষ ভাবেই তাহাদের সুখোৎপাদন করে। এই সকল কর্ম্মে তাহাদের যে শক্তিটুকু নিয়োজিত হয় না, তাহা তাহারা ক্রীড়ায় নিয়োজিত করে। উদ্দেশ্য-বিহীন শক্তি-বিকাশে যে আনন্দ হয়, জীবগণের তাহাই ক্রীড়ার আনন্দ। ভ্রমর অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার অতিরিক্ত শক্তিটুকু সার্থক করে, এবং তাহাতেই তাহার সুখ। এইরূপ উদ্দেশ্যশূন্য শক্তির লীলা হইতেই সম্ভবতঃ সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জন্ম গ্রহণ করে। মধুমক্ষিকার চক্রনির্ম্মাণ-চাতুর্য্য, পতঙ্গের আলোকান্বেষণ এবং আদিম মানবের শরীর-চিত্রণ—এ সকলই জীবগণের অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক শক্তির লীলা।

মানবের আনন্দোপভোগের মধ্যে জ্ঞানের সম্পর্ক আছে। মানব ইতর প্রাণীর মত শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিতে সন্তুষ্ট নহে,। সর্প সুর শুনিয়া মুগ্ধ, পতঙ্গ আলোকরশ্মি দেখিয়া আত্মহারা, পাপিয়া জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যে বিহ্বল; কিন্তু ইহারা চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তিতেই নিমগ্ন। মানব সুর শুনিয়া সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু সুরের মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে সে অর্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, ভাবের অন্বেষণ করে; মানব শুধু আলোক-রশ্মি দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় না, সে তাহার ভাবনা দিয়া সেই আলোক-রেখাকে উপভোগ্য করিয়া লয়। কুপার (Cowper) তাঁহার অগ্নিকুণ্ডের অস্ফুটালোকে কল্পনায় কি সুন্দর নৃত্যই দেখিয়াছিলেন।

জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যে পাপিয়ার ন্যায় মানবও বিভোর হয়। কিন্তু সে কেবল চক্ষুর তৃপ্তি নহে। সেই মধু-যামিনীতে, জ্যোৎস্না নিশীথে তাহার সমস্ত মন প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহার সমস্ত কাব্য কবিতা সেই চন্দ্রকিরণ-প্লাবিত নৈশ গগনে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠে; আর সে জোছনা সুরার মত তাহার শিরায় শিরায় বহু কোমল স্মৃতিবিজড়িত মধুরতার সঞ্চার করিয়া দেয়।

মানবের উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে এই তিনটি প্রধান; প্রকৃতি, শিল্পকলা এবং সঙ্গীত। এই তিনটিই ইন্দ্রিয়ের উপাদান লইয়া নির্ম্মিত, কিন্তু মানবের কল্পনা এবং চিন্তার প্রাণময় স্পর্শ সেই সকল উপাদানকে অনুপ্রাণিত করিয়া লয়, এই খানেই ইতর প্রাণী এবং মানবের সুখের পার্থক্য। ইতর প্রাণী ইন্দ্রিয়ের দাস, ইন্দ্রিয়ের উপরে সে উঠিতে পারে না। মানব ইন্দ্রিয়কে নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের অর্জ্জিত বিষয় মনের মত করিয়া গড়িয়া লয়। সকল জাতিই অল্পাধিক পরিমাণে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, শিল্প-চাতুরী এবং সঙ্গীতের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়। স্বভাব-শোভা যে আদরের বস্তু, উপাসনার বস্তু, কামনার বস্তু তাহা ইয়ুরোপে রুসোর (Rousseau) পূর্ব্বে লোকে ভাল করিয়া বুঝিত না। গ্রীকেরা মানবের রূপ লইয়া ব্যস্ত ছিল এবং তাহাতেই নানাবিধ ভাব সন্নিবেশ করা সৌন্দর্য্য-পূজার শ্রেষ্ঠ আয়োজন বলিয়া মনে করিত। হিন্দুদের মধ্যে স্বভাব-শোভার অনুভূতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আমাদের আত্মপ্রসাদে বাধা জন্মায়।* ম্যাক্সমুলারের মতের সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত; তবে আমার মনে হয়, যে আমাদের

* "The idea of the Beautiful in Nature did not exist in the Hindu mind. It is the same with their descriptions of human beauty.

সাহিত্যে এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার মত উপাদান যথেষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রূপের উপলব্ধি সম্বন্ধে হিন্দুদের স্থান যতই নিম্নে হউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উপনিষদের যুগ হইতেই হিন্দুরা শিব ও সুন্দরকে অভিন্ন ভাবে দেখিতে পারিয়াছিলেন। শিব অথবা মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের সামঞ্জস্য না হইলে, রূপের সঙ্গে ধর্ম্মের মিলন না ঘটিলে, সে রূপ ব্যর্থ। অবশ্য মঙ্গল কাম্য, এবং রূপ ভাব্য বস্তু। যাহা মঙ্গলজনক, তাহা আমাদের ইচ্ছা বা কামনাকে প্রলুব্ধ করে, আর যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, তাহা আমাদের ভাবনা বা চিন্তাকে অধিকার করে। * কিন্তু ভাবনার সহিত যেখানে কামনার মিলন, চৈতন্যের সহিত যেখানে প্রকৃতির যোগ, সেই-খানেই প্রকৃত রূপের গৌরব।

Beauty, Good and Knowledge are three sisters
That dote upon each other, friends to man,
Living together under the same roof
And never can be sundered without tears.

Tennyson

সত্যং শিবং সুন্দরং—এ তিনের মিলন মানবের মনে যে অভাবনীয় আনন্দের সৃষ্টি করে, তাহা মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু। মানব-প্রকৃতির ত্রিবেণী এইখানে। মানব প্রকৃতির ত্রিধারা,—জ্ঞান, সুখদুঃখানুভব এবং ইচ্ছা,—বিভিন্ন পথ বাহিয়া এই সত্য-মঙ্গল-সুন্দরে আসিয়া সঙ্গত হয়। এইখানেই আমাদের প্রকৃতির মূল ঐক্য পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হয়।

* The good is the object of desire, beauty arises from contemplation.

সেই জন্যই কি আমরা সত্য-শিব-সুন্দরের শ্রেষ্ঠ উপাদান লইয়া আমাদের চরম আদর্শ কল্পনা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকি? অবশ্য জীবের প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের কল্পনা, সত্য এবং মঙ্গলের ধারণা অপেক্ষা মৌলিক। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি যত শীঘ্র অভিব্যক্তি লাভ করে এবং যত সহজে আনন্দ দান করিতে পারে, এত আর কিছুতেই পারে না। কীট্‌স্ (Keats) যখন বলিয়াছিলেন "a thing of beauty is joy for ever" অথবা কালিদাস যখন "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" কত অজ্ঞাত অতীত জন্মজন্মান্তরের সুখস্মৃতি-উদ্দীপনের কথা বলিতেছেন, তখন তাঁহারা কবির ভাষায় এক সার্ব্বজনীন সৌন্দর্য্যকামনার প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র। রূপ এবং সঙ্গীত আমাদের জীবনে সুখের অনন্ত প্রস্রবণ বহাইয়া দেয়।

কিন্তু জীবনে যদি এত সুখ, এত আনন্দ, তবে 'জীবন দুঃখময়' ইহা কে বলিল? এত সুখের উপাদান থাকিতে, এত রূপরসস্পর্শ-সঙ্গীত থাকিতে জীবন কেন দুঃখময় হইল? সুখের গান গায়িতে গায়িতে কি আমরা এতক্ষণ দুঃখের গীত ভুলিয়া ছিলাম? কল্পনার সুবর্ণখচিত পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া কি আমরা এতক্ষণ বাতাসে সুখের স্বপ্ন স্বপন করিয়া বেড়াইতেছিলাম?

সুখ এবং দুঃখ উভয়ই জীবনের নিত্য-সহচর। সুতরাং দুঃখকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া জগৎটাকে এক বিপুল তামাসা মনে করিয়া হাসিয়া আকুল হইলে চলিবে না। কিন্তু কেহ কেহ সত্য সত্যই মনে করেন যে, জীবনে শুধু সুখ, শুধু গান, ফুলের বাস, চাঁদের আলো, আর জগৎ শুধু সুখাদ্য সুপেয়ের উন্মুক্ত ভাণ্ডার। জীবনের কয়টা দিন বেশ হাসিয়া খেলিয়া হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া, স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মিছে কেন হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল! দুঃখের কথা

না ভাবিলেই হইল। যাহারা দুঃখ দুঃখ করিয়া নিরর্থক জীবনকে বিস্বাদ ও তিক্ত করিয়া তুলে, তাহারা কি হতভাগ্য। সুখের চিরন্তন প্রপাতের মধ্যে যদি দুঃখের উপলখণ্ড থাকে, থাক না। অবগাহন করিতে গিয়া চরণে যদি বাজে, অঙ্গ যদি ক্ষত বিক্ষত হয়, হইলই বা; সুখের সুশীতল স্পর্শে সে সব ভুলিয়া যাইবে। তাহা না হইলে, কাল যাহার একমাত্র পুত্র সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আজ আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে কি করিয়া? আজ যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে, কাল আবার সে সকল ভুলিয়া কলহ-কোলাহল-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয় কি করিয়া? লোকের ব্যবহার দেখিয়াও কি বুঝিতে পার না যে, সুখের অমিয় বারি সকল ক্ষত আরাম করিয়া দেয়, সকল বেদনা ভুলাইয়া দেয়?

আবার কেহ কেহ বলেন যে, জীবনে শুধু দুঃখ, শুধু ক্লেশ, শুধু অশ্রু আর ব্যথা। এ জগতে আশা কখনও পূরে না, বিরহ ভিন্ন প্রেম মিলে না, হাহাকার ঘুচে না। জীবন যেখানে মৃত্যুর কালিমায় পরিম্লান, সখ্য যেখানে ঈর্ষায় কাতর, রোগ শোক দারিদ্র্য যেখানে শত ফণা তুলিয়া মানব জীবনকে দংশনে দংশনে ক্ষত বিক্ষত করিতে উদ্যত, সেখানে সুখের কাহিনী উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় বোধ হয় না কি? দুঃখের অধারাবর্ষদুর্দ্দিনে সুখের ক্ষণিক আলোকে যে বিহ্বল হয়, সে বাতুল বই আর কি? জীবনের দুঃখময় মরুর মধ্যে সুখের মরীচিকা দেখিয়া মানব ভ্রান্ত হয়। ওমর খাইয়মের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,

দুদিনের তরে এ জগতে বাস,
লাভ শুধু ব্যথা যাতনা আর,
দুঃখ মাঝে আসি মৃত্যু করে গ্রাস,
জীবনের ধাঁধা ঘুচে না আর।

জীবন শুধু, "a moan, a sigh, a sob, a storm, a strife" (Edwin Arnold) আর কিছুই নহে।

এ দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ মনীষিগণ জগতের অসারতা ও জীবনের দুঃখাচ্ছন্নতা কিরূপভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের ভাষায়, আমাদের চিন্তায়, আমাদের আচারে, ঐ দুঃখেরই আভাস বিদ্যমান দেখিতে পাই। কেমনই যেন আমাদের সুখ-বিলাস-তৃপ্তির মধ্যে দুঃখেরই সুর থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে। মানুষের সামাজিকতা, সখ্য, সহানুভূতি, সব যেন দুঃখের আতপত্রতলে উদ্ভূত, পুষ্ট, ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধারণতঃ মানুষের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুখ যেখানে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে, দুঃখ সেখানে মিলন ঘটাইতেছে এবং পূর্ব্ব বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া বাঁধিতেছে। দুঃখ পরস্পরের মধ্যে এমনই করিয়া নূতন নূতন সহানুভূতির বন্ধন সৃষ্টি করে বলিয়া আমরা সুখ অপেক্ষা দুঃখকে ব্যক্ত করিতে ভালবাসি। সেইজন্য কবি গায়িয়াছেন :—

"সুখের দিনে তোমারে ডাকি পরাণ মন ভরে না
দুখের দিনে আপনা ভুলি' করি তোমারে কামনা।"

সুখ লোকের দৃষ্টি সহে না। সুখ সব সময়েই কিছু শঙ্কিত, সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত। সুখ বিরলে উপভোগ্য, আপনাতে আপনি নিমগ্ন। দুঃখ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বড় ভালবাসে; দুঃখ কিছু গর্ব্বিত, উন্নত এবং মুক্তকণ্ঠ। সে আপনাকে প্রকাশ না করিতে পারিলে যেন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। কিন্তু ইহাতে সুখ অপেক্ষা দুঃখই যে প্রকৃত পক্ষে পরিমাণে বেশী, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। সুখ ও দুঃখ লইয়া সংসার; যাঁহারা সুখের দিকটাই দেখেন, আনন্দে যাঁহাদের হৃদয় ভরপুর, তাঁহারা দুঃখকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন না; আর যাঁহারা দুঃখকেই

বেশী করিয়া দেখেন, তাঁহাদের প্রাণ বৈরাগ্যের ভাবে উদাস হইয়া পড়ে। সুখ বা দুঃখের দিক দেখা অনেক সময়ে মানুষের প্রকৃতিগত বৈষম্যের উপর নির্ভর করে। কেহ কেহ স্বভাবতঃই চারিদিকে জগতের সুখসম্ভার দেখিতে অভ্যস্ত; কেহ বা আবার স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র দুঃখের ছায়ায় ম্রিয়মাণ। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, ভারতের বিচারালয়ে বৈরাগ্যবাদীরই চিরদিন জয় হইয়াছে।

ভারতীয় দুঃখবাদের একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রায় অধিকাংশ স্থলে এই দুঃখবাদ আনন্দের এক অভিনব কল্পনায় চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ দুঃখের কঠোরতা সম্যক উপলব্ধি করিয়া থাকিলেও সুখের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্বর্গের কামনায়, মুক্তির কল্পনায়, অমৃতের ব্যাখ্যানে, ঈশ্বর-নির্ভরে, হিন্দুর সুখবাদ দুঃখের বিশাল বিপুল ঘনঘটার প্রান্তে রজত রেখার ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বর-বিশ্বাসী মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে একান্ত দুঃখবাদ গ্রহণ করা অসম্ভব। যে ঈশ্বরের বিধানে আস্থাবান, তাঁহার ন্যায় বিচারে অসন্দিগ্ধচিত্ত, যে পরলোকের আশায় ইহলোকের সুখে জলাঞ্জলি দেয়, সে কখনও দুঃখবাদী হইতে পারে না। দুঃখবাদীর প্রধান যুক্তি— মৃত্যুর করাল ছায়া—ঈশ্বর-বিশ্বাসীর নিকট তুচ্ছ। বিশ্বাসী মনে করেন যে, মৃত্যু অনন্ত সুখের দ্বার স্বরূপ। মৃত্যু সকল সময়েই যে শোকাবহ, এ কথা একান্ত দুঃখবাদীও বোধ হয় স্বীকার করিবেন না। আর্ত্ত, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষকাতর, চিররুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অনেক সময় মঙ্গলের নিলয়। বাঁচিয়া থাকিতে সকলেই চাহে। কিন্তু সে কি কেবল সুখের জন্য? যখন জীবনে আর স্পৃহা থাকে না, হৃদয়ে আর আশা

থাকে না, শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, যখন সংসার কারাগার বলিয়া বোধ হয়, তখন এই কারা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র পথ মৃত্যুকে যে লোকে ভয় করে, সে কি শুধু দুঃখের ভয়ে? লিটন (Lord Lytton) তাঁহার Last Days of Pompeii নামক বিখ্যাত উপন্যাসে এক জীর্ণ কঙ্কালসার কুরূপা রমণীর মুখ দিয়া ইহার উত্তর দিয়াছেন। সে বলিতেছে "আমি যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি তাহা নহে; বাঁচিয়া আমার আর সুখ নাই; কিন্তু মরিতেও চাহি না। মরণের পরে কি আছে, কেহ ত জানে না। মরিতে তাই বড় ভয় হয়।" কথাটি বড় সত্য, মৃত্যুর বিভীষিকা অনেক কমিয়া যাইত, শুধু যদি লোকে জানিত যে, মরণের পরপারে কি আছে! সে পথের পথিক ত কেহ ফিরিয়া আসে না—তাই এত ভয়।

কিন্তু ঈশ্বরে যে নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে, আত্মার স্বরূপ যে জানিয়াছে, মৃত্যুর চিন্তা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। একজন সাধক কবি গাহিয়াছেন:—

আমার শ্মশান বলে' কিবা ভয়?
শ্মশান রঙ্গিনী শ্যামা মোর জননী
শ্মশানবাসী আমার পিতা মৃত্যুঞ্জয়॥

* * * *

মাকে মা বলিতে ধায় না যাদের চিত
পেতে পারে ভয় তাহারা নিশ্চিত
তারা-তনয় যারা তারা ত নয় ভীত
দেখে তোর দম্ভ রে দুরাশয়॥ গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী

ঈশ্বর-বিশ্বাসী দুঃখকে অত বড় করিয়া দেখেন না; কারণ তিনি জানেন যে, বিশ্বসৃষ্টি এক মঙ্গলময় বিধাতার লীলা; দুঃখ ইহাকে আশ্রয় করিবে কেমন করিয়া? এপিক-

টেটস্ বলিয়াছেন, "ভগবান আমাদিগকে সুখী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন; দুঃখ আমাদের নিজের দোষে আসে।" সেনেকা একস্থানে মানব জীবনে সুখের আধিক্য দেখাইয়া বলিয়াছেন, "তোমায় যদি কেহ কয়েক বিঘা ভূমি দান করে, তুমি সেটা লাভ বলিয়া মনে কর না? এই যে সীমাহীন ধরণী তোমার বাসের জন্য রহিয়াছে, ইহা যে একটি পরম লাভ, তাহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? কেহ যদি তোমাকে টাকা দেয়, তুমি সেটা একটা উপকার বলিয়া মনে কর; ভাল, ভগবান যে স্বর্ণ রৌপ্যের অনন্ত ভাণ্ডার তোমারই জন্য ধরণীর বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তুমি যদি মর্ম্মর-খচিত, বিবিধ বর্ণে চিত্রিত একখানি বাসভবন পাও, তাহা হইলে তুমি তাহা সামান্য লাভ বলিয়া গণ্য কর না। বিধাতা তোমাকে এমন একটি প্রাসাদ দিয়াছেন, যাহা অগ্নি বা ধ্বংসের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত নহে, যাহার ছাত দিবা ও রাত্রি-কালে বিভিন্ন প্রকারের শোভা ধারণ করে।"

রামপ্রসাদের অমর সঙ্গীতটি মনে পড়ে,

"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
দুখ নয় মা দয়া তোমার জেনেছি মা দুখহরা।"

ঈশ্বর-বিশ্বাসী আস্তিক এমনই করিয়া সহস্র দুঃখের মধ্য হইতে সুখের উপাদান সংগ্রহ করেন।

ভারতীয় ধর্ম্ম সমূহে যে দুঃখবাদের এত প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ আমার বোধ হয় এই যে, ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব শুধু যে দুঃখবাদকে অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা নহে, ঈশ্বরে বিশ্বাসও শিথিল করিয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধ-যুগে দুঃখবাদ যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহারই প্রতিধ্বনি আস্তিক চিন্তারাশির মধ্য দিয়া আমরা আজিও শুনিতে পাই।

সুখবাদ এবং দুঃখবাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস এ স্থানে প্রদান করা অসম্ভব। তবে সুখের প্রসঙ্গে দুঃখের কথা না উঠিয়া পারে না। সুখবাদকে আমরা যতই বিশ্বাসের সহিত চাপিয়া ধরিতে চাহিনা কেন, দুঃখবাদ যেন চারিদিক হইতে তাহার উষ্ণশ্বাসে আমাদের সে বিশ্বাসকে মলিন করিয়া দিতে চায়। আমাদের সুখের সহিত দুঃখ এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে, আমরা শত চেষ্টাতেও ইহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি না। স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, প্রভৃতি যে সকল বস্তু সুখের প্রধান উপাদান, অন্যান্য অনেক সুখ যাহার উপর নির্ভর করে, তাহা আমাদের অল্লাধিক পরিমাণে অভ্যস্ত। একজন ব্যক্তি যখন স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছে, অথবা অব্যাহত-গতি বিচরণ করিতেছে, তখন এ স্বাস্থ্য বা স্বাধীনতার কথা তাহার মনেই পড়ে না। অনুভূতির একটি লক্ষণ এই যে, তাহা অভ্যাসে অভ্যাসে লুপ্ত হইয়া যায়, সেই জন্য যে সকল সুখে আমরা নিত্য অভ্যস্ত, যে সুখ আমাদের নিত্য সহচর, সে সুখ আমাদের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়। তখন তাহার আর নূতনত্ব থাকে না। আবার নূতন নূতন সুখের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি যে সকল সুখ নহিলে জীবনের অন্য সহস্র সহস্র সুখ তিক্ত ও বিস্বাদ হইয়া যায়, বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে সে সকল সুখ প্রায় মানবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু তাহারা অন্তঃস্রোতের মত আমাদের জীবনের নিম্নভূমি দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সেই হেতু তাহাদের কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই; তাহাদের মূল্য আমরা আর ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, এবং বিধাতার সে সকল অমূল্য দানের মর্য্যাদা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই যে সুখ আমরা

জীবনে পাইয়াছি, তাহার আদর বুঝিতে অক্ষম হইয়া, যে সুখ পাই নাই, তাহারই জন্য ক্ষোভ করিয়া মরি। সেই জন্যই আমরা ইচ্ছা করিয়া জীবনকে দুঃখময় বলিয়া দুঃখের মাত্রা বাড়াইয়া লই। জীবনে যে দুঃখ নাই, একথা কেহ বলিবে না; কিন্তু তাহাকে অযথা বাড়াইয়া লইবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অভ্যস্ত সুখকে ভুলিয়া বিধাতার অমূল্য দানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, নূতন সুখের জন্য লালায়িত মানব যদি তাহার আত্মলব্ধ সুখকেও তিক্ত করিয়া তুলে, তবে সে দোষ কাহার?

আমাদের চিরাভ্যস্ত সুখগুলি যে কত মূল্যবান তাহা আমরা কেবল সেই সময় বুঝিতে পারি, যখন তাহাদের ব্যাঘাত বা বৈলক্ষণ্য ঘটে। বাস্তবিক তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, কি সুখের অধিকারী আমরা ছিলাম! এরূপ অনেক সুখ আছে, দুঃখ না আসা পর্য্যন্ত যাহাদের মর্য্যাদা আমরা একেবারেই বুঝিতে পারি না, কিন্তু দুঃখের স্বভাব এই যে সে ঝটিকার মত আমাদের প্রকৃতির মধ্যে আসিয়া একটা বিষম বিপ্লব বাধাইয়া দেয় এবং সমস্ত জীবনের সুখশান্তি হরণ করিয়া লইবার উপক্রম করে। সেইজন্য মানবের মনে সুখের উপলব্ধি অপেক্ষা দুঃখের উপলব্ধি অত্যন্ত প্রবল। দুঃখবাদের ইহা একটি অতি নিগূঢ় রহস্য।

ভগবদ্গীতা এই সমস্যার একটি সরল ও উৎকৃষ্ট সমাধান প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বের অতীত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন :—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।
ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।

অভ্যাসের দ্বারা যেমন শীতোষ্ণকে জয় করা যায়, তেমনই সুখদুঃখকে অতিক্রম করা যাইতে পারে। দুঃখের দ্বারা সুখ যেখানে নিত্যসম্পৃক্ত, সেখানে সুখকে গ্রহণ করিতে হইলে দুঃখকেও বরণ করিতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় শিষ্যের নিকট সুখদুঃখের অতীত এক রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। এই যে সুখদুঃখের অতীত রাজ্য, ইহা জ্ঞানের দ্বারা, যোগের দ্বারা লভ্য; পরব্রহ্ম ইহার অধিষ্ঠাতা, এবং জীবন্মুক্ত আত্মা ইহার অধিবাসী। এ রাজ্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের কামনা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আত্মস্থ হইয়া এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

এইখানে আমরা মানব প্রকৃতির দুইটি বিভিন্ন অংশের সহিত পরিচয় লাভ করিতেছি; এক ইন্দ্রিয়গ্রাম বিশিষ্ট শরীর, অপর দেহেন্দ্রিয়াতীত আত্মা। শরীর ও আত্মার মধ্যে একান্ত প্রভেদ মনোবিজ্ঞান সম্মত না হইলেও নৈতিক জগতে, ধর্ম্মজীবনে ইহাদের স্বরূপভেদ, ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য এবং মর্য্যাদার তারতম্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। একদিকে হিন্দু দার্শনিকগণ, অপর দিকে প্লেটো, কাণ্ট্ প্রভৃতি মনস্বিগণ সকলেই শরীর ও আত্মার তারতম্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান মানসিক ক্রিয়া-প্রণালী বিশ্লেষণে ব্যাপৃত; মানসিক ক্রিয়া শরীরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই মনোবিজ্ঞান শারীর-মানসিক তত্ত্ব সমূহের নির্ণয় করে; মানসিক ক্রিয়ার মর্য্যাদার (values) তারতম্য বা মূল্যের নির্ণয় করিতে মনোবিজ্ঞান প্রবৃত্ত হইতে পারে না। চারিত্র দর্শনই এই মর্য্যাদার নিয়ামক। মানব চরিত্রের মধ্যে দেহ ও আত্মার বৈচিত্র্য অতি প্রবলভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। জ্ঞানচৈতন্য পরিকল্পিত প্রকৃতিকে যদি পরাপ্রকৃতি বলা যায়, এবং ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়ভূতা প্রকৃতিকে যদি অপরাপ্রকৃতি

আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা হইলে এতদুভয়ের পার্থক্য আমরা সহজে বুঝিতে পারি। পরাপ্রকৃতি স্থির, শান্ত, বিমল এবং ঊর্দ্ধমুখী। অপরাপ্রকৃতি উদ্দাম, চঞ্চল, কলুষিত এবং নিম্নমুখী। পরাপ্রকৃতি অপরাপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া, আয়ত্ত করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। অশান্ত অপরা সময়ে সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং পরাপ্রকৃতিকেও নিম্নে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে।

অপরা প্রকৃতি যাহাতে সুখানুভব করে, পরা প্রকৃতি তাহাকে অনেক সময়ে বর্জ্জন করিতে চায়। অপরা প্রকৃতির সুখ ইন্দ্রিয়ের সুখ, শরীরের সুখ—এ সুখের পশ্চাতে দুঃখ সর্ব্বদাই উঁকি মারিতেছে। পরা প্রকৃতি এমন দুঃখ-সম্ভিন্ন, কলুষিত সুখ চাহে না। যে সুখস্রোত অনাবিল, নির্ম্মল, প্রশান্ত, তাহাতেই পরা প্রকৃতি নিমগ্ন হইতে ভালবাসে। সুতরাং এই দ্বিবিধ প্রকৃতির তৃপ্তিকে একই নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। অপরা প্রকৃতির তৃপ্তিকে সুখ বলিলে, পরা প্রকৃতির তৃপ্তিকে 'আনন্দ' বলা চলে। হিন্দু দার্শনিক যখন আনন্দের কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি এই পরা প্রকৃতির চিন্তাই করিয়াছেন। Pleasure এবং Bliss এর মধ্যে যে পার্থক্য, আমার বোধ হয় সুখ এবং আনন্দের মধ্যে সেই পার্থক্য। আনন্দের মধ্যে অনুভূতি অপেক্ষা চৈতন্য বা জ্ঞানের ভাবই বেশী। সেইজন্য ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন,—

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ইত্যত্র জ্ঞাতৃত্বমেব আনন্দিত্বম্।

আনন্দ এবং জ্ঞান একই পদার্থ। অবশ্য শ্রীভাষ্যের এইরূপ জ্ঞান ও আনন্দের অভেদ-কল্পনা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইতেও পারে। শ্রুতি যখন বলিতেছেন,

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

তখন বিজ্ঞান ও আনন্দের পৃথকভাবে উল্লেখ করায়

এতদুভয়ের অভেদ-কল্পনা শ্রুতির অভিপ্রেত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু আনন্দের জ্ঞান-স্বরূপত্ব কল্পনা হইতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু ধরিয়া লইতে পারি যে আনন্দ জ্ঞানাশ্রয়। ইন্দ্রিয়ের উপভোগ হইতে যে ক্ষণিক, দুঃখ-সম্পৃক্ত সুখের আস্বাদন লাভ করা যায়, সে সুখ হইতে অনেক ঊর্দ্ধে মানবের প্রকৃত আনন্দ। সে আনন্দে তীব্রতা নাই, সেই জন্য তাহা আমাদের সুখতৃষ্ণাকে সহসা প্রলুব্ধ করিতে পারে না। যে সুখের তৃষ্ণা মানবের মৌলিক প্রকৃতি হইতে জন্মলাভ করিয়া তাহার মৌলিক প্রবৃত্তি সকলের তৃপ্তি সাধনে সার্থকতা লাভ করে, সে সুখ-তৃষ্ণা তাহার নিজের সঙ্কীর্ণ সীমা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। বিষয়ে যাহার চিত্ত মজিয়াছে, বিলাসে যে সুখের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছে, সে অন্যদিকে তাহার চক্ষু ফিরাইতে চাহে না। ঊর্দ্ধ দেশ তাহার নিকট কুহেলিকাচ্ছন্ন, সে তাহার ধূলিকর্দ্দমময় বাস-ভূমিকে সুখের নিকেতন মনে করিয়া তাহাতেই একান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে। তাহার পরে একদিন যখন সে বিষয়োপভোগের অবশ্যম্ভাবী ফল—ক্লান্তি-অনুভব করে, যখন তাহার ইন্দ্রিয়-নিচয় শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন হয়ত সে বুঝিতে পারে যে, সকলই বিফল ; সুখ বলিয়া যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, তাহা দুঃখের শরজালে বিদ্ধ। সংসারে দুঃখই সার এবং নিত্য বস্তু, সুখ কেবল দুঃখের ছদ্মবেশ মাত্র।

জ্ঞানী সুখের স্বরূপ বুঝিতে পারেন ; তিনি আনন্দের সেই মৃদু, স্থির, স্নিগ্ধ আলোকে মুগ্ধ হন এবং তাহাতেই নিমগ্ন হন। অন্য সুখের জন্য যে প্রাণান্তিক ব্যাকুলতা সাধারণ মানবকে ব্যস্ত, চঞ্চল ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, তাহার দিকে তিনি ফিরিয়া চাহেন না। সক্রেটীস কখনও নির্ব্বোধ বিলাসীর সুখের সহিত তাঁহার নিজের আত্মতুষ্টির বিনিময় করিতে চাহিবেন না। জ্ঞানী

যে সুখ চাহেন, তাহা বিমল, শান্ত, নিষ্কল ;—তাহাতে প্রবৃত্তির কোলাহল নাই, পাপের মলিনতা তাহাকে আচ্ছন্ন করে না, মৃত্যু তাহার নিকটে আসিতে পারে না এবং দুঃখ তাহাকে ব্যথিত করে না। সে সুখ ভূমা, অল্পতায় তাহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

যোগী যে সুখকে কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করেন, তাহাও ইন্দ্রিয়-রাজ্যের বহির্ভূত। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া আত্মার পরিচিন্তনে অভিনিবিষ্ট হওয়ার নামই যোগ। বিষয় হইতে যখন ইন্দ্রিয় সকল বিযুক্ত হয়, বাহিরের যাবতীয় ক্রিয়া যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আত্মা আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া যে সুখ প্রাপ্ত হন, সেই সুখই চরম সুখ। সে সুখ নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার এবং সুষুপ্তির ন্যায় —

অস্যাবস্থা সুষুপ্তিঃ স্যাৎ যত্রানন্দং প্রকৃষ্যতে।

এই সুষুপ্তির অবস্থাই পরমানন্দ। দাও তবে সেই সুষুপ্তি—যাহাতে আত্মা তাহার কলঙ্ক মলিনতা প্রক্ষালন করিয়া নিত্য শুদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে আপনাকে আপনার নিকট ব্যক্ত করে। দাও সেই সুষুপ্তি—যে সুষুপ্তি পরিশ্রমে শান্তি আনয়ন করে, জীবনের অসংখ্য দুঃখক্লেশের উপর যবনিকাপাত করে, পাপের স্মৃতির উপর মঙ্গল ঘটের শান্তিবারি সেচন করে। আর আমরা সকল ভুলিয়া সুষুপ্তির বিমল বিপুল অজস্র আনন্দে নিমজ্জিত হই!

ঘুমাও তবে ঘুমাও। যোগীর মত ঘুমাইতে না পার, সাধারণ প্রাকৃত জনের মত ঘুমাও। কিন্তু ভাল করিয়া ঘুমাও। দেখিও যেন পাপের চিন্তা, স্বার্থের কামনা, তোমার সে নিদ্রাকে সবলে ভাঙ্গিয়া না দেয়। সে কি পারে ঘুমাইতে, সে কি পারে সুষুপ্তির সুখলাভ করিতে, যে পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত? সে কি পারে ঘুমাইতে,

যাহার মনে পাপের কালিমা অক্ষয় চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে? কর্ম্ম কোলাহলময় জগতের মধ্যে যে নিজের স্বর সকলের উপরে চড়াইয়া স্বার্থসাধন করিয়া লইতে চাহে, যে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষমতার বিজয় দুন্দুভি বাজাইতে চাহে, সে কি পারে ভাল করিয়া ঘুমাইতে! যে অর্থের পশ্চাতে অহর্নিশ অশ্রান্তভাবে ধাবিত হয়, যে পরের মনে পীড়া দিয়া নিজের প্রভুত্ব খ্যাপন করিতে চাহে, যে বিচারাসনে বসিয়া বিচারের ভান করিয়া ক্ষান্ত হয়, যে প্রজার দত্ত গৌরব মুকুট স্বরূপ রাজমুকুট মস্তকে পরিয়া প্রজার লাঞ্ছনা করিতে তৎপর হয়, সে কি পারে সুখে ঘুমাইতে? সুষুপ্তির বিপুল তৃপ্তি তাহার ভাগ্যে নাই। তুমি ঘুমাও, এমন করিয়া ঘুমাও যেন বিষয়ের বাসনা, স্বার্থের চিন্তা, পাপের স্মৃতি নানা বিভীষিকাময় স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়া তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া না দেয়। ঘুমাও, তবে ঘুমাও। *

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতা।

দুঃখ

দুঃখের কাহিনী লইয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি, আপনারা ভিখারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন না ত? দুঃখের প্রকৃতি এই যে, সে হৃদয়ের অতি নিভৃততম প্রদেশকে স্পন্দিত করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে নয়নোপান্তে সমবেদনার অশ্রুবিন্দু বহিয়া আনে। দুঃখকে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা দূরে রাখিতে পারি না। সৃষ্টির আদি হইতে যে দুঃখের করুণ গীতি ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই বিচিত্র তান মূর্চ্ছনা মানবের কাব্য-দর্শন-ইতিহাসকে আচ্ছন্ন, বিপ্লুত ও মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্যাস্তের স্নিগ্ধ করজাল যেমন সান্ধ্য মেঘমালাকে বিদ্ধ, বিদীর্ণ ও পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহাকে নানাবর্ণ সমাবেশে বিচিত্র করিয়া তুলে, দুঃখ তেমনি মানবজীবনকে অসংখ্যভাবে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও করুণ করিয়া দেয়। তাহার চেতনা, তাহার কর্ম্ম-প্রবণতা, তাহার বেদনা, তাহার প্রযত্ন, তাহার মহিমা, তাহার উদারতা, তাঁহার আশাভরসা, তাহার হাহাকার—শতদিকে শতভাবে এই দুঃখের চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কাহিনী বহন করিতেছে।

তাই মানবের ভাষা এই এক দুঃখেরই অনন্ত অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। না হইবে কেন? দুঃখ হইতেই যে ভাষার জন্ম। শিশুর ক্রন্দন যে তাহার পরিস্ফুট ভাষার অগ্রদূত। ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে মুহ্যমান হৃদয় হইতে যে শোক বা শ্লোকের জন্ম হইয়াছিল, সেই বিশ্বব্যাপিনী সমবেদনাই কবিতার আদি জননী। সেই জন্যই বোধ হয় ভাষা তাহার জননীকে প্রায়

ভুলিয়া থাকে না। সহস্র কণ্ঠে সহস্র রাগিণীতে ভাষা ও কাব্য দুঃখের গীতি গাহিয়া সমস্ত চরাচর বিশ্বকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই দুঃখ লইয়াই মানবের কাব্য। নির্ব্বাসিত যক্ষের বিলাপ, শ্রীরাধিকার বিরহ, হ্যামলেটের জীবনে বিস্পৃহা, নিষ্কলঙ্ক ডেস্‌ডিমনার শোকাবহ পরিণাম, পতিরতা ভ্রমরের লাঞ্ছনা—এ সকলই সেই বিশ্ব-বেদনার এক একটি মূর্চ্ছনা। সমস্ত মানবের জীবনের মধ্য দিয়া দুঃখ যে অবারিত স্রোতটি বহাইয়া দিয়াছে, তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ কবিতার ছন্দে ফুটিয়া উঠে, আর সেই বিশ্বব্যাপিনী বেদনার ঝঙ্কারে সমস্ত মানবজীবন পূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

সমস্ত সৌরজগৎ যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন মানব-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্ব চরাচর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। এই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বিন্দুমেয় মনুষ্য-জীবন আধ্যাত্মিক বলে সমগ্র বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। সমগ্র ইহলোক ও পরলোক মানববুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানবের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। জড়বস্তু জড়ের কোনও প্রয়োজন সাধন করে কিনা সন্দেহস্থল, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে জগতের যাবতীয় বস্তু মানবের ভাগ্যের সহিত কোনও না কোনও প্রকারে জড়িত আছেই আছে।

এই যে এক বিপুল বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাকে এক হিসাবে বিশ্বের কেন্দ্রগামিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। মানব এই বহুধা বিভিন্ন শক্তি-সংঘের অবিশ্রাম ঘাতপ্রতিঘাতে সর্ব্বদা স্পন্দিত, জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ। এই যে এক অচেনা, অজানা, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড-শক্তিনিচয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানব ধীরে ধীরে আপনার শক্তিসঞ্চয় পূর্ব্বক অন্য সকল শক্তিকে অভিভূত করিবার

নিয়ত চেষ্টায় কখনও উঠিতেছে, কখনও বা পড়িতেছে, ইহাই মানবের সংসার, ইহাই মানবের ভাগ্য। সুখ এবং দুঃখ এই ভাগ্যেরই অবস্থা-বিপর্য্যয়। কখনও সুখরবির খরকিরণে সে ভাগ্য প্রসন্ন, নির্ম্মল, জাজ্বল্যমান। আবার কখনও সে সুখ কেন্দ্রীয় উষার ন্যায় ক্ষণিক ম্লান আলোকে দুঃখের তমিস্র কথঞ্চিৎ অবসান করিয়া দেয়।

ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবন এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত চক্ষুর সমক্ষে উন্মুক্ত করে। একদিকে যেমন যীশুর নিষ্ঠুর পরিণাম, সক্রেতিসের অপ্রত্যাশিত বিষপান, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সংসার-ত্যাগ, সিজারের হত্যা, নেপোলিয়নের নির্ব্বাসন, অপরদিকে তেমনি পারস্যের পতন, উল্কার ন্যায় গ্রীসের উত্থান ও বিলয়, রোমের গৌরবদীপ্ত মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্ত—চিরাভিশাপগ্রস্ত ভারতের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই—এ সকল ব্যক্তিগত ও জাতীয় দুঃখের কাহিনী বহম করিয়া ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরিয়া শোকাশ্রুপূত ব্রতচারিণী বিধবার ন্যায় চলিয়াছে। তাহার প্রতি পত্র দুঃখের তপ্তশ্বাসে ম্রিয়মাণ। যেখানে কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের আকস্মিক উন্নতি চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে, সেইখানেই এক বিরাট অধঃপতনের বিপুল আয়োজনের আভাসও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যেখানে চরিত্রের মহিমায়, শৌর্য্যের গৌরবে হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠে, সেইখানে আবার কলঙ্ককালিমায়, ভগ্নহৃদয়ের হাহাকারে দিক আচ্ছন্ন হয়।

মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দুঃখের বিশাল ছায়ায় শিহরিয়া উঠিতে হয়। মনে হয় যেন দুঃখের বিরাটমূর্ত্তি মহাকায় কলোসাসের মত পদদ্বয়ের দ্বারা মানবের ভূত ও ভবিষ্যৎকে অধিকৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যতই আমরা উজ্জ্বলতর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি না কেন,

দুঃখের ছায়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে মলিন করিয়া দেয়। সুখবাদের (optimism) একটি প্রবল বাধা এই যে সুখ বড় অনিশ্চিত, দুঃখের ন্যায় নিশ্চিত সংসারে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। সুখের সমষ্টি ও দুঃখের সমষ্টি মিলাইয়া দেখিলে সুখসমষ্টিরই আধিক্য দৃষ্ট হয়—এই ধারণাই সুখবাদের স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু সুখ ও দুঃখের "সমষ্টি" আদৌ করা যায় কি না তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অতীত সুখ বর্ত্তমান সুখ যখন একই মাপকাঠির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না, অবস্থা ও কালভেদে যখন সুখ দুঃখের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তখন তাহাদের যোগফল তুলনা করা অসম্ভব বলিয়াই ত মনে হয়। আর একটি অতি গুরুতর কথা এই যে, সুখের অনুভূতি অপেক্ষা দুঃখের অনুভূতি বোধ হয় মানব প্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রবল। দুঃখ আমাদিগকে যত পীড়িত ব্যথিত ও অভিভূত করে, সুখ তেমন আনন্দ দান করিতে সমর্থ নহে। সুখের মাদকতা অপেক্ষা দুঃখের তীব্রতা আমরা সমধিক অনুভব করিয়া থাকি। সেই জন্য একদিনের, এমন কি এক দণ্ডের দুঃখ সারাজীবনের হাসিরাশিকে ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিতে পারে। সুখ বড় দুর্মূল্য, বিলাসের সামগ্রী, অনেক সাধনা করিয়া অল্প পরিমাণে সুখ লাভ করা যায়, সে সুখও আবার অনেক সময়ে দুঃখের সংমিশ্রণে বিস্বাদ হইয়া যায়। দুঃখ কিন্তু চিরস্থির, অনায়াসলব্ধ এবং অকৃত্রিম।

"The still sad music of humanity"—কবির এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্যটি একটি অতি নিষ্ঠুর সত্যের আভাসমাত্র। মানুষের জীবনের সহিত দুঃখ যে কি এক নিবিড় বন্ধনে বাঁধা আছে, তাহা যে বিধাতার বিধানে নিয়ন্ত্রিত, সেই

বিধাতাই কেবল বলিতে পারেন। কোন্ অনাদি অনির্ব্বচনীয় দুঃখে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন্ দুঃখে সমগ্র জীবের ললাটে দুঃখ লিখিত হইয়াছিল, তাহা মানবের পক্ষে চিরান্ধ যবনিকায় আবৃত। ক্ষণিকের জন্য ও যদি সে রহস্যময়ী যবনিকা অপসারিত হইত! কিন্তু তাহা হয় না। দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া যখন মানব অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন দুঃখের নবীন মূর্ত্তি মৃত্যু আসিয়া ক্লান্ত অক্ষিপংক্তি চিরমুদিত করিয়া দেয়। জীবনের প্রভাতে দিগ্‌বলয়ের পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সঞ্চিত ছিল, যেন তাহাই প্রসারিত হইয়া দিনমানের দীপ্তিকে চিরান্ধকারে পরিণত করিয়া দেয়।

দুঃখের সহিত সংগ্রামে পরাভূত হইয়া মানুষ কখনও বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, আবার কখনও সংসারের এই ক্রূর নির্ম্মম উপহাস দেখিয়া চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। চিন্তা মানবের স্বাধীন বৃত্তি—সেখানে সে অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিতে পারে। সেই জন্য যখন বিশ্বের সহিত কোনও রূপে মানবের বনিয়া উঠে না, চারিদিকেই যখন লাঞ্ছনা, বেদনা, অপমান আসিয়া হৃদয়কে মথিত ও প্রপীড়িত করিয়া তুলে, তখন মানব আপনার মধ্যে সংবৃত হইয়া একটুখানি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। মানুষের যদি কোথাও কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে, তবে তাহা এইখানে। অবশ্য চিন্তার দ্বারা দুঃখের অবসান হইতে পারে কি না এবং স্মরণাতীত কাল হইতে চিন্তা করিয়া মানব দুঃখের লাঘব করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, যতদিন হইতে মানুষ দুঃখভোগ করিতেছে, সেই সুদূর অতীত হইতেই, মানুষের চিন্তা দুঃখের স্বরূপ ও প্রতীকার-নিরূপণে নিযুক্ত রহিয়াছে। দুঃখের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কেননা দুঃখের ন্যায় আর একটি

জিনিষও পৃথিবীতে নাই। দুঃখকে চিনাইয়া দিবার দরকারও হয় না।

রাজকুমার শাক্যসিংহ যৌবনে এই দুঃখের বিশ্বরূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। জন্ম-জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত সংসারে সুখের আলেয়া দেখিয়া তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই রাজ্যৈশ্বর্য্য ফেলিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চিন্তার ফল এখনও অর্দ্ধজগৎ উপভোগ করিতেছে। "সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং" এই সত্যের উপর বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি
অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্‌সথ।

ধম্মপদ, জরাবগ্‌গো।

বাসনা দ্বেষাদি রূপ অগ্নির দ্বারা নিত্য প্রজ্বলিত এই সংসারে কিসের হাসি, কিসের আনন্দ। অন্ধকার-নিমগ্ন রহিয়াও তোমরা তত্ত্বজ্ঞান রূপ প্রদীপের অন্বেষণ করিতেছ না?

বাস্তবিকই কিসের হাসি? কিসের আনন্দ? যদি দুঃখই স্বভাবসিদ্ধ হয়, তবে কেন এ বিড়ম্বনা? কেন এ সুখের অভিনয়?

"যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেন্তি পাণিনং।"

ধম্মপদ, দণ্ডবগ্‌গো।

রাখাল যেমন দণ্ডের দ্বারা তাড়না করিয়া গাভীগণকে গোঠে লইয়া যায়, তেমনই জরা ও মৃত্যু প্রাণিগণের আয়ুকে (জীবনকে) তাড়না করিয়া লইয়া যায়।

যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে দুঃখের কবল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সে তত্ত্বজ্ঞান বহুশ্রমলভ্য। কেবল শাস্ত্র-পাঠের দ্বারা সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। নির্ব্বাণ রূপ পরমসুখ লাভ

করিতে হইলে বাসনার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হয়। অনাদি বাসনা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে ফলের উৎপত্তি; কর্ম্মফল হইতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ হয়, জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লোভ মোহ বাসনার নিরাশ হইলে কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে কর্ম্মফল বিলীন হইতে থাকে, সুতরাং জন্ম এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী সহস্র দুঃখ কষ্ট আর ভোগ করিতে হয় না। অতএব দুঃখের প্রতীকার সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ উপদেশ করিলেন:—

তণ্হায় জায়তে সোকো তণ্হায় জায়তে ভয়ং
তণ্হায় বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং?

ধম্মপদ, পিয়বগ্গো।

তৃষ্ণা হইতে শোক জন্মে, তৃষ্ণা হইতে ভয় জন্মে, তৃষ্ণা হইতে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক থাকে না, ভয় থাকিবে কেমন করিয়া?

বৌদ্ধের চিন্তাস্রোত যেমন জগতের দুঃখবেদনারাশি দূর করিয়া নির্ব্বাণের জন্য অন্তঃকরণের উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া দিতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তেমনি অন্যান্য ভারতীয় দর্শনও দুঃখের কঠোর তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে আবির্ভূত হইয়াছিল। দুঃখের প্রস্তাবনা লইয়া সাংখ্যদর্শনের উদ্বোধন হইল:—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ, এবং আধিদৈবিক দুঃখ সকল মনুষ্যকে নিয়ত তাড়না করিতেছে, এই দুঃখকে পরাভব করিবার জন্য মানব অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু তাহাতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ

নিঃশেষে পর্য্যবসান হয় না, এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। পুরুষ এবং প্রকৃতির ভেদজ্ঞানই সাংখ্যমতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। এই ভেদজ্ঞান হইতেই মুক্তি। বাস্তবিক পুরুষের বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই, প্রকৃতিই বন্ধন ও মোক্ষের বিষয়। পুরুষ তত্ত্বতঃ নিত্যমুক্ত, উদাসীন, এবং সাক্ষিস্বরূপ। প্রকৃতির সাহচর্য্যে পুরুষের যে দুঃখ, তাহা বিবেকবান ব্যক্তি আরোপিত বলিয়াই জানেন। অনুচরগণের জয় পরাজয় যেমন সেনাপতিতে বর্ত্তে, সেইরূপ প্রকৃতির সুখ দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে।

"বন্ধমোক্ষসংসারাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে যথা জয়পরাজয়ৌ ভৃত্যগতাবপি স্বামিন্যুপচর্য্যেতে তদাশ্রয়েণ ভৃত্যানাং তদ্ভাগিত্বাৎ তৎফলস্য চ শোকলাভাদেঃ স্বামিসম্বন্ধাৎ ভোগাপবর্গয়োশ্চ প্রকৃতিগতয়োরবিবেকগ্রহাৎ পুরুষসম্বন্ধ উপপাদিত ইতি।" তত্ত্বকৌমুদী।

তত্ত্বানুশীলনের দ্বারা "আমি পুরুষ, আমি ভোক্তা বা কর্ত্তা নহি, আমার স্বামিত্ব নাই," এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাই বিশুদ্ধ বিমল তত্ত্বজ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, অন্যপ্রকার জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র। "তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ জ্ঞানমতোঽন্যন্মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমেব।" (ভামতী)। একবার তত্ত্বজ্ঞান হইলে প্রকৃতির খেলাসাঙ্গ হইয়া যায়, পুরুষকে আর তখন প্রকৃতি বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। পুরুষের সুখদুঃখভোগরূপ যে অভিনয় তাহা নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষলাভ হয়।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।"

সাংখ্যকারিকা।

দর্শকদিগের নিকট নৃত্য দেখাইয়া যেমন নর্ত্তকী নিবৃত্ত হয়, তেমনই প্রকৃতি পুরুষের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইয়া থাকেন।

চৈতন্য-বিশিষ্ট নিষ্ক্রিয় পুরুষ দুঃখের অতীত। অচেতন জড় প্রধান অথবা প্রকৃতিই দুঃখের আলয়। কারণ প্রবৃত্তি হইতে দুঃখের জন্ম। পুরুষের ত কোনও প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং পুরুষের দুঃখ কল্পিতমাত্র। প্রশ্ন হইতে পারে অচেতনের আবার প্রবৃত্তি কি? তদুত্তরে বলা যায়, বৎসের জন্য অচেতন দুগ্ধের যেমন স্বতঃক্ষরণ-প্রবৃত্তি আছে, অচেতন প্রকৃতিরও তেমনই মোক্ষের জন্য প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে বাধা কি?

জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারও জগতের দুঃখ ক্লেশের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া এক অচেতন প্রবৃত্তির (blind irrational will) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অচেতন অন্ধ প্রবৃত্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, কাজেই জগতে দুঃখের আতিশয্য। দুঃখই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। প্লেটোর মত ও এইরূপ। বাঁচিয়া থাকিবার অন্ধ বাসনা হইতেই অসংখ্য দুঃখের সৃষ্টি। জীবন এক প্রকাণ্ড মরীচিকামাত্র "প্রখর মার্ত্তণ্ডদগ্ধ নিরবচ্ছিন্ন মধ্যাহ্নের মত ঊষর এই সংসার"। * জন্মই দুঃখের আকর; সুখদুঃখ-বিরহিত নির্ব্বাণই একমাত্র কামনার বস্তু। শোপেনহাওয়ার বৌদ্ধ মতের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন।

শোপেনহাওয়ারের শিষ্য হার্ট্‌মান্‌ তাঁহার আচার্য্যের ন্যায় দুঃখকেই সার তত্ত্ব বলিয়া মানিয়াছিলেন এবং দুঃখের নিবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে জগতের মূল প্রবৃত্তি একান্ত অচেতন নহে। চৈতন্যের সহিত প্রবৃত্তির মিলনই হার্টমানের চিন্তার মুখ্য ফল। তাহা হইলেও হার্টমান বৈদান্তিকের ন্যায় জগৎকারণকে প্রথম হইতেই সচেতন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে প্রবৃত্তি প্রথমে অচেতন

* "The sun burns perpetual noon"

ছিল। সেই অচেতন প্রবৃত্তি হইতে সৃষ্টির আরম্ভ; কিন্তু সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইতেই চৈতন্যের আবির্ভাব হইল। চৈতন্য আবির্ভূত হইয়া জগৎকে নানাপ্রকারে শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল। সেই চেষ্টার ফলে জগতের কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে অনেক সময়ে একটি সচেতন প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। চেতনা রূপ জননী এবং কাম (প্রবৃত্তি) রূপ জনক হইতে জগতের প্রসব হইয়াছে; প্রসবের পরে চেতনা গুণবতী মাতার ন্যায় গর্ভজাত সন্তানকে নানা উপকরণে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রবৃত্তির যে উদ্দাম অন্ধ প্রকৃতি, তাহা যাইবে কোথায়! কাজেই জগতের অসম্পূর্ণতা স্বাভাবিক এবং দুঃখও অনিবার্য্য! প্রবৃত্তির যখন বিনাশ হইবে, দুঃখের তখন অন্ত হইবে। যেহেতু প্রবৃত্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রবৃত্তির বিনাশ হইলে জগৎও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সেই পরম নির্ব্বাণই একমাত্র কামনার বস্তু।

সৃষ্টির মূল যে প্রবৃত্তি, তাহাকে গয়টেও অচেতন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে "কর্ম্ম" ছিল ("I Anfang war dic That" Faust) এই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রথমে অচেতন ছিল। (বৌদ্ধেরা বলিতেন "অবিদ্যা হইতে বাসনার জন্ম।") গাভীর ক্ষীর যেমন অচেতন হইলেও বৎসের জন্য প্রবাহিত হয়, তেমনই এই কর্ম্ম-প্রবণতা অজ্ঞাতসারেই তত্ত্বজ্ঞানের অভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

তত্ত্বজ্ঞান যে দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়, ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত এ দেশীয় চিন্তার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বাইবেলে যে মৌলিক পাপের বর্ণনা আছে, তাহা হইতে মনে হয় যে মানুষ সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে সুখে

স্বচ্ছন্দে ছিল ; পরে প্রবৃত্তির প্রেরণায়ই হউক আর চিরাপরাধিনী স্ত্রী জাতির পরামর্শেই হউক, সেই ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব মৃত্যু ও দুঃখভোগের অভিসম্পাত লাভ করিল। খৃষ্টান শিক্ষকগণ জন্মান্তর-বাদ ও কর্ম্মফলের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, বলেন যে এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপর জন্মে কিরূপে হইবে?—বিশেষতঃ যখন পূর্ব্ব জন্মের পাপের স্মৃতি পর্য্যন্ত পরজন্মে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই অবলীলাক্রমে এই মৌলিক পাপের তত্ত্ব (Theory of Original Sin) মানিয়া আসিতেছেন। একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিরপরাধ ভবিষ্যবংশীয়েরা কেন করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। পিতার ধাতুগত দোষ যে পুত্রে বর্ত্তে, সেই তত্ত্বই বিধাতার ন্যায়-বিচারের সহিত মিলাইয়া উঠা কঠিন ; তাহাতে একজনের দোষে যে অনন্ত কাল ধরিয়া সমগ্র মানব জাতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিবে, ইহা বুঝা আরও কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। তারপর এই ফলভক্ষণ ব্যাপারকে যদি রূপক বলিয়া কল্পনা করা যায়, এবং ফলকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে জ্ঞানলাভই দুঃখের কারণ। একদিক দিয়া দেখিলে কথাটী ঠিক। জ্ঞান না থাকিলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় না। মনুষ্য ও নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে অনুভূতি বিষয়ে প্রভেদ এই যে পশু-পক্ষিগণ যন্ত্রণা অনুভব করে মাত্র (কোন কোন দার্শনিক তাহাও স্বীকার করেন না), মানুষ জ্ঞানের দ্বারা আপনার অবস্থা, দুঃখের প্রকৃতি ও পরিমাণ বুঝিতে পারে। চিন্তার দ্বারা তাহার অশ্রুরাশি সে শতগুণে বাড়াইয়া লয়। কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা অনুভবমাত্র। প্রকৃত জ্ঞান তাহা নহে ; প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী মৃত্যু হইতে অমৃতে উপনীত হয়েন।*

* অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।—শ্রুতিঃ।

সংসার দুঃখময়, ইহা বৈরাগ্যের মূল সূত্র।* এই বৈরাগ্য হইতেই প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয়। প্রবৃত্তি অনন্ত দুঃখের আকর। সেইজন্যই হিন্দু দর্শনে দুঃখবাদের আতিশয্য। দুঃখবাদের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম-প্রবণতার মূল প্রস্রবণকে জমাইয়া তুষারে পরিণত করা বোধ হয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। চরিত্রনীতি যদি হিন্দু দর্শনের মূল ভিত্তি হয়, তবে দুঃখের এক বিরাট মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সংযম ও সাধনার অভ্যাস করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান সুখ-বাদের যুগেও যে মূল্য বিহীন একথা বলা যায় না। দুঃখের মধ্য দিয়া চরিত্রের অগ্নি-পরীক্ষা হয়।† সংসারে যে সুখ নাই একথা বোধ হয় হিন্দুদর্শনকার বলিতেন না।

"ন সুখস্যান্তরাল নিষ্পত্তেঃ।" গৌতমসূত্র ৪র্থ অধ্যায়

সংসারে যে সুখ নাই, একথা বলা মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রায় নহে। দুঃখচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন সংসারে সুখের আলোক ক্ষণিক ও অনিশ্চিত, ইহা জানিয়াই ঋষিগণ বৈরাগ্যের উপদেশ করিতেন। সুখের জন্য লালসা না থাকিলে যদি জীবনে দুঃখও আসে, তাহা হইলেও তাহা সহ্য করা সহজ হইবে, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন,

ন তদ্ব্যবস্থিতং পুংসাং ন তৎকর্ম্ম ন তদ্বচঃ
ন তদ্ভোগঃ সমস্তীহ যন্ন দুঃখায় কল্প্যতে।
তদিদং সর্ব্বং দুঃখং ভাবয়মানো বিরজ্যতে বিরক্তো বিমুচ্যত ইতি।

—ন্যায়দর্শন

* "It is truly a misery to live upon earth. The more spiritual a man desires to be, the more distasteful the present life seems to him ; because he better understands and more clearly sees the defects of human corruption". Imitation of Christ.

† "Suffering is not only the postulate whence our moral nature starts, it is also the discipline through which it gains its true elevation."—Martineau's Study of Religion Vol II p 94.

ইহজগতে আমাদের এমন কিছু নাই যাহা দুঃখাত্মক নহে। অতএব সমস্তই দুঃখমূল ইহা ভাবিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন কর। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মনে বৈরাগ্য উদিত হয় এবং বৈরাগ্যই নিঃশ্রেয়স-লাভের একমাত্র পন্থা।

বেদান্তের মতে তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির মুখ্যতম সাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় এই যে আত্মার মুক্তির জন্য জ্ঞানই একমাত্র ফলোপধায়ক। মোক্ষ বিষয়ে অন্য কোনও ব্যাপার, অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে মুক্তির পথে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না; "নিশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং ন চ অনুষ্ঠানান্তরাপেক্ষং।" শাঙ্কর ভাষ্য। তবে শমদমাদিসাধন-সম্পৎ এবং মোক্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার জন্মে না। কর্ম্মকাণ্ড প্রাথমিক সোপান মাত্র। সংসারানল-দগ্ধ হইয়া শান্তির সলিলে নিমজ্জন করিবার জন্য জীব যখন আকুল হয়, তখনই তাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিতে হইবে। (বেদান্তসার)। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মে না।

নিত্যানিত্য বিবেকের নাম তত্ত্বজ্ঞান; ব্রহ্মই নিত্য, আর সমস্তই অনিত্য। জীবাত্মার সহিত পরব্রহ্মের যে ভেদজ্ঞান তাহা অলীক, কল্পিত, অবিদ্যা-জনিত। অবিদ্যা দূর হইলে ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ। "বিগলিত-নিখিল-দুঃখানুষঙ্গ-পরমানন্দ-ঘন-ব্রহ্মাবগতির্ব্রহ্মণঃ স্বভাব ইতি সৈব নিশ্রেয়সং পুরুষার্থঃ।" ভামতী। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মের স্বরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। দুঃখা-

নুষঙ্গলেশবিহীন যে চিৎস্বরূপ আনন্দ, সেই আনন্দই ব্রহ্ম। জীব যখন তাহার ব্যবহারিক সত্তাকে পরমার্থ তত্ত্বে বিলীন করিয়া দিতে পারে, যখন তাহার আমিত্বের অভিমান দূর হইয়া এক বিরাট সর্ব্বব্যাপী নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাবে নিমজ্জিত হয়, তখন তাহার মোহ-জাল, তাহার দুঃখরাশি অপসারিত হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান-লাভের আর একটি ফল এই যে, দেহকে আত্মা বলিয়া যে ভ্রম মানবের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে, দেহেন্দ্রিয়াদির সুখ দুঃখ লইয়া তাহার যে অভিমান তাহাকে ইতস্ততঃ ধাবিত করিতেছে, তাহা বিদূরিত হয়। চার্ব্বাক বলেন দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই :—

"দেহে স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।"

"আমি স্থূল" "আমি কৃশ" এইরূপ উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেহ এবং আত্মা অভিন্ন। সুতরাং চার্ব্বাকের মতে দেহের সুখই আকাঙ্ক্ষার বস্তু ; যদি তাহাতে দুঃখের মিশ্রণ থাকে, তায় ক্ষতি কি? কোন্ মুর্খ তুঁষের সদ্ভাব আছে বলিয়া তণ্ডুল আহরণে বিরত হয়? (চার্ব্বাক দর্শন) ইয়ুরোপে এপিকিউরাসের শিষ্যগণও ক্ষণিক সুখের অনুসরণকেই সার নীতি বলিয়া মানিয়াছিলেন। চার্ব্বাক ও এপিকিউরাস উভয়ের এই সুখবাদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন অতিমাত্র ব্যস্ততা লক্ষিত হয়। যেমন করিয়া হউক জীবনকে উপভোগ করিয়া লও, এই যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটি তাহার সুখ দুঃখ লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, ইহা এখনই চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না ; অতএব ইহার সুখটুকু লুটিয়া লইতে ভুলিও না। পরমুহূর্ত্তে তোমার ভাগ্যে কি আছে কে বলিবে? ওমর খাইয়মের কবিতার মধ্যেও এইরূপ একটি দুঃখের করুণ তান রহিয়াছে। দুর্দ্দমনীয় সুখলিপ্সার নিম্ন দিয়া যেমন দুঃখের

অন্তঃসলিল বহিয়া যাইতেছে, তেমনই এই সকল দার্শনিকগণ 'সুখ সুখ' করিয়া জগতের দুঃখ বাহুল্যকে আরও স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছেন। হাসিতে গিয়া তাঁহাদের নয়নপংক্তি আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেহের সুখ দুঃখ লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাহারা সুখ খুঁজিতে গিয়া দুঃখ আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। বাসনার তৃপ্তিই জীবনের সমস্ত সুখের নিলয় বলিয়া মনে করিয়া তাহারা বাসনারূপ মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়। ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। কাজেই বাসনার অনল-শিখা আরও দাহ করিতে থাকে। সুখান্বেষী এপিকিউরীয়গণও ইহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিয়াছিলেন, এবং বাসনাকে দমন করিবার বিধিমত উপদেশ প্রদান করিতে তাঁহারা ভুলেন নাই, মুহূর্ত্তের সুখ অপেক্ষা সমগ্র জীবনের ঘনীভূত সুখ যে শ্রেয়স্কর, তাহাও তাঁহারা উপদেশ করিয়া ছিলেন, কিন্তু গোড়ায় যে ভুল রহিয়া গেল,—অর্থাৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই সুখ—সেই ভুলের ফলে তাঁহাদের উপদেশ এক অস্বাভাবিক জঘন্য স্বার্থবাদে পরিণত হইয়াছে।

বেদান্ত দেহ এবং আত্মাকে সেই জন্য সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দৈহিক তৃপ্তিকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। দেহে যে আত্মার অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রমাত্মক কল্পনা হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। আকাশে যেমন প্রাকৃতজন নীলকান্তির আরোপ করে, অবিদ্যাশ্রিত ব্যক্তি সেইরূপ দেহ-কেই "আমি" পদ বাচ্য বলিয়া মনে করে। আত্মার স্বরূপ জানিলে এই অধ্যাস দূর হইয়া যায়, তখন অনিত্য দেহের দুঃখে লোকে সন্তপ্ত হয় না। তখন রোগ শোক মৃত্যুর অতীত হইয়া আত্মা আনন্দঘন আপনার স্বভাবে তৃপ্তিলাভ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অজর, অমর, শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদির অতীত। (ভগবদ্গীতা)

এই অদ্বৈত আত্মতত্ত্বের দ্বারা বেদান্ত মরজীবনের দুঃখকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকগণ জ্ঞানী পুরুষের (Theory of the wise man) আদর্শ স্থাপন করিয়া বেদান্তের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি পৃথিবীর সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। এইরূপ চরিত্রই আদর্শ চরিত্র। পৃথিবীতে দুঃখ অসংখ্য, অজস্র কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলেই দুঃখেরই জয় হইবে; জ্ঞানী ব্যক্তি পার্থিব সুখ দুঃখকে গ্রাহ্য করেন না। বেদান্তের ন্যায় ষ্টোয়িকগণও অদ্বৈতবাদী। সমস্ত বিশ্বচরাচর অনন্ত চিৎশক্তির (Logos) দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'টিন্টারণ অ্যাবে' নামক কবিতায় এই সর্ব্বব্যাপী সত্তার একখানি সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তি (Pneuma) সূর্য্যলোকে অবস্থিতি করেন, ইহাও ষ্টোয়িকগণ কল্পনা করিতেন। চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্ট বিশ্বে দুঃখ ও পাপ কেমন করিয়া আসিল, তাহারও একটি মীমাংসা করিবার জন্য ষ্টোয়িকগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে অনেক দুঃখই প্রকৃত পক্ষে অমঙ্গল নহে। অনেক স্থলে দুঃখ মঙ্গলের নিদান; যেমন যুদ্ধ। যুদ্ধে লোক ক্ষয় হয় বলিয়া পৃথিবী অত্যধিক জনাকীর্ণ হইতে পারে না। যে সকল স্থলে দুঃখকে এরূপভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সেরূপ স্থলে ষ্টোয়িকগণ স্বীকার করেন যে জগতের অসম্পূর্ণতাই (Imperfection) দুঃখ-ক্লেশের জননী। সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া ও প্রণালী সাধারণ বিধিসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল সাধারণ নিয়ম ব্যক্তি বিশেষের অপেক্ষা করে না। সুতরাং সাধারণতঃ সমগ্রের পক্ষে যাহা মঙ্গলাস্পদ, অংশের পক্ষে বা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাহা

মঙ্গলাস্পদ না হইতেও পারে। এই অসম্পূর্ণতার জন্যই জগতে দুঃখকষ্টের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ইংরেজ দার্শনিক মার্টিনোর মতও এইরূপ। সুখ দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সুখী, পাশ্চাত্য জগতে ষ্টোয়িকগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধির (Conception of duty in the abstract) প্রবর্ত্তক।

ষ্টোয়িকগণ বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে আস্থাবান হইলেও দুঃখের উপলব্ধিকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। চতুর্দ্দিকে দুঃখের অস্তিত্ব দেখিয়া তাঁহারা আমোদ প্রমোদকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন। "মধুবিষ মিশ্রিত অন্ন খাইতে গিয়া এমন কে শিল্পিবর আছেন যিনি বিষভাগ পরিত্যাগ করিয়া মধুভাগ গ্রহণ করিতে পারেন?" এই গম্ভীরপ্রকৃতিক ষ্টোয়িক-গণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যার সমর্থন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। রোগ শোক দুঃখ যখন একেবারে চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসে, জীবন যখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠে, তখন সে দুঃখ নিবারণ করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। আত্মবিনাশের মহান অধিকার ভগবানই আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, আত্মহত্যা দ্বারা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার এই চরম অধিকার মানবের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা। (এপিক্‌টেটস্)। দুঃখ তত্ত্বের মীমাংসায় ব্যাপৃত হইয়া ষ্টোয়িকদিগের চিন্তা এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক ফল প্রসব করিয়াছিল।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই বিস্তৃত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দুঃখতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া দার্শনিকগণ কখনও কখনও দুঃখকে একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে দুঃখ পারমার্থিক নহে। আমাদের ভাবনাই সুখ দুঃখের জন্য দায়ী। আমাদের

চিন্তার দ্বারা আমরা একটি ঘটনাকে সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক রূপে দেখিতে পারি। যখন আমার পায়ের আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে, তখন আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে সুখ বা দুঃখের প্রয়োজক বলিয়া মনে করিতে পারি। শারীরিক যন্ত্রণায় যখন আমি অস্থির হইতেছি, তখন আমি মনে করি, যে আমার নিতান্তই দুরদৃষ্ট, আমি সংসারে কেবল কষ্টভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, হয়ত এই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়া অচিরে আমার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে, তাহা হইলেই আমার পুত্র কন্যাদির মুখদর্শনে আমাকে চিরজন্মের মত বঞ্চিত হইতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি......, এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হইলে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিবে, আমি নিশ্চয়ই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিব, এবং জীবনে অভিসম্পাত না করিয়া থাকিতে পারিব না। আর যদি মনে করি, আমার সামান্য পায়ের আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে বইত নয়, আর একটু হইলে আরও গুরুতর ক্ষতি হইত, এমন কি জীবন সংশয় হইতে পারিত। সামান্য আঘাত অল্প-দিনেই ভাল হইয়া যাইবে, যাহারা চিরকালের জন্য উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! এইরূপ চিন্তা করিলে দুর্ঘটনার লঘুত্বের জন্য ও নিজের শুভাদৃষ্টের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। নিজের ইচ্ছার উপর যখন সুখদুঃখ নির্ভর করে, তখন প্রকৃত পক্ষে সুখ দুঃখের স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? (জেম্‌স্ হিণ্টন)

"শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদি বিশেষোপলব্ধেঃ।"

(শাঙ্করভাষ্য ২য় অঃ ২পাঃ, ২ সূঃ)

একই শব্দ, একই স্পর্শ, একই রূপ কেবল ভাবনার পার্থক্য অনুসারে কাহার কিছুতে সুখ, কাহার কিছুতে দুঃখ হইয়া থাকে। কিন্তু সুখ দুঃখ যে কেবল মানবের কল্পনার উপর নির্ভর করে,

বস্তুতঃ তাহাদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, দুঃখের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তাহার মীমাংসা জগতের ধর্ম্মতত্ত্বে একটি বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে; আমি পূর্ব্বেই স্থানে স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি, সুতরাং উপসংহারে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আর দুই একটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ জগতে দুঃখ কেন? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে আস্তিক দার্শনিকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এত দুঃখ ক্লেশের সহিত এক পরম কারুণিক ভগবানের ধারণার সামঞ্জস্য রক্ষা করা অনেকস্থলে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পাপস্পর্শশূন্য শিশুরা যখন বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে, সংসারের একমাত্র অবলম্বন, অন্ধের নয়ন পুত্র যখন অনাথা জননীকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়, ভূমিকম্পে, ভীষণ ঝটিকায় বা জলপ্লাবনে সহস্র সহস্র লোক হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন আমরা অশ্রুসিক্ত নয়নে কেবল ভগবানের করুণার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি না। যিনি বিশ্বাসী, তিনি অবশ্য গভীর বিশ্বাসের বলে মনে করিতে পারেন যে ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে এ সবই ভাল। কিন্তু এরূপ একান্ত বিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই বিরল। অবশ্য যাঁহারা আমাদের অল্পবুদ্ধিতার দোহাই দিয়া জগতের যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ ও নিষ্ঠুর ব্যাপারকে সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিনয় ও নির্ভর উভয়ই বিস্ময়জনক। তাঁহারা বলিবেন, এ সকলই মঙ্গলের জন্য, কেবল আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি সমস্ত বিষয় বুঝিতে সমর্থ নহে। সসীম কি অসীমকে ধারণা করিতে

পারে? খদ্যোতের আলোক দেখিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্যোতিঃ মাপিতে চাহ? এইরূপ দীনতার ভাব লইয়া যাঁহারা জাগতিক মঙ্গলে আস্থাবান, তাঁহাদের বিশ্বাস অসীম। এরূপ বিশ্বাসীর সংখ্যাও বেশী নাই বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খৃষ্টানগণ এই দুঃখনিচয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এক মৌলিক পাপের কল্পনা করিয়াছেন। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা মহাশয়ও নিরন্তর মনুষ্যকে পাপের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত আছেন। পাপই দুঃখের মূল। দুঃখের ফলভোগ করিতেই হইবে, সেইজন্য নরনারায়ণ অথবা নরদেবতা খৃষ্ট (Man in God, God in man—Tennyson) সমস্ত মানবের দুঃখের ভার স্কন্ধে লইয়া অতি নিষ্ঠুর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার ললাটে সেই কণ্টক-কিরীটি যে স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার কনক কিরণে সহস্র সহস্র মানবের হৃদয় আজিও পুলকিত ও আশান্বিত। খৃষ্টান-দিগের স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়। সংসারের নির্ম্মম কশাঘাতে কাতর মানব পরলোকে সমস্ত অত্যাচার ও অবিচারের প্রতীকার আশা করে। পুত্রশোকাতুরা মাতা, স্বামিবিয়োগ-বিহ্বলা পত্নী স্বর্গে গিয়া পুত্র ও পতির দর্শন কামনা করে। হিন্দু দার্শনিকগণের সহিত খৃষ্টানগণের এইখানে একটু প্রভেদ আছে। পৌরাণিকগণ যদিও বিবিধ সুখের উপাদানে তাঁহাদের স্বর্গকে সাজাইয়া লন—দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরবীজন হইতে উর্ব্বশী তিলোত্তমার নৃত্যগীতাদির উপভোগ কিছুই বাদ দেন নাই, তাহা হইলেও দার্শনিকগণ এই স্বর্গকে দুঃখানুষঙ্গবিহীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা এই স্বর্গের জন্য লালায়িত নহেন। পরলোকে গিয়া পুত্রকন্যাদির সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিব এরূপ চিন্তা তাঁহাদের নাই।

পুত্রকলত্রাদির সহিত যে বন্ধন, তাহা মায়ার খেলা মাত্র মনে করিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দু ইহলোকেই সে সকল হইতে বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ইহলোকের অনিত্য সুখের কল্পনা তাঁহারা পরলোক পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া যান না।

খৃষ্টানগণ যেমন দুঃখ ও পাপের জন্য ঈশ্বরাতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র কারণের কল্পনা করিয়াছিলেন, অন্যান্য ধর্ম্মেও সেরূপ কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। আবেস্তায় সৎ ও অসৎ, আলোক ও অন্ধকার (অহুরমজ্‌দ্‌ ও আরিমান) এই দুই প্রকার দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

হিন্দু দার্শনিকগণ এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যে তত্ত্বজ্ঞানকে তাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (সক্রেতিসও বলিতেন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান অভিন্ন—Virtue is knowledge) সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা দুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হিন্দুদর্শনে জন্মান্তরবাদের এবং কর্ম্মফলবাদের আবির্ভাব হইল। যে অসংখ্য দুঃখ ক্লেশ সংসারকে ভয়াকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার হেতু এ জন্মে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এজন্য জন্মান্তরের কল্পনা আবশ্যক হইয়া উঠে। কর্ম্মচক্র নিয়ত ঘূর্ণ্যমান, সুখ দুঃখ সেই কর্ম্মচক্রের নেমী মাত্র। সেই কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ জীবকে সংসারে আসিতে হয়। যে দুঃখ এজন্মে অসহ্য বোধ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বজন্ম বা প্রাক্তনের ফল মনে করিয়া শান্ত হও। কার্ম্মোচ্ছেদের চেষ্টা কর, তাহা হইলেই সংসারবন্ধন খসিয়া পড়িবে। যদি কর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে চাও, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না; নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলে, (Kant's Categorical Imperative—নিরপেক্ষ বিধি) কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিলে (Stoic

Indifference), বাসনার কটাহে দগ্ধ হইতে হয় না। সুখ-দুঃখের অতীত জীব মোক্ষপন্থায় আরূঢ় হইয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন।

(সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। গীতা)

অনেকে বলেন যে সংসারকে যাঁহারা অনিত্য মনে করেন, তাঁহারা সকলেই দুঃখবাদী এবং এই জন্যই ভারতীয় অদ্বৈতবাদ দুঃখবাদের সহিত জড়িত। আমাদের যে অলসতা ও অসাড়তা, তাহাও এই অদ্বৈতবাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য অদ্বৈতবাদ আত্মাভিমানকে খর্ব্ব করিয়া যে কর্ম্মনিষ্ঠাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষ দুঃখের কশাঘাতেই ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং যতই সে সুখকে স্পৃহনীয় ও নিজের আয়ত্ত বলিয়া মনে করে, ততই তাহার কর্ম্ম প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। বোধ হয় দুঃখের তাড়না এবং পুরুষকারাশ্রয়ই পাশ্চাত্য জগৎকে এত কর্ম্মময় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে অদ্বৈতবাদ ও নিষ্কাম কর্ম্মোপদেশের দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন, তাহাই আমাদের মধ্যে অলসতা আনিয়া দিয়াছে। অদ্বৈতবাদ দুঃখবাদকে আশ্রয় করিয়া জন্মে নাই। জগতের দুঃখ-বিমিশ্রিত ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অদ্বৈতবাদী এক উজ্জ্বলতর অনাবিল চিরন্তন সুখের কামনা করিয়াছিলেন। ক্ষণিক সুখবাদের তুলনায় ইহাকে নিত্যসুখবাদ বলিতে পার, কিন্তু ইহাকে দুঃখবাদ বলিলে সঙ্গত হইবে না।

যাহা হউক, দুঃখের তত্ত্ব মীমাংসায় মানবের এত যে ঐকান্তিক প্রযত্ন তাহা কতদূর সফল হইয়াছে? দুঃখ কি কমিয়াছে? যে স্থানে মরুভূমি ছিল, সে স্থান কি পুষ্পের উদ্যানে পরিণত হইয়াছে? এ প্রশ্নের কোনও তাত্ত্বিক (Theoretical) উত্তর

দেওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। দর্শনশাস্ত্র যে ভাবেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করুক না কেন, ব্যবহারতঃ এ মীমাংসার জন্য কেহ অপেক্ষা করে না। সংসারের স্রোত এক মুহূর্ত্তও এ মীমাংসার জন্য দাঁড়াইয়া নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে লোকে সহজেই বুঝিয়া লয় যে সংসারে যত আসক্ত হওয়া যায়, ততই ঊর্ণনাভে মক্ষিকার মত আরও আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। দুঃখের বোঝা ততই বাড়ে। স্বার্থকে যত বড় করিয়া দেখা যায়, ততই প্রকৃত মঙ্গল দূরে চলিয়া যায়। মানুষ আপনার লাভ খুঁজিতে গিয়া কেবল কণ্টকের বোঝা মাথায় করিয়া লইয়া আসে।

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ছান্দোগ্য ৭।১৩

আনন্দ পাইতে হইলে ভূমানন্দের অনুসন্ধান করিবে, অল্পে সুখের তৃষ্ণা কখনও মিটে না।

রস-তত্ত্ব

যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহার নাম রস। রসের আরও অনেক অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল অর্থেরই অন্তরগত ভাব আস্বাদ্যতা। আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলের মধ্যে জিহ্বাই আস্বাদনে বিশেষ সমর্থ। সুতরাং জিহ্বার গ্রহণীয় যে গুণ, তাহাকে সাধারণতঃ রস বলে। চক্ষুর গ্রাহ্য গুণ যেমন রূপ, শ্রবণের গ্রাহ্য গুণ যেমন শব্দ, জিহ্বার গ্রাহ্য গুণকে তেমনই রস বলা হয়। এই রস আবার কটু তিক্ত কষায় অম্ল মধুর লবণ এই কয় ভাগে বিভক্ত। এই সকল রস আস্বাদনে সমর্থ বলিয়া জিহ্বার অপর নাম রসনা। কোনও কটু তিক্ত বা অম্ল দ্রব্য রসনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে রসাস্বাদন হয়। রসনেন্দ্রিয়ে কোনও প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই রসজ্ঞান জন্মে। যে সকল দ্রব্য মুখমধ্যে অর্পিত হইলে এই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিতে পারে না, তাহা রসের জনক বা আস্বাদ্য নহে। একখানি কাচখণ্ড জিহ্বায় দিলে কোনও আস্বাদনই হয় না।

সাহিত্যেও আমরা রসের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু সেখানে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য রূপ রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোনও রসের প্রসঙ্গ নাই। সাহিত্যের রস মনের দ্বারা গ্রহণীয়; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই রসের জ্ঞান হয়। এইজন্য ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষু ও শ্রোত্রের প্রাধান্য। আমরা নয়নের দ্বারা রূপ দেখি, শ্রবণের দ্বারা শব্দ শুনি। কিন্তু নয়ন শুধু আলোক তরঙ্গের দ্বারা নীল পীত লোহিতাদি বর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াই

ক্ষান্ত হয় না। কর্ণ শুধু বায়ু-তরঙ্গের দ্বারা শব্দ গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় না। চক্ষুর দ্বারা যে বর্ণের এবং কর্ণের দ্বারা যে শব্দের উপলব্ধি হয় তাহা জ্ঞান মাত্র। একখানি মোটর গাড়ী রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল,—বুঝিলাম, সেখানি পাটল বর্ণের; বাতাসে দরজা পড়িল, শব্দ কাণে প্রবেশ করিল। ইহাতে দুইটি বিষয়ের জ্ঞান হইল মাত্র। যদি আমি অন্যমনস্ক থাকিতাম, তাহা হইলে বায়ুতরঙ্গ শব্দের জ্ঞান জন্মাইতে পারিত না; গাড়ীখানা কোন্ রঙের তাহাও জানিতাম না। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এইরূপে খণ্ড খণ্ড জ্ঞান মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। সেই খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ক্রমশঃ সমষ্টিভূত হইয়া জ্ঞান-প্রবাহের সৃষ্টি করে। জ্ঞান-প্রবাহ বলিলাম এইজন্য যে, মনের ক্রিয়া বুঝাইতে হইলে, একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কল্পনা করিতে হয়। বায়স্কোপে ছবি যেমন পর পর নূতন দৃশ্য নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত করে, মন ও তেমনি অনর্গল প্রবাহে জ্ঞানের আলেখ্য ফুটাইয়া বহিয়া যায়। কিন্তু এই জ্ঞান-প্রবাহের পাশেই সমান্তরাল রেখার মত আর একটি প্রবাহ মনের রাজ্যে বহে। জ্ঞানের প্রবাহ হইতে সেটি স্বতন্ত্র; অথচ দুইটি এমন পাশাপাশি ভাবে চলিয়াছে যে, একটি অপরটিকে যেন ছায়ার মত অনুবর্ত্তন করিতেছে। সেটিকে রস-প্রবাহ বলিতে পারা যায়। জ্ঞান ও রস এক জিনিষ নহে; ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাবও কল্পনা করা চলে না। এই মাত্র আমরা বলিতে পারি যে, জ্ঞান যেখানে আছে, প্রায়ই রস সেখানে বিরাজিত। জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রকাশ, জ্ঞান প্রকাশশীল পদার্থ। যে ধর্ম্মের দ্বারা আত্মা নিজকে এবং অন্য দ্রব্যকে প্রকাশ করে বা দেখায়, তাহাকে 'জ্ঞান' বলে। আ-ব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুই জ্ঞানের বিষয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন ইহার সাধন।

রস যে জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু, তাহা আমরা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চক্ষুর দ্বারা কোন বস্তু কি বর্ণের তাহা অবগত হওয়া যায়; কিন্তু চক্ষু শুধু বর্ণের জ্ঞান দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। চক্ষু যে সকল বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ দেখিতে পায়, তাহার মধ্যে যথেষ্ট আস্বাদনের বিষয় থাকে। সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে শুধু তাহা জ্ঞানের আকর নহে; পরন্তু উপভোগের সামগ্রী। এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গারোহীরা সেই সু-উচ্চ শিখরের শেষ সীমা দেখিবার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত। ইহাঁদের প্রাণে আছে অদম্য উৎসাহ, মনে আছে ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। কিন্তু দূর হইতে যাহারা কাঞ্চন-জঙ্ঘার তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গরাজি নীলাকাশের নীচে শুভ্র তরঙ্গে লীলায়িত দেখে, তাহাদের প্রাণে কি ভাব জাগে? প্রকৃতির সেই প্রশান্ত গম্ভীর শৈল-লীলায় সে মুগ্ধ মৌন স্তব্ধ হইয়া রহে না কি? ভগবান গিরিরাজের সেই অনন্ত উদার মহিমায় সে বিস্মিত, ভীত ও ভক্তিপ্রণত হইয়া যায় না কি? একদিকে জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎকট সাধনা। অপর দিকে রস; রসের সরল, অবিমিশ্র অনুভূতি। রস অনুভূতির বিষয়। আত্মা যে ধর্ম্মের দ্বারা নিখিল বস্তু-সত্তা হইতে আনন্দ লাভ করে, তাহার নাম রস। আনন্দও আস্বাদনীয়, রসও আস্বাদনীয়, সুতরাং রস এবং আনন্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আনন্দ হইতে রস প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং রসের কার্য্য আনন্দোৎপাদন; এইজন্য রস ও আনন্দের অভেদ কল্পনা করা হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জ্ঞান ও অনুভূতি knowledge এবং feeling চিত্তের দুইটি পৃথক ধর্ম্ম বলিয়া

মনে করেন। জ্ঞান বস্তুর পরিচয় সংঘটন করায়, অনুভূতি সুখদুঃখলক্ষণা। জ্ঞান যেমন মনের একটি অসাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম, অনুভূতিও সেইরূপ। অনুভূতিও চেতনা-লক্ষণযুক্ত; কিন্তু তথাপি অনুভূতি ও জ্ঞান চিত্তের দুইটি পৃথক অবস্থা সূচিত করে। এই অনুভূতির দ্বারা রসের আস্বাদন লাভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা যখন বস্তুর স্বরূপের সহিত চিত্তের পরিচয় লাভ হয়, তখন অনুভূতির দ্বারা তাহার রস-রূপতার সন্ধান পাওয়া যায়। একদিন কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে একজন নূতন মানুষ দেখিলাম। জানিলাম শুধু তাহার বর্ণ, তাহার দৈর্ঘ্য, তাহার অবয়বের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে অনুভব করিলাম তাহার আকর্ষণ। সকল মানুষ দেখিলে ত এমন হয় না। সারা বিশ্বের মধ্যে সেই একজন মানুষ যাহার দর্শনে নীরস হৃদয় সরস হইল। মনের যে আস্বাদনশক্তি আছে, তাহার পরিতৃপ্তি হইল এইখানে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলোর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে। আলোর সম্বন্ধে সেই ক্ষুদ্র প্রাণীদের জ্ঞান জন্মিতে বেশী বিলম্ব হয় না। তাহারা অল্পক্ষণেই শুধু আলোকের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে না; পরন্তু তাহার দাহিকাশক্তি সম্বন্ধেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু তবুও বিরতি নাই, নিবৃত্তি নাই,—এমনই আকর্ষণ যে প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া তবে ছাড়ে। সাধারণতঃ সর্প মানুষকে দেখিলেই পলায়ন করে, কিন্তু মানুষ যখন বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া গান করিতে থাকে, তখন সে তাহার চির-শত্রুর সম্মুখে ফণা নাচাইয়া না তুলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিসের এই তীব্র আকর্ষণ?

বাক্য শব্দের সমষ্টি মাত্র। সুর যোজনা করিলে এই বাক্যের নাম গীত। সঙ্গীত যে প্রাণে কি রসধারার সৃষ্টি করে,

তাহা সকলেই জানেন। এমন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার মন সঙ্গীতে গলে না। ইহাই সঙ্গীতের রস বা মোহিনীশক্তি। কণ্ঠ-সঙ্গীতই হউক, আর যন্ত্র-সঙ্গীতই হউক, হৃদয়দ্রাবী রসস্রাবী শব্দ-ধারাই সঙ্গীত-পদবাচ্য। কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে মনের সেই সম্বন্ধটি কি, যাহার ফলে মন এমন মোহিত হয়?

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। রস কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ। বাক্য-যোজনায় যতই বৈচিত্র্য থাক্, রস না থাকিলে তাহা কাব্য হয় না। কাব্যের এই রস আলঙ্কারিকগণ কর্ত্তৃক নয় প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। বাৎসল্য রস ধরিলে কাব্যের রস সর্ব্বশুদ্ধ দশটি। রস আছে বলিয়াই কাব্যের মাধুর্য্য। দণ্ডী বলেন,—

মধুরং রসবৎ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনৈব মধুব্রতাঃ॥ (কাব্যাদর্শ)

রস থাকিলেই তাহাকে মধুর বলে। বাক্যে এবং বস্তুতে রস থাকে। মধুতে যেমন মধুপ উন্মত্ত হয়, রসে তেমনি ধীমান ব্যক্তিগণ মাতোয়ারা হন। রতি প্রভৃতি মানব মনের যে সকল স্থায়ীভাব আছে, তাহা বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী দ্বারা পরিণমিত হইলে কাব্যের রসসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দুই প্রকার। রসের যাহা বিষয় বা আশ্রয়, তাহার নাম আলম্বনবিভাব। যাহা রস উদ্দীপন করে, তাহার নাম উদ্দীপনবিভাব। অশ্রু-কম্প-পুলক ইত্যাদি রসের সাত্ত্বিক অনুভাব। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী নামে আরও কতকগুলি শারীর ব্যাপার রসাস্বাদনের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা দৈন্য, নির্ব্বেদ, লজ্জা প্রভৃতি। দধি শর্করা ঘৃত মরীচ

কর্পূর প্রভৃতি সহযোগে যেমন অমৃত মধুর রসাল আস্বাদন হয়, তেমনি স্থায়ী ভাবের সঙ্গে বিভাব অনুভাবের অসাধারণ মিলনে রসের অপূর্ব্ব পরিপুষ্টি হয়, ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর মত। হিন্দু আলঙ্কারিকগণ রসাস্বাদন ও তাহার সহায়ক, উদ্দীপক ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি অতি নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু মনের যে গতি-বিশেষ দ্বারা রসানুভূতি হয়, তাহা বিশ্লেষণের অতীত। যে সকল প্রকারে রসের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হয়, তাহাই আমরা বর্ণনা করিতে পারি; কিন্তু মনের যে মৌলিক ধর্ম্মের গুণে রস রূপ অসাধারণ বস্তুর স্ফূরণ হয়, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

রস অখণ্ড, সমগ্র, পূর্ণ। ইহা চিন্ময়, অর্থাৎ ইহা চৈতন্যের রশ্মিপাতে স্বপ্রকাশ। অচেতন অবস্থায় রসের আস্বাদন লাভ হয় না। রস ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর, অর্থাৎ ব্রহ্মের আস্বাদনের মত; এবং লোকোত্তর চমৎকার অর্থাৎ রস এরূপ বিস্ময়কর সামগ্রী যেন ইহা এজগতের জিনিষই নয়।

বস্তুতঃ রস মানবজীবনের এক অপূর্ব্ব রত্ন। বিদ্যুতের চমকে যেমন চরাচর বিশ্ব ক্ষণিকের জন্য উদ্ঘাটিত, আলোকিত হইয়া যায়, রসরূপ পরশমণির স্পর্শে তেমনি বিশ্বসংসার এক মুহূর্ত্তে মধুর হইয়া উঠে। দুঃখ-জর্জ্জরিত, পাপ-কলুষিত মরণাহত এই জগতে রসই "আনন্দরূপমমৃতম্"।

জ্ঞানের দ্বারা আমরা বস্তু বিচার করি, গুণের বিশ্লেষণ করি, কোন্ পদার্থের কি স্বরূপ তাহা যাচাই করিয়া লই। বিশ্বের হাটে কোন্ জিনিষের কি দর, তাহার খোঁজ করিয়া বেড়াই; এইরূপ করিতে করিতে কখন সেই জিনিষের মধ্যে একটি চাখিয়া দেখিলাম, আর অমনি প্রাণে রস-ধারার সঞ্চার

হইল। বিশ্বের হাট আর সাধারণ হাট রহিল না, আনন্দবাজার হইয়া গেল। সেখানে আর শুধু কেনা বেচা, বস্তুপরিচয় নাই, সেখানে কত নাচ গান, ফুলের বাগান, কত চিত্র, কত চারুকলা, কত প্রেম, কত উন্মাদনা, কত মিলন, কত বিরহ,—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! যে ইন্দ্রজালের ফলে এমন অঘটন ঘটে তাহাই রস। ইহাকে মায়া বলিতে হয় বল, অবিদ্যা বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে সৌন্দর্য্যরূপে, মাধুর্য্যরূপে, সঙ্গীতরূপে, চিত্রকলারূপে, প্রেমভক্তিরূপে ওতপ্রোতঃ হইয়া রহিয়াছে। ইহার মূল প্রস্রবণ কিন্তু এজগতে নাই; জগতের অতীত স্থানে ইহার জন্ম। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং।" বিরজা নদীর পরপারে সেই আলোক-লোক অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্—যেখান হইতে স্বর্গঙ্গার মত রসধারা অবনীতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং জীবজগৎকে ধন্য করিয়া দিয়াছে। অতি প্রাচীনকালের ঋষিগণের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হইয়াছিল

রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

তিনিই একমাত্র রস; অন্য কোথায়ও রস নাই। রস না থাকিলে আনন্দ থাকিত না। তিনিই রস, তিনিই আনন্দ। সেই আনন্দ হইতেই নিখিল বিশ্ব জন্মলাভ করিয়াছে। শ্রুতি বলিলেন—আনন্দং ব্রহ্মণোরূপম্। পুরাণ অমনি তাহার অনুবাদ করিয়া বলিলেন, যে সাগর সেচিয়া ভগবানের বক্ষ-বিলম্বিত কৌস্তুভমণি পাওয়া গিয়াছিল, যাহার মধ্য হইতে নীলাকাশের শোভা চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষীর সমুদ্র হইতেই 'অমৃত' উত্থিত হইয়াছিল। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীহস্তে সেই সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন। যাহারা সে সুধা পাইল, তাহারা মৃত্যুর অতীত হইল। শ্রুতি আরও

বলিলেন, "আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রত্যভিসংবিশন্তি।" আনন্দ হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়। মরণেও সে আনন্দের অভাব নাই ; কারণ মরণের দ্বার দিয়াই মানব আনন্দের ধামে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। জীবনে আনন্দ, মরণে আনন্দ, মিলনে আনন্দ, বিরহে আনন্দ—আনন্দের কনককিরণে সমস্ত বিশ্বসংসার ঝলমল করিতেছে !

রসের আস্বাদন শুধু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগায় না, ইহা আত্মাতে এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি আনিয়া দেয়। জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ। বিচার বিশ্লেষণ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি সীমাবদ্ধ। মনের ক্রিয়া ভূতবর্গের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ! অতীন্দ্রিয়, অতি-জাগতিক কোনও বিষয় সম্বন্ধে মন ধারণা করিতে পারে না। সেখানে বাক্য ও মন উভয়ই ব্যর্থ। মনের কোনও গুণই তাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। শব্দগুণ, স্পর্শগুণ প্রভৃতি মনের যে সকল ক্রিয়া—তাহা সেই পরম ও চরম তত্ত্বে আরোপিত হইতে পারে না। সুতরাং শেষকালে "নেতি নেতি" এইরূপেই তাহার নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু এরূপ করিলে ত আর নির্দ্দেশ করা হয় না ; সেইজন্য অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক অজ্ঞেয়তাবাদে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। পরম সত্য অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়—মানুষের চিন্তা ও ধারণাশক্তির অতীত সে-বস্তু। ইহাই হইল জ্ঞানের অবধি বা সীমা।

কিন্তু রসের নিষেকে যে মন সরস হইয়াছে, তাহার অনুভূতির পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়। দার্শনিক যেখানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তির বলে প্রবেশ করিতে পারেন। জ্ঞানী গঙ্গার মোহনা খুঁজিতে গিয়া

বরফে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন, কঙ্করোপলের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কিন্তু ভাবুক ব্যক্তি গঙ্গার শীকর-শীতল বাতাস খাইয়া, গঙ্গাজল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া, তৃপ্ত হয়েন। জ্ঞানী দেখেন ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অচক্ষু, অশ্রোত্র—আবছায়া মাত্র। রসিক ভক্ত দেখেন "অনাদি-রাদির্গোবিন্দঃসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ"—বিশুদ্ধ প্রেমে গড়া মূর্ত্তি। সেইজন্য প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তের স্থান সকলের ঊর্দ্ধে। ভক্ত সবার চেয়ে বড়, কেননা যিনি সমগ্র চরাচর বিশ্বকে একপদে মাত্র ধারণ করেন, সেই ভগবান ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

ইহাতে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে, ভগবানের অসীমত্বের বা অনন্তত্বের বাধা হয়। কিন্তু 'অনন্ত' বলিতে আমরা কি বুঝি? রসের অভিধানে 'অনন্ত' শব্দ নাই। জ্ঞানের ভাষায়ও কি অনন্ত শব্দের কোনও বোধগম্য অর্থ আছে? এ শব্দটি শুধু মনের ব্যর্থতার নিদর্শন—আর কিছুই নহে। আমরা মনের স্বাভাবিক গতির দ্বারা যাহার ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাকেই আমরা অনন্ত, অসীম, প্রভৃতি নঞ্‌তৎপুরুষাত্মক পদের দ্বারা বুঝাইয়া থাকি; কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, এসকল ভগবানের গুণ নহে, হতাশার আক্ষেপ মাত্র।

অর্থাৎ যদি কেহ বলেন যে ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া ক্রিয়া করে এরূপ বলিলে ভগবানের অনন্তত্বের বাধা হয়, তাহার উত্তরে আমি বলি যে নানা পণ্ডিত বহুকাল হইতে যেভাবে অনন্তের কল্পনা করিয়া আসিতেছেন, সেরূপ অনন্তত্ব লইয়া কোনও দার্শনিক মত তৃপ্ত হইতে পারে না। এমন অনন্তের কোনও প্রয়োজন নাই।

বিশ্বের ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা যখন আসনে উপবেশন করিয়াছি, তখন প্রত্যেকটি উপকরণের পাকপ্রণালী অনুশীলন করিতে গেলে বা গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ করিতে গেলে, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ক্ষুধা মন্দ হইয়া আসে এবং সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হইয়া পড়ে। জ্ঞান যেখানে সিন্ধুর ঢেউ গণিবার বিফল চেষ্টায় ব্যথিত, ক্ষুব্ধ ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়, রস সেখানে পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্তির বিমলানন্দ অনুভব করে; হয়ত বা ডুবিতে ডুবিতে কখন রত্নও ভাগ্যে লাভ হইয়া যায়!

রসাস্বাদন দ্বারা আমাদের যে অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি হয়, তাহা কেবল সেই জানে যাহার অনুভূতি হয়। এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ইহা "মূকাস্বাদনবৎ"। বোবা যেমন কোনও আস্বাদ পাইলে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে পারে না, সেইরূপ। ইহার কারণ এই যে, আমাদের বাক্য, আমাদের ভাষা—জ্ঞানের অনুবর্ত্তী! মন যাহা সাধারণতঃ জানিতে পারে, তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহাতেও কি ভাষা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়? ভাব আগে আগে ছুটিয়া চলে, ভাষা খঞ্জের মত বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। তারপর ভাষা ভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্যক্ত করে। ভাব অর্থাৎ জ্ঞান ও সত্যকে সমগ্রভাবে দেখিতে পারে না, খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখে; ভাষা তাহাকে আরও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, চিন্ময়,—ভাষা তাহাকে ব্যক্ত করিবে কিরূপে?

"মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।"

সমুদ্রের দিকে গঙ্গা যেমন অবিচ্ছিন্ন গতিতে অগ্রসর হয়েন, নিখিল রসনিবহের প্রস্রবণ শ্রীভগবানে মানবের অব্যবহিত অহৈতুকী ভক্তিও সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ধাবিত হয়।

একজন লেখক বলেন,—"If it be urged that the existence of conditions limiting the possibilities of the Divine Will is inconsistent with the idea of a God who is infinite, I answer that neither Religion nor Morality nor, again, reasonable Philosophy have any interest in maintaining the infiniteness of God in the sense in which a certain tradition of the schools is accustomed to assert it".···Rashdall's Theory of Good and Evil, P. 237.

চিৎশক্তি ও রসানুভূতি

চৈতন্যের দ্বারা যাবতীয় বস্তু সত্তার উপলব্ধি হয়। যখন চৈতন্য লুপ্ত হয় বা সুপ্তাবস্থায় থাকে, তখন কোনও বস্তুর জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়-জ্ঞান হয়। চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট পদার্থের, কর্ণের দ্বারা শ্রুত পদার্থের অর্থাৎ শব্দের জ্ঞান জন্মে। এইরূপ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারে আমাদের বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান হয়। সুতরাং আমাদের চৈতন্য ইন্দ্রিয়জাত বিষয়জ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এইজন্য 'প্রত্যক্ষ'কে জ্ঞানের একটি প্রধান উপায় বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই এই জ্ঞান জন্মে। এই প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া লই। অনুমান, এবং কাহারও কাহারও মতে উপমিতি জ্ঞানের আকর। বিশ্বাস বা আপ্তবাক্যকেও প্রমাণ বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে অমুক বিষয় তুমি কোথা হইতে জানিলে? তাহা হইলে আমাদিগকে উপরি উক্ত কোনও না কোনও একটির নাম লইতে হইবে। আপ্তবাক্যে সকলে বিশ্বাস করে না। যখন এমন হয় যে, কেহ আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে চাহিতেছে না, তখন হয় সে আপ্তবাক্যের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চায়, না হয় অনুমানের দ্বারা তাহার যুক্তিযুক্ততা সপ্রমাণ করিতে হয়। যেখানে তাহা করা যায় না, সেখানে তর্ক আর চলে না। খৃষ্টানেরা বাইবেল মানেন, হিন্দুরা বেদ মানেন। যেখানে উভয়ের মধ্যে তর্ক বাধে, সেখানে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না! শেষে তর্কের স্থলে গালাগালি বর্ষণ করিয়াই সত্যের জয়-ধ্বজা উড়াইতে হয়।

সুখ দুঃখ

খৃষ্টান মনে করেন, তাঁহার ধর্ম্ম অবিসংবাদিত সত্য, মুসলমান মনে করেন ঈশ্বর এক বই আর নাই। হিন্দুরা কেহ কেহ বলেন ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং, কেহ আবার বলেন, ঈশ্বর বহু হইতে ক্ষতি কি? হিন্দুদের মধ্যে সমন্বয়বাদীরা বলেন—

'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'

ঐ একই তত্ত্ব, কেহ বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন পরমাত্মা, কেহ বলেন ভগবান্। জিনিষ এক।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।

ইহার মধ্যে কোন্ মতটি সত্য? এক না বহু? শ্রুতি বলেন, এক বহু হইয়া জন্মিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতেও গোল মিটিল না। একের সত্তা যখন বহুতে পরিণত হয়, তখন সে বহুর সত্তা কি সেই একেরই মত রহিল, না ছড়াইয়া পড়াতে চুরমার হইয়া গেল? মনে করুন, আমার সম্মুখে যে আয়নাখানি আছে, তাহা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। ইহার প্রত্যেক খণ্ড কি আর আয়না রহিল? আবার মনে করুন, একছড়া মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গেল। প্রত্যেকটি মুক্তা কুড়াইয়া পাওয়া গেল; সে মুক্তার সত্ত্বা ত গেল না। এই যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, ইহার কোন্‌টি আমাদিগকে সত্যে পৌঁছাইয়া দেয়? এইরূপ সংশয়জালে আচ্ছন্ন হইয়া মন দিশাহারা হইয়া পড়ে। ঋষি অমনি জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া দিলেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

বাক্য ত ফিরিয়া আসেই, মন ও পৌঁছিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে প্রত্যক্ষ ব্যর্থ, মন নিরুপায়, অনুমানের পক্ষ ছিন্ন। সুতরাং যতটুকু আপ্তবচনের দ্বারা সারিয়া লইতে পার, তাহারই চেষ্টা দেখ।

যাঁহারা আপ্তবচনে আস্থাহীন, তাঁহারা যুক্তির 'গগনবেড়' জাল ফেলিয়া সত্যকে ধরিতে চেষ্টা করেন, এবং ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়া বলেন 'সত্য অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়'। যদি 'অজ্ঞেয়' না বলিয়া 'দুর্জ্ঞেয়' বলিতেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা নয়—'অজ্ঞেয়'। জানা যায় না, যাইবে না, জানা অসম্ভব। কেহ বলিলেন, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব বা শূন্যতা, তর্কের শেষ কোঠায় পৌঁছিলে, এক হইয়া যায়। কারণ সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত অস্তিত্ব যাহার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা চলে না, তাহা শূন্যতা হইতে বড় বেশী দূরে নয়।

এই সকল দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিলেন যে, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ তর্ক দ্বারা সত্যকে জানিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবেরা গালি পাড়িলেন, বলিলেন—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। অথচ তর্কের দ্বারা, যুক্তি এবং অনুমানের দ্বারা এ সকল বুঝিতে হইবে। তর্কে যে বহুদূর ইহা জানিব কিরূপে? ঐ তর্কেরই দ্বারা। সুতরাং আমাদের বুদ্ধি কোথাও গিয়া শান্তি লাভ করে না, সত্য যদি এক সূচীভেদ্য আঁধার যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা বলেন যে, সত্য বলিয়া কিছু পদার্থ নাই, তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। বরঞ্চ যুক্তির দিক দিয়া বলিতে হয় যে এইরূপ 'নাস্তি'বাদই অধিকতর যুক্তিসহ।

ইহার কারণ কি? আমার মনে হয় কারণ এই যে, চৈতন্যের পায়ে যুক্তির শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া তাহাকে সত্যের দিকে ছুটিতে বলা হইতেছে। যুক্তি কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্য দিয়া (forms & categories) কাজ করে বলিয়া সে তাহা অতিক্রম করিয়া সেই নিয়মাতীত সত্যকে খুঁজিয়া পায়

না। চক্ষু যেমন আলো নহিলে ক্রিয়া করে না, কর্ণ যেমন বায়ু-তরঙ্গ নহিলে বধির, তেমনি কার্য্য কারণ দিক্ কাল প্রভৃতি কতকগুলি নিয়মের অভ্যন্তরে নহিলে তর্ক বা জ্ঞান (Intellect) কাজ করিতে পারে না। কার্য্য-কারণ-পরম্পরা, সংখ্যা, দেশ-কাল প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে সত্য উপলব্ধি করা যায়, তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু তদতিরিক্ত কিছুই আমরা বুদ্ধির দ্বারা পাই না। অতএব দেশকালাতীত কোনও সত্য যদি থাকে, তাহা বুদ্ধির অগম্য—এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এমন কোনও সত্য আছে কি না। যাঁহারা বলেন যে এরূপ সত্য যখন থাকা না থাকা সমান, তখন উহা উড়াইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহারা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষবাদী—অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাই ইঁহারা মানেন। প্রত্যক্ষলব্ধ উপাদানের সাহায্যে যে সকল অনুমান হইতে পারে, তাহাও মানিতে বাধা নাই। কেন না প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল অনুমানে উপনীত হওয়া যায়, তাহা ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই মত দিক্‌কালের উপাধিসমূহের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, ইঁহাদের মতে জাগতিক সত্য হইতে পৃথক কোনও সত্তার সংবাদ আমরা পাইতে পারি না—অর্থাৎ এরূপ কোনও পারমার্থিক সত্য বা তত্ত্ব নাই।

কিন্তু মন ইহাতে সায় দিতে চাহে না। প্রথম বাধা উপস্থিত হয় নিজের দিক্ হইতে। জ্ঞাতা যখন আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করে, তখন সে দেখিতে পায় যে, সে তাহার শোণিত-শুক্র-মেদাস্থি-নির্ম্মিত দেহ হইতে পৃথক। সে আপনার অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানপ্রবাহ হইতেও স্বতন্ত্র বস্তু। এই বস্তুর নাম আত্মা। যে পদার্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কার-পরম্পরা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই আত্মা। এইরূপ

জড়জগতের মধ্যেও কোনও এক, অবিকৃত, অবিচ্ছেদ্য সত্তা বর্ত্তমান আছে—এইরূপ একটা ধারণার হস্ত হইতে আমরা কোনও ক্রমে পরিত্রাণ পাই না। যাঁহারা দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোনও কিছু সত্য আছে, এ কথা স্বীকার করেন না বা জড়জগতের পরিবর্ত্তন শুধু কল্পনার ছায়াবাজি বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে। এই সকল পণ্ডিতেরা শত চেষ্টা করিয়াও জিজ্ঞাসুদিগকে তথাকথিত সরল শান্তির মোহে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই। মানুষের মন সর্ব্বদাই সেই সত্যের জন্য ব্যাকুল হয় যাহাকে—

ধরি ধরি মনে করি
ধরিবারে নাহি পারি।

জড়বিজ্ঞান এইরূপ সত্যের পশ্চাতে ধাবমান হওয়াকে পণ্ডশ্রম মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন প্রত্যক্ষ, অনুমান, পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে যখন মানব বহু মূল্যবান সত্যের সন্ধান পাইতে পারে, তখন ঐ আবছায়া সত্যের ব্যর্থ অনুসন্ধানে ফল কি? বস্তুতঃ তাঁহারা নিত্য নব নব আবিষ্কারের দ্বারা অনেক সত্য বাহির করিতেছেন, যাহা নূতন নূতন ভাবে মানুষের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। বৈজ্ঞানিক সাধনার দ্বারা যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা ঐহিক সত্য। এই ঐহিক সত্যের অন্তরালে পরীক্ষণ-পর্য্যবেক্ষণের অতীত যে একমাত্র ধ্যানগম্য পরমার্থ সত্য নিহিত আছে, তাহারই ধারণার চিরন্তনী চেষ্টার ফলে উপনিষদ্ দর্শনাদি শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। অপরা বিদ্যার প্রভাব পরা বিদ্যার আকাঙ্ক্ষাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সে সত্য লাভ করা যায় কি প্রকারে? যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, যাহা দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, এমন সত্যকে কেমন করিয়া জানিতে পারা যায়? তরল পদার্থ যেমন কোনও পাত্রে পড়িলেই তাহার আকার প্রাপ্ত

হয়, সেইরূপ জ্ঞানও মনরূপ পাত্রে পড়িলেই তাহার আকার প্রাপ্ত হইবে। মনের আকার ঐ দেশকাল কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য পরমার্থ সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়াও চিত্ত জানিতে চাহে, কোথায় সে সত্য? কোন্‌খানে তার বসতি? তার নাম রূপই বা কি? নাম রূপ হইতেছে মনের ভাষা। ঐ ভাষার মধ্য দিয়া নহিলে তাহার কিছুই জানিবার সাধ্য নাই।

কেহ কেহ বলেন আছে বই কি! মন সাধারণ জ্ঞানসূত্রের দ্বারা সত্যকে বাঁধিতে পারিলেও আত্মার এমন একটা শক্তি আছে যদ্দ্বারা ধ্রুব সত্তার ধারণা হয়। তাহাকে বলে ইনটুইশান—অনুভব। জ্ঞানের দ্বারা যাহা জানা যায় না, যাহা বুদ্ধির অগোচর, তাহা অনুভবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিব। জ্ঞানের একটি দোষ এই যে ইহা 'সমগ্র'কে ধরিতে পারে না; বায়োস্কোপের ছবি যেমন একটার পর একটা আসে, তেমনি জ্ঞানের মধ্যে পারম্পর্য্য আছে। পারম্পর্য্য ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না। ঠিক এই কারণে জ্ঞান সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে। এই বিশ্লেষণী প্রবৃত্তির জন্য আমাদের বোধ-শক্তি (intellect) সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না। মনে করুন, আমরা যদি জীবনীশক্তি কি তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়া কেবল বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকে না। কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে অর্থাৎ জীবনীশক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে জীবন আর থাকে না। এই জন্য অনুভব বা ঐরূপ কোনও জ্ঞানাতিরিক্ত ধর্ম্মের সাহায্য লইয়া সত্য লাভের উপায় করিতে হয়। শাস্ত্রকারেরা যোগি-প্রত্যক্ষ বলিয়া একপ্রকার জ্ঞানের কথা বলেন, তাহা ঐ অনুভব জাতীয় ব্যাপার।

আর একটি উপায়ে জ্ঞানের ব্যর্থতার অপবাদ দূর করা যাইতে

পারে। সে উপায় আর কিছু নহে—আমাদের অধিকারবাদেরই মত। অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনা করিতে করিতে এমন একটি স্তরে পৌঁছান যায় যে, যেখানে আর দেশকালের দ্বারা মণ্ডিত করিয়া সত্যকে দেখিতে হয় না। এ কথা ঠিক যে, সকল লাভের মূলেই সাধনা রহিয়াছে। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিব বলিয়া যে মুহূর্ত্তে যাত্রা করা যায়, সেই মুহূর্ত্তেই যে সত্যের দেখা পাওয়া যাইবে এমন হইতে পারে না। সত্যকে জানিতে হইলে বহু সাধনার প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি চাই, শমদম সংযম নিয়ম প্রভৃতি অভ্যাস করিতে হয়, মুক্তির জন্য একান্ত পিপাসা চাই, তবেই সত্য মনশ্চক্ষুর সমক্ষে আবির্ভূত হয়েন। কত যোগীঋষি মনীষী কঠোর সাধনা করিয়া যাহা লাভ করিল, তুমি আমি তাহা ইচ্ছামাত্রেই পাইব, ইহা সম্ভব নহে। আমরা আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতায়ও জানিতে পারি যে, যে বিষয়ে যত নিবিষ্টভাবে চিন্তা করা যায়, যত একনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান করা যায়, সে বিষয় তত পরিষ্কার হইয়া উঠে। ক্রমেই জ্ঞানের গভীরতা ও পরিধি বাড়িয়া যায়।

অনেক বিষয়ে এই মতটি সমীচীন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ইহার একটি প্রধান বাধা এই যে, অধিকারবাদের উপর নির্ভর করিলে দার্শনিক চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। কারণ যদি সাধনা ব্যতীত সত্যকে দর্শন করা না যায়, তবে তর্ক বিতর্ক করিয়া ফল কি? সত্য ত এখন জানিতে পারা যাইবে না, সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল। সাধনা করিয়া করিয়া যখন অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে, তখন আমাদের চিত্তে সহসা একদিন সত্যের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইবে! সুতরাং আপাততঃ সত্যের অনুসন্ধান করা বৃথাশ্রম মাত্র।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, অধিকারবাদের আশ্রয় না লইয়া, বিশ্বাসের কুহেলিকাময় কক্ষে প্রবেশ না করিয়া বা

অনুভবের রহস্যময় দ্বার দিয়া না হইলে আমরা সত্যের কোঠায় পৌঁছিতে পারি না। আমার এস্থলে বক্তব্য এই যে, আমরা ইচ্ছা করিয়াই হয় ত সত্যের উপলব্ধিকে এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছি। সত্য আমাদের এত নিকটে থাকিতেও আমরা কস্তুরী মৃগের মত ঘুরিয়া মরিতেছি। এত নিকটে থাকিতেও যে আমরা সত্যের সন্ধান পাই না, তাহার কারণ এই যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা মাঝখানে একটি অভ্রভেদী প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছি এবং শেষে সেই প্রাচীর পার হইবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছি।

আমি এ কথা কেন বলিতেছি, তাহার হেতু এই যে, ঋষিরা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, আমরা অমৃতের পুত্র। তাঁহারা বলিয়াছেন যে একবার পরাৎপর সত্যমূর্ত্তিকে দর্শন করিলে আর কোনও সংশয় দ্বিধা থাকে না। এ দেশের এবং অন্য দেশের মনস্বীরা সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা একবাক্যে আমাদিগকে মন্দিরপথে চালিত করিতেছেন। যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, তাহার জন্য কি এমন করিয়া মানুষের চিৎশক্তি ছুটিতে পারে? মানুষের চিৎশক্তি কি? তাহাই একটু চিন্তা করা যাউক। শুধু জ্ঞান আহরণ করাই কি ইহার কার্য্য? আমরা জ্ঞান আহরণ করি কি প্রকারে, যদি তাহারই আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে যে সকল উপাদান আমাদের চিত্ত আহরণ করে, তাহা কালের সূত্র দিয়া মন মালা গাঁথিয়া লয়। চোখ দেখিল রূপ, নাসিকা পাইল গন্ধ, স্পর্শ ত্বকের দ্বারা শীতলতা বোধ করিল অথবা নিশ্চয় হইল—এইরূপে জাগতিক সত্য মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন সেই খণ্ড-খণ্ড জ্ঞানগুলি সাজাইয়া লইল, গাঁথিয়া লইল তাহার ঐক্যের সূত্রে। এইরূপে জ্ঞানার্জ্জন হইল। কিন্তু এ জ্ঞান পাত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। কাহারও চক্ষু ভাল ক্রিয়া করিল না, কাহারও শ্রবণেন্দ্রি-

য়ের সবলতা নাই ; এইরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি একই বস্তুকে কতকটা ভিন্ন ভিন্ন রকমে জানিল। তাহা হইলেও কাজ চালাই-বার পক্ষে ইহা যথেষ্ট। ভাষা এই কাজ চালাইবার সহায়তা করে। 'হস্তী' বলিতেই সকলে বৃহদাকার এক জন্তুকে বুঝে। কাহারও মনে ইহার আকৃতি, কাহারও মনে শুণ্ড, কাহারও মনে দন্ত উদিত হয়। সুতরাং মোটামুটী দ্রব্যজ্ঞান হইতে বাধা হয় না। কিন্তু কাহারও মনে হস্তী জন্তুটি সর্ব্ববিষয়ে কিরূপ, তাহা প্রকট হইল না। এইরূপ হঠাৎ কেহ 'সাপ' বলিলে আমরা দশহাত পিছাইয়া যাই, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সাপের সম্বন্ধে সকলেরই একই রকমের ধারণা যে মনে আসে, তাহা নহে। কিন্তু যে টুকু আসে জ্ঞানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। খুঁটিনাটি যত ইচ্ছা, জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমগ্রভাবে একটি সত্যকে আয়ত্ত করিবার শক্তি জ্ঞানের নাই, বলিয়া বোধ হয়। যে সমগ্রতা ইহার দ্বারা পাওয়া যায়, তাহা ঐ প্রতীতির ঐক্য মাত্র Unity of apperception.

মানুষের চিৎ শক্তি শুধু জ্ঞানে পর্য্যবসিত নহে। আমি পূর্ব্বে এই 'ভারতবর্ষে'ই রসতত্ত্ব নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, চিত্তের যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, তেমনি আস্বাদন করিবার শক্তি আছে। এই শক্তি নিবিড় অনুভূতির দ্বারা পুষ্ট। আমার যে স্বাভাবিক আনন্দ-স্বরূপতা আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু এই আনন্দ-ধর্ম্ম যে জ্ঞানের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত, এ কথাটি আমরা জানিয়াও ভুলিয়া যাই। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান যখন মনের ক্ষেত্রে আসিয়া সজ্জিত হয়. তখন তাহার মধ্যে যে একটি আনন্দেরও সূত্র থাকে, তাহা আমরা ভুলিলে চলিবে না। আমি পূর্ব্বে যাহাকে কালসূত্র (unity of time) বলিয়াছি, তাহাকে কেহ কেহ

স্মৃতি-সূত্র এবং কেহ কেহ লক্ষ্য-সূত্র (unity of purpose) বলেন। উভয়ত্রই পরোক্ষভাবে আনন্দের ধারা বর্ত্তমান। স্মৃতি যে আনন্দের উপর নির্ভর করে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহাতে আনন্দ নাই, কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয় না, মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, তাহার স্মৃতি রক্ষা করা কঠিন। এইরূপ লক্ষ্য সম্বন্ধেও বলা যায়। কৃমিকীট হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জীবজগৎ এই আনন্দ-বস্তুকে কোনও না কোনও ভাবে লক্ষ্য করিতেছে। এই আনন্দ হইতেই জীবনের সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত প্রচেষ্টা জন্মলাভ করে। চৈতন্য (consciousness) হইতে আনন্দকে পৃথক করা যায় না। চৈতন্যের মূলে পরম আস্বাদনের বিষয় এই আনন্দ ক্রিয়া করিতেছে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, মন যখন প্রজাপতির মত খণ্ড খণ্ড জাগতিক সত্য-সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন আনন্দস্বরূপিণী চিদ্বৃত্তি সত্যের সমগ্র মূর্ত্তির আভাস আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করে। এই আনন্দের অনুভূতি জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত চৈতন্যের সমগ্রতা ঐক্য ও নিশ্চয়তা সম্পাদন করে। সেই জন্য মন যখন জ্ঞানের দ্বারা কোনও সত্যকে ধরিতে পারে না, তখন 'বিশ্বাস' 'অনুভব' প্রভৃতির শরণ লইতে হয়।

জ্ঞানের রাজ্যে যাহা গরমিল থাকে, রসের ক্ষেত্রে তাহা মিলিয়া যায়। আমরা জ্ঞানকে স্বতন্ত্রভাবে দেখি বলিয়াই চৈতন্যের রস-সামর্থ্যের কথা ভুলিয়া যাই। একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মনে করুন, যে কখনও আম খায় নি, তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে আম কি পদার্থ। কিন্তু আস্বাদনের দ্বারা আমকে যেমন জানা যায়, ঐ বিশ্লেষণ-সমন্বিতা বর্ণনার দ্বারা তেমন জানা কি যায়? সুতরাং রসানুভূতির একটা চমৎ-

কারিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা সত্যকে শুধু 'জানি' না, 'আস্বাদন'ও করি। আপনারা বলিবেন হয়ত যে আস্বাদনও জ্ঞানের এক প্রকার-বিশেষ। সচরাচর মনোবিজ্ঞানে আস্বাদনকে জ্ঞানের একটি শাখা বলিয়া গণনা করা যায়। কিন্তু সে আস্বাদন-যোগ্য রস কটুতিক্ত কষায়াম্ল মধুর প্রভৃতি, যাহা জিহ্বার দ্বারা লাভ করা যায়।

চিত্তের যে আস্বাদনের কথা আমি বলিতেছি, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত। আমাদের পক্ষে যাহা সত্য, তাহা রসবস্তু না হইয়া পারে না। নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, নিরবদ্য যে সত্য, যাহা 'নেতি' 'নেতি' পদের দ্বারা বিশেষিত, তাহা আনন্দময় চিদ্‌ঘন আত্মার সত্যলালসা চরিতার্থ করিতে পারে না। পরম সত্য যদি রস-স্বরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে তাহা আমাদের চিত্তরূপ আধারের আধেয় হইতে পারিত না। সে সত্য চিরদিন এক অন্ধকারসমাচ্ছন্ন রাজ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিত। তাহার সুন্দর মনোমোহন রূপ আমাদের মানস নয়নে উদ্‌ভাসিত হইয়া অনন্তকালের জন্য মানুষের চিত্তকে এমন ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিত না। কিন্তু তাহা বলিয়া চিত্তের রসবোধ যে পরমার্থ সত্যকে একেবারেই আমাদের গোচরীভূত করিয়া ফেলিবে, এমন হইতে পারে না। সাধনার দ্বারা এই রসোপলব্ধি যখন ঘনীভূত হয়, তখন সত্যের অমলশুভ্র নিরুপাধি রূপ চিত্তে প্রতিফলিত হয়। তখন যুস্মৎ-অস্মদের প্রভেদ থাকে না। চিত্তের তৎকালের অবস্থায় বলা যায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

আমার বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই যে, জ্ঞানশক্তি চিত্তের একটি ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্য বা Consciousness কেবল জ্ঞানের দ্বারা নির্ম্মিত নহে। জ্ঞান ইহার একটি অংশ মাত্র। সত্যকে জানিতে হইলে সমস্ত চিৎসত্তা দিয়া জানিতে হয়। এই সমস্ত চিৎসত্তার

মধ্যে রসানুভূতি অনেকখানি স্থান অধিকার করে। ইহাকে বাদ দিয়া শুধু জ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক সত্য লাভ করা যায় না। ঐহিক সত্য অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা জানিতে হইলেও এমন একটি বোধৈক্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। মনে করুন, আমি যখন চক্ষু দিয়া একটি ফুল দেখিতেছি, তখন তাহার রূপের সঙ্গে সঙ্গে মনে মাধুর্য্যের আস্বাদনলাভ হয়। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যায় যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের জ্ঞান শুধু চক্ষুর উপর নির্ভর করে না। কারণ যখন চক্ষু কোনও বস্তু দেখিতেছে, কর্ণ কোনও জিনিষ শ্রবণ করিতেছে, তখন সেই একই সময়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয় অল্পাধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া সেই চাক্ষুষ জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করিতেছে। একটি কমলা লেবু যখন চক্ষু দেখিল, তখন জিহ্বা আর্দ্র হইয়া উঠিল, নাসা তাহার গন্ধ স্মরণ করিয়া লইল—এইরূপ বহু শারীর ব্যাপার ঐ চাক্ষুষ জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। চক্ষু প্রধান বলিয়া আমরা ঐ প্রসঙ্গে চক্ষুর কথাই ভাবি; তাহার অভ্যন্তরে যে আরও বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা ভুলিয়া যাই। সেইরূপ যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আমরা তাহার প্রণালী লইয়া এত ব্যস্ত থাকি যে সমগ্র চৈতন্য যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা ভুলিয়া যাই। সূর্য্য-গোলকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শুধু ভাবি কি তেজ, কি উজ্জ্বলতা, চক্ষু ঝলসিয়া আসে। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অন্তরালে আত্মা সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অচিন্ত্য শক্তির লীলা দেখিতে পায়। ঐ ধারণাতীত বৃহৎ পদার্থ-সত্তার মধ্যে দেখিতে পায় বিশ্ববীজ, বিশ্বাদ্যকারণ, জীবনীশক্তির মূল প্রস্রবণ—যাহা মানবের ধীশক্তিকে প্রণোদিত করে—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অজানার রূপ *

অজানার রূপ বলিতে প্রহেলিকার মত শুনায়। যাহা অজানা বা অজ্ঞেয়, তাহার আবার রূপ কি? অ-রূপ বলিয়াই ত অ-জানাকে অজানা বলে। রূপ থাকিলে অজানা যে জানা হইয়া যায়। সুতরাং আমার এই নামকরণ অনেকের নিকট প্রহেলিকার মত ঠেকিতে পারে। তবে প্রহেলিকার যতই দোষ থাকুক না কেন, একটি মস্ত গুণ এই যে, সব প্রহেলিকারই কোনও না কোনও সিদ্ধান্ত আছে, মীমাংসা আছে, উত্তর আছে। আমি সে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিব কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদের সম্বন্ধেই আমরা 'জানা' এই বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়া থাকি। আর যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয় না, তাহাকেই সচরাচর অ-জানা আখ্যা দেওয়া হয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, জানা ও অজানা আলো ও আঁধারের মত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। উভয়ে পাশাপাশি থাকিয়া উভয়কে সার্থক করিতেছে। যেটুকু আমরা জানি, তাহা লইয়া যদি একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সে বৃত্তের কেন্দ্রের নিকট হইতে পরিধি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জ্ঞান বিরলতা প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে অজ্ঞেয়ের পরিসর ক্ষেত্রে মিশিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা যাহা জানি, তাহার অপেক্ষা যাহা জানিনা, তাহা পরিমাণে অনেক বেশী। আবার যাহা জানি, তাহাও ভাসা ভাসা ভাবে

*দিল্লী সাহিত্য সভার অধিবেশনে পঠিত।

জানি। জ্ঞানের সে আলোকটুকুও যেন কুয়াসায় ঘিরিয়া রহিয়াছে।

সেইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করেন যে, প্রত্যক্ষের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা আদৌ জানা নহে। আমরা যেখানে জানি বলিয়া স্পর্দ্ধা করি, সেখানে বস্তুতঃ কিছুই জানিতে পারি নাই। প্রত্যক্ষের অতীত যে সত্য রহিয়াছে—যাহা সহজ জ্ঞানে জানা যায় না, তাহাকেই বলে প্রকৃত জানা। যাঁহারা এই অজানাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছেন, "এসব মিথ্যা—সে-ই সত্য"।

"ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা।"

তাঁহারা বলিয়াছেন, সে এক অখণ্ড, প্রতিযোগিবিহীন সত্য।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"
"একমেবাদ্বিতীয়ম্॥"

সে সত্যকে একবার কোনও প্রকারে জানিতে পারিলে, হর্ষ-শোক আর থাকে না। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" আনন্দের যে ক্ষীণ নদীটি আমাদের প্রাণে মাঝে মাঝে তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যায়, তারই মূল প্রপাতে যদি কোনও দিন গিয়া পৌঁছিতে পারি, তবে এ মর-জগতের আনন্দকে দুঃখ বলিয়াই বোধ হইবে। সেইজন্যই একবার খোঁজ কর সেই অজানাকে, যার অমৃতধারা-নিষেকে জীবনের সমস্ত দুঃখ-জ্বালা, সমস্ত সংশয়-সন্দেহ, সমস্ত জরা-মৃত্যু-শোক নিমেষে মুছিয়া, দূর হইয়া যায়।

"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"

সকলে একথা স্বীকার করেন না। বাহিরে আমরা যাহা নিত্য দর্শন করি, শ্রবণ করি, স্পর্শ করি, তাহাই আমাদের কাছে সত্য। আমরা তদতিরিক্ত কিছুই জানিনা, এবং জানিতেও পারি না। নিত্য-নিয়ত যে সকল শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-রূপ-রস আমাদের ইন্দ্রিয়-পথের পথিক হইতেছে, তাহা লইয়াই ত আমাদের জগৎ। জগৎ অর্থে যাহা গতিশীল—বায়োস্কোপের ছবির মত আমাদের সম্মুখ দিয়া নানা রূপ, নানা বৈচিত্র্য, নানা শব্দ প্রতিনিয়ত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে; তাহার ঊর্দ্ধ, অধঃ বা পশ্চাৎ কিছুই নাই। থাকিলেও তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

এই জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালে যদি কিছু থাকে তবে তাহাই অজানা—"The Great Unknown"। সেণ্টপল এক Great Unknown Godএর কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু হাক্স্লি বলিলেন, The absolute is Unknown। আমি প্রমাণ পাইলে সকলই স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রমাণ কই? সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা খচিত এই বিচিত্র বসুন্ধরা তাহার অজস্র ঘটনা-পরম্পরার স্রোত বহাইয়া দিতেছে; এবং সেই স্রোত অনন্ত তরঙ্গ-বিভঙ্গে আমার জ্ঞানের তটভূমিতে নিয়ত আহত হইতেছে। তাই আমি তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইতে পারিতেছি। যাহা কিছুতেই ধরা দেয় না, যাহা আমার জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আসিতে চায় না, তাহাকে "অজানা" বলিব বই কি! তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, "The Absolute is Unknown"

কথাটি শুনিতে মন্দ শুনায় না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, জ্ঞানের এই যে গণ্ডী আমরা সৃজন করিয়া লইয়া, বেশ স্বচ্ছন্দ-চিত্তে তাহার মধ্যে নিবদ্ধ হইতে চাহিতেছি,

সে গণ্ডীটি নিতান্ত কল্পিত। আমরা যখন কোনও বস্তু জানি, তখন হিসাব করিয়া দেখিলে দেখি যে, তখন অতি অল্পই জানা হইয়াছে। মনে করুন, একটী গোলাপ ফুল দেখিলাম। তাহার সুন্দর বর্ণচ্ছটা, সুমিষ্ট গন্ধ, পাপ্‌ড়ির উপর পাপ্‌ড়ির বিচিত্র সংস্থান, কোমল স্পর্শ—এই সকল আমার জানা। কতবার এই সকল আমি দেখিয়াছি,—অতি পরিচিত ফুল এই গোলাপ। ইহার দর্শনমাত্রেই আমার মন আনন্দে নাচিয়া উঠে, এই ত জ্ঞান। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, গোলাপ ফুল জানি না? খুব ভালই জানি।

কিন্তু যিনি গোলাপের চাষ করিতেছেন, বা গোলাপ হইতে আতর প্রস্তুত করিয়াছেন, বা যিনি উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ, তিনি বলিবেন, "তুমি গোলাপের সম্বন্ধে কিছুই জান না।" শুধু বাহিরের নিতান্ত সাধারণ বিষয়—যাহা পশু পক্ষীতেও জানিতে পারে, তাহাই তুমি জানিয়াছ। ইহাকে কি গোলাপ জানা বলে? কোনও পুস্তকের প্রচ্ছদপট দেখিয়া, তাহার চক্‌চকে সোণালী কিনারা দেখিয়া, এবং তাহার ওজন অনুভব করিয়া কি কেহ পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞানের অভিমান করিতে পারে? বস্তুতঃ গোলাপের সম্বন্ধে আমরা সে বিশেষজ্ঞের নিকটে নিতান্তই অজ্ঞ। কোন্-কোন্ সময়ে কোন্-কোন্ দেশে গোলাপ ফোটে, তাহা জানিনা। গোলাপের বর্ণ-বিন্যাস কেমন করিয়া হয়, কত বিভিন্ন বর্ণের গোলাপ আছে, তাহা জানিনা। এ গোলাপটি কোন্ শ্রেণীর গোলাপ জানিনা। একটি গোলাপ ফুল দেখিলে সকলের মনে সমান ভাব হয় না; কেন হয় না, তাহা জানিনা। কেহ লক্ষ্যই করিল না; কেহ নিজের বাগানে রোপণ করিবে বলিয়া চারা সংগ্রহের উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। কেহ তুলিয়া লইয়া নিজের বক্ষোপরে ঈষৎ ঈশান

কোণে সগর্ব্বে ঝুলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন; কেহ প্রিয়তমার করকমলে প্রীতির উপহার দিলেন; কেহ বা দেবপূজার জন্য সযত্নে পুষ্পপাত্রে সাজাইয়া রাখিলেন, এবং পূজান্তে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলেন। এরূপ কেন হয়, তাহা জানিনা। সুতরাং আমরা যাহা জানি, তাহাও জানিনা।

আমরা যে সকল বস্তু জানি বলিয়া মনে করি, তাহাদের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম্ম আছে। এই সাধারণ ধর্ম্মগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে, আমাদের বক্তব্য বিষয় আরও পরিস্ফুট হইবে। মনে করুন, আমাকে আপনারা অনেকেই জানেন। কিন্তু কি জানেন? আমি ভাল লোক কি মন্দ লোক এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিবে। কেহ-কেহ বলিবেন—জানিনা। নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া মতামত প্রকাশ করিতে হইলে বলিবেন—বিশেষতঃ কাগজে কলমে যদি বলিতে হয়—'Know nothing against his moral character'। আমরা অনেক সময়ে এই অজানার আশ্রয় লইয়া থাকি। এটা যে খুব নিরাপদ অ-জানা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এইরূপ আমার অনেকখানিই আপনাদের অ-জানা। আর আজ যে অজানার রূপ আপনাদের নিকটে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছি, তাহাও যদি [illegible] অ-জানা রহিয়া যায়, তবে ত আমার প্রায় ষোল আনাই আপনাদের অজানা থাকিবে। প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধেই মতভেদ; কাল, দেশ, নিমিত্ত প্রভৃতি গুণ, যাহা নিয়ত আমাদের ব্যবহারে লাগে, তাহার সম্বন্ধেও কি কম গোলযোগ। আপনার ঘড়িতে ৫৷৷০টা—একটু fast আছে; আমার ঘড়িটাই ঠিক—৫টা ২০; না, ওটাও কিঞ্চিৎ slow আছে। তবে ঠিক কোন্‌টা? তোপ ঠিক ১২টায় পড়ে ত? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ—ঠিক একই সময়ে কি আসে? তবে মাঝে মাঝে পঞ্জিকা-সংস্কারের প্রয়োজন

হয় কেন? কিছুরই ঠিক নাই। বস্তু সমূহের গুণরাশির মধ্যে সাধারণ গুণ খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ল্লভ। সাধারণ গুণ অর্থাৎ এমন গুণ, যাহা সকলের নিকট সমান। যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, অবিচল—এমন গুণ কোথায়?

তবে ইহা জোর করিয়া বলা যায় যে, সকল জ্ঞেয় বস্তুরই একটা না একটা রূপ আছে, এবং কোনও না কোনও নাম আছে। নাম, রূপ লইয়াই জগৎ। এত যে পরিবর্ত্তন হইতেছে জগতে তাহার মধ্যে নাম আর রূপেরই খেলা। কাল আর আজ প্রায় একই রকম; সময়ের কল ঘুরাইয়া কালকে আজ করিয়া দিয়াছে। আবার প্রভাতাগমে কাল হইয়া যাইবে। দুটি দিনের মধ্যে রূপের বড় প্রভেদ নাই; কিন্তু কাল ছিল ৩রা চৈত্র, আজ ৪ঠা; নামের ছাপ মারিয়া আমরা চিনিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। সমস্ত বিশ্বসংসার একটী প্রকাণ্ড নামের ক্যাটালগ। নাম নহিলে আমাদের চলেনা। সহরের নাম দিল্লী, মহল্লার নাম দরিয়াগঞ্জ, বাড়ীর নাম, রাস্তার নাম, বক্তার নাম, বক্তৃতার নাম, সভার নাম, সভাপতির নাম—এই নামের মালা গাঁথিয়া একটী বিষয়ের পরিচয় করিতে হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এই নামের প্রভাব। সেইজন্য অনেকে বলেন যে, নাম ছাড়া আর কিছুই নাই। নামের ছড়া বাঁধিয়া আমরা এই জগৎ রচনা করিয়া লইয়াছি। "কুকুর ডাকিতেছে" এই দুটী কথায় একটি বিষয়ের ধারণা হইল; কিন্তু কুকুর একটী শব্দ, ডাকিতেছে আর একটী শব্দ। শব্দই নাম। এই দুই শব্দ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। আপনারা বলিবেন, শব্দ আছে বটে; কিন্তু শব্দের অতিরিক্ত একটী সত্য ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহাকে শব্দের দ্বারা আমরা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি?—কুকুরের ডাকা একটি বাস্তব ঘটনা, ঠিক কথা। কিন্তু

সে ঘটনা যেভাবেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করি না, শব্দ ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। সেইজন্য কবিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বাগর্থ নিত্যসম্বদ্ধ; অর্থাৎ বাক্য ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য। বাক্যই নাম। নাম ও নামীর ভেদ নাই—একথা বৈষ্ণবেরাও অন্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

নাম ও রূপের অতি নিকট সম্বন্ধ। কোন পরিচিত নাম বলিলেই, আমাদের মনের মধ্যে একটা রূপ জাগিয়া উঠে। কমলালেবু বলিতে আমাদের মনে একটী বিশিষ্ট বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ-সম্পন্ন বর্ত্তুল বস্তুর রূপ মনে পড়ে। আঙ্গুর বলিতে আর এক রকমের বস্তুর কথা মনে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যেক বস্তুরই কোনও না কোনও রূপ আছে। এখানে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিতেছি - shape or form। কেহ বলেন যে, জগৎ এই বিভিন্ন রূপেরই সমষ্টি মাত্র। রূপ আমাদের প্রত্যক্ষের গোচর হয়; রূপ ভিন্ন আর কিছুইত আমরা জানিতে পারি না।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আপাতদৃষ্টিতে নাম ও রূপ বই আমরা কিছুই জানিতে পারি না। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিয়া বসি যে; নাম রূপই সব। নাম কাণে শুনি, মুখে বলি; রূপ নয়নে দেখি, স্পর্শে অনুভব করি। ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারাই এই জ্ঞান জন্মে। সেই জন্যই আমরা ইন্দ্রিয়কেই জ্ঞানের একমাত্র দ্বারস্বরূপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু জ্ঞান হয় কই? কমলালেবু বলিতে আমরা শুধু কি নামরূপ মাত্র বুঝি? গোলাপ কি বস্তু নয়; গোলাপের কি অন্য কোনও সত্তা নাই, শুধু একটা নাম আর শুধু একটা গঠন? হাঁড়ি, সরা, কলসী মৃত্তিকা হইতেই জন্মিয়াছে,—সে গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেল, সব মাটী হইয়া যাইবে,—একই মৃৎ পদার্থ, কেবল নাম ও রূপের যা প্রভেদ! মৃত্তিকার একটি রূপকে বলি হাঁড়ি, আর এক

রূপান্তরকে বলি কলসী, ইত্যাদি; শুধু নামের ফের, শুধু রূপের তফাৎ। সেইজন্য কেহ বলেন যে, ঐ নাম আর রূপ বই আর কিছুতে আমরা পৌঁছিতে পারি না। আবার কেহ বলেন যে তাহা নহে; ইহাদের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সত্য আছে—সে সত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য নহে। হাঁড়ি কলসী খুরির মধ্যে যেমন একটি অন্তর্নিহিত সত্তা রহিয়াছে মৃত্তিকা,

বাচারম্ভনং বিকার-নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

তেমনি নিখিল বস্তুর মধ্যে এক নিগূঢ় সত্তা আছে, যাহার বহিরাবরণ এই নাম-রূপের বৈচিত্র্যময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। এই সত্তাই সত্য, অপর সকলই মিথ্যা। আমরা যাহা জানি না তাহাই সত্য; যাহা জানি বলিয়া অভিমান করি তাহা সত্য নহে—সত্যের আভাস বা ভান মাত্র।

তুলনা করুন :—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতং অবিজানতাং।

(কেনোপনিষৎ)

যদি কেহ নদী বা তড়াগে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে করে যে, আমি চন্দ্র দেখিলাম, তাহা হইলে তাহার দশা যেরূপ হয়, আমাদের সেইরূপ। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়-রচিত কায়ব্যূহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সত্যের যে রূপ দেখিতেছি, তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র। প্লেটো তাঁহার গুহাবরুদ্ধ মানবের প্রস্তাবনা (Plato's Parable of the cave) দ্বারা এই কথাই বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা বিম্ব জ্ঞান। বাহিরের রূপ তাহার বিষয়। শ্রুতিও বলেন, ইন্দ্রিয় বহির্ম্মুখ, প্রকৃত জ্ঞান অন্তর্ম্মুখ।

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠোপনিষৎ

বিধাতা ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন; সেই কারণে অন্তরাত্মাকে কেহ দেখিতে পায় না। অমরত্বকামী হইয়া কোনও ধীর ব্যক্তি যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই প্রত্যগাত্মাকে দেখিতে পান।

দুই রকমের দৃষ্টি আছে,—এক নিত্য আর এক অনিত্য। এইজন্য তত্ত্ববিদ্যার এক নাম দর্শন। আমরা চক্ষুর দ্বারা যে দর্শন করি, তাহা প্রকৃত দর্শন নয়, সত্যের দর্শন নয়। জ্ঞানের দ্বারা দর্শনই সত্য দর্শন।

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

নিত্য দৃষ্টি ব্যতীত সত্যের উপলব্ধি হয় না,—অনিত্য দৃষ্টির দ্বারা কেবল অসত্য বা আপাত সত্যের ভ্রান্ত জ্ঞান হয় মাত্র। উপনিষৎ বলেন যে সৃষ্টির রহস্যময় প্রণালীতে সত্যকে এক যবনিকা বা তিরস্করণীর দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে; সেই যবনিকা উঠাইয়া লইলেই সত্যের সাক্ষাৎকার হয়। যাঁহারা সত্যের মায়ারূপ মেঘাবরণবিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল স্বরূপ দেখিতে পান, তাঁহাদিগকে বলে মন্ত্রের দ্রষ্টা অথবা ঋষি। কবিও গাহিয়াছেন—

ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু
দেখাও তব চির-আলোক-লোক। —রজনীকান্ত সেন

কিন্তু সত্যের কি রূপ আছে? সত্যকে ত আমরা অ-রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ। কঠোপনিষৎ

তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন, গন্ধহীন, রসহীন নিত্য, অক্ষর বস্তু।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্

সেই পরব্রহ্মের কলা বা অংশ নাই, অর্থাৎ দেশের দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি পরঃ ত্রিকালাৎ—কালের দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি নিরঞ্জন অর্থাৎ কোনও অঞ্জন বা চিহ্নের দ্বারা তাঁহাকে চিহ্নিত করা যায় না। অধিক কি, বাক্য তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। মনেরও সে পর্য্যন্ত যাইবার শক্তি নাই।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

বাক্য যাঁহাকে বিশেষণে বিশেষিত করিতে পারে না, মন যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথাই বলা চলে না।

শাঙ্করভাষ্যে দেখিতে পাই, বাস্কলি নামক ঋষি বাধ্ব ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম কিরূপ?" বাধ্ব বলিলেন, "ওহে শোন" এই বলিয়া তিনি 'তুষ্ণীং বভূব'—চুপ করিয়া রহিলেন। তখন আবার বাস্কলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; বাধ্ব বলিলেন, 'বলিতেছি শোনো'—বলিয়া চুপ করিলেন। বাস্কলি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুতেই যখন তিনি বুঝিতে পারেন না, তখন বাধ্ব ঋষি বলিয়া উঠিলেন, "আমি ত

বলিতেছি, তোমরা না বুঝিলে আমি কি করিতে পারি?” বস্তুতঃ যাহা অজ্ঞেয়, তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। *

উপনিষৎ সেইজন্য ব্রহ্মকে নেতি নেতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন, এইরূপ ভাবে পরিচয় দিয়াছেন। ‘স এষ নেতি নেতি আত্মা’ (বৃহদারণ্যক) ইহা ব্যতীত উপায় কি? তিনি যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অচক্ষু, অবর্ণ, অশ্রোত্র, অপাণিপাদ ও তিনি “অস্থূলম্, অনণু অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনো, অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্।”

তিনি নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্ব্বিকার, নির্জ্জর, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না—তিনি absolute। কিন্তু মানুষ এমন করিয়া এক অজ্ঞাত অজ্ঞেয় সত্তাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এইমাত্র জানিয়া কি সন্তুষ্ট হইতে পারি যে, সত্য কি তাহা জানা যায় না। অজানার এই মরুভূমিতে নিতান্ত নিরাশ্রয়ভাবে বিচরণ করিয়া মানবের আত্মা সকল শক্তি দিয়া একদিন বলিয়া উঠে—রসো বৈ সঃ। তিনিই রস। রস অর্থ কি? না, যাহা আস্বাদন করা যায়। জ্ঞান এবং আস্বাদন দুইটী পৃথক্ জিনিষ। আমরা জ্ঞানের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে আস্বাদনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; অকস্মাৎ যেন পিপাসা জাগিয়া উঠিল। বালক সারাদিন পাখীর বাসার সন্ধানে উর্দ্ধে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে—ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে ছিল না,

* বোদ্ধং বা পরিহারো বা ক্রিয়তে দ্বৈতভাষয়া
অদ্বৈতভাষয়া বোদ্ধং পরিহারো ন বিদ্যতে।

হঠাৎ ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া উন্নত বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে একটী ফল পাড়িয়া চাখিয়া দেখিল, অতি সুস্বাদু, অতি রসাল, অতি মিষ্ট। তখন সে পাখীর ছানা পাড়িবার কথা ভুলিয়া গিয়া ফল পাড়িতে লাগিয়া গেল।

অনেকে মনে করেন যে আস্বাদনও বুঝি একপ্রকার জ্ঞান। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আস্বাদনের মধ্যে জ্ঞানের ক্রিয়া কিছু থাকিলেও, উহাতে অনন্য-বিলক্ষণ একটি ধর্ম্ম রহিয়াছে। আপনাকে যদি এক টুকরা মিছরি খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে আপনি তাহা আস্বাদন করিয়া তাহার মিষ্টত্ব গ্রহণ করিবেন এবং সেই মিষ্টত্বের ফলে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিবেন। কিন্তু যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মিছরি খেজুর রস অথবা ইক্ষুগুড় হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, অথবা তালের রস হইতে? মিছরিতে যে স্তরে স্তরে স্ফটিকের মত দানা বাঁধে, তাহা কেন বাঁধে? কি প্রণালীতে মিছরি প্রস্তুত হয়? ইত্যাদি—তাহা হইলে আপনি আপনার জ্ঞান-ক্রিয়ার দ্বারা তাহার নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। আস্বাদনের আনন্দ ইহাতে নাই, রসের সহিত-পরিচয় নাই; ইহা কেবল জানা—জ্ঞানক্রিয়া।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে, জ্ঞানের নিকট যাহা কঠোর, কর্কশ দুর্ভেদ্য—আস্বাদনের সাহায্যে তাহা কোমল, মধুর, সহজসাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যাহা বস্তুতঃ অজ্ঞেয়, দুরবগাহ, নিরপেক্ষ, নির্ব্বিশেষ বস্তু, তাহার আস্বাদন হওয়াই বা কিরূপে সম্ভব? শ্রুতি যাহাকে বলিয়াছেন "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" তাহাকে আস্বাদনের বিষয়ীভূত করা যায় কি? বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ মন, বাক্য

কিছুই যাহার নিকটে পৌঁছিতে পারে না, তাহাকে লইয়া আনন্দ করাই বা যায় কেমন করিয়া? জ্ঞানের ত্রিসীমানা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া কোনও বস্তুকে আস্বাদনের সামগ্রী করা চলে না। সত্যকে জ্ঞানের রাজ্য হইতে অন্তরালে লইয়া গেলে, আনন্দও তিষ্ঠিতে পারে না। জ্ঞান ও আনন্দ একই মনের দুইটি ধর্ম্ম; সুতরাং তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহা একেবারে অজ্ঞেয়, তাহা আনন্দ হইতে বর্জ্জিত।

সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম

শ্রুতি সেইজন্য ব্রহ্মের নিরুপাধিত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম নির্গুণ; কিন্তু সগুণও বটেন। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন—শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়বিধ ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ অস্থূল-মনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। রামানুজাচার্য্য বলিলেন, না—শ্রুতি সগুণ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি যে মঙ্গলময়, নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব-কল্যাণ-গুণাকরত্ব লক্ষণ। তিনি নির্গুণ হইলে চলিবে কেন? শ্রীমদ্-ভাগবত এই তর্কের সমাধান করিলেন—

"গৃহীত মায়োরুগুণঃ গুণাদাবগুণঃ স্বতঃ"

তিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ হইলেও, সৃষ্টির প্রাক্কালে মায়া অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।

"মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"—শ্বেতাশ্বতর

ভাগবত বলিলেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

কেহ কেহ মনে করেন, যে ব্রহ্ম অজানাই বটে; তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, Absolute। আমরা ভ্রমবশতঃ অথবা অজ্ঞানবশতঃ

তাঁহার গুণের বা মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়া লইয়া থাকি। ইহা Subjective ব্যাপার; তত্ত্বতঃ ব্রহ্মের কোনও রূপ বা গুণ নাই। গ্রীক্ দার্শনিক বলিয়াছেন যে, সিংহ যদি ভগবানের রূপ আঁকিতে পারিত, তাহা হইলে সে তাঁহাকে সিংহের মত করিয়াই আঁকিত। ইহাই সাকার ও নিরাকার উপাসনার চির-বিরোধ। আমরা সে প্রাচীন কলহের মধ্যে না গিয়াও বলিতে পারি যে, শ্রুতি নির্ব্বিশেষের সপ্তমে সুর চড়াইয়া শেষে পর্দ্দায় পর্দ্দায় সবিশেষে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, শুদ্ধ মুক্ত অপাপবিদ্ধ; তিনি প্রজ্ঞান ঘন আনন্দ-স্বরূপ; তিনি সচ্চিদানন্দ। তিনি আত্মা, পরমাত্মা, ভগবান্। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ (কঠ)। তাঁহার রূপ নাই বলিলেও চলে। তিনি বিদ্যুতের মত, যেন চক্ষুর নিমেষ। আবার তাঁহার রূপেই জগৎ আলো।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ?
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সেখানে সূর্য্য উজ্জ্বল নহে, চন্দ্রতারকাও নহে, বিদ্যুৎও সেখানে উজ্জ্বলতান্বিতা নহে, অগ্নি সেখানে কোথায়? তাঁহার ভাতি লইয়াই সকলের উজ্জ্বলতা, তাঁহার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ হয়। জনক যাজ্ঞবাল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ?" (বৃহ)

সেই পুরুষ কি জ্যোতিঃস্বরূপ? তচ্ছুভ্রঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (মুণ্ডক)। তিনি শুভ্র, সমস্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ তিনি।

ইহার পরে আর তাঁহাকে অরূপ বলা চলে না। অতএব

দ্বে বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তঞ্চ। (বৃহ)

তাঁহার রূপ আছে, আবার রূপ নাই। তিনি মূর্ত্তও বটেন, অমূর্ত্তও বটেন। তিনি অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। অণু হইতেও সূক্ষ্মতর, আবার মহান হইতেও মহত্তর। তিনি বিরাট পুরুষ—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্ত্যাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং। (ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত)

তিনি সহস্র-শির, সহস্র-চক্ষু সহস্র পদবিশিষ্ট পুরুষ। তিনি সমস্ত বিশ্ব আবৃত করিয়াও তদতিরিক্ত।

গীতা বলিলেন,

বিষ্টভ্যামহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।

আমি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আমার এক অংশমাত্রে ধারণ করিয়াছি।

অনেক বাহূদর বক্ত্র নেত্রম্
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিম্
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

ইহাতেও হইল না। এ বিশ্বরূপ অ-রূপেরই মত। অনন্তরূপ ধারণার অতীত রূপ, সুতরাং বিশ্বময় যাহাকে নানারূপ, নানা বিভূতি, নানা সত্তার মধ্যে দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাকে রূপবিহীন বলিলেও দোষ হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, রূপ বলিতে আমরা প্রকৃত পক্ষে কি বুঝি। আমরা সাধারণ ভাবে রূপের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

একখণ্ড লোষ্ট্রেরও রূপ আছে, আবার গিরিবন-নির্ঝরেরও রূপ আছে। কিন্তু এই রূপের স্বরূপ কি? রূপ কি বস্তুর স্বধর্ম্ম? না, আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা নিজেদের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে রূপ রচনা করিয়া লই? আমার বক্তব্য এই যে, সমস্ত রূপই আমাদের ধারণাকে অপেক্ষা করে। ধারণার নিরপেক্ষ রূপ নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন। মানুষের চিত্ত কতকগুলি সাধারণ গুণের আধার, আবার কতকগুলি বিশিষ্টগুণের আকর। এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম থাকাতেই আমাদের মনোরাজ্য এত বৈচিত্র্যময় হইয়াছে।

রূপের অনুভূতি সম্বন্ধে এই বিচিত্রতা, এই বিশিষ্টতা এত বেশী যে, রূপের কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন। জলের যেমন নিজের কোনও আকার নাই, পাত্র অনুসারে তাহার আকার,—সেইরূপ যখন যে আধারে রূপ গৃহীত হয়, সেই আধারের আকার গ্রহণ করিয়া থাকে। আপনারা যদি কখনও laughing galleryতে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখিয়াছেন, দর্পণের আকার, মলিনতা ইত্যাদি গুণে রূপ নানাভাবে বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের মনের দ্বারাও মোটামুটি রূপ এমনই ভাবে রূপান্তরিত হয়। নহিলে একই রূপ সকলের চিত্তে সমান ভাবে কার্য্য করে না কেন? আমি কাহারও রূপ দর্শন করিলাম, কিন্তু সে রূপ আমার মনে ধরিল না। আমি দেখিয়াও দেখিলাম না। আর একজন দেখিল, দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

পানপাত্র পূর্ণ করিয়া রূপ-মদিরা পান করিলাম, তবু পিয়াসা মিটিল না।

এমন কেন হয়? মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমাল-দ্রুমৈঃ দেখিয়া আমার মন পুলকে নাচিয়া উঠে; আপনার হয়ত স্ফুটমল্লিকা যূথী শোভিত শুভ্র চাঁদিনী যামিনী ভাল লাগিবে। মন চাহে নিজের মনের মত করিয়া রূপ রচনা করিয়া লইতে,—সেই জন্যই রূপ সম্বন্ধে বলা চলে—ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। রূপ আস্বাদনের বিষয়; রূপের সহিত রস বা আনন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। রূপের সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, রূপ আনন্দ দান করে—সে আনন্দ বিমল, পূর্ণ, স্বার্থসম্পর্কশূন্য। কিছুর জন্য সে আনন্দ নহে, মনের স্বাভাবিক সচ্ছন্দ অব্যাহত গতিতে সে আনন্দের উপভোগ ঘটে। আইন কানুনের বিধি নিষেধের দ্বারা রূপের অনুভূতিকে শৃঙ্খলিত করা যায় না।

রূপের উপলব্ধি বিষয়ে মনের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিলেও ইহাও একপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মনের রূপতৃষ্ণা সার্থক করিতে নিয়োজিত রহিয়াছে। বিশ্বের সহিত মানব মনের এমন এক অপূর্ব্ব যোগ আছে যে, সেই যোগ হইতে সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের এক বিমল পূত রসধারা উৎসারিত হয়। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলেই আমার অদ্যকার বক্তব্য শেষ হয়। একদিকে জগৎ তাহার অনন্ত বৈচিত্র্য লইয়া চলিয়াছে, অপর দিকে মানবের মন তাহার জ্ঞানের দর্পণ ঘুরাইয়া সে বৈচিত্র্যকে আপনার ছাঁদে ধরিয়া লইতেছে। বিশ্বের ফুল-বাগানে ঢুকিয়া মন বাছা-বাছা ফুল তুলিয়া সাজি ভরিতেছে। বিশ্ব নানা পণ্যসম্ভার দিয়া দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে, আর মানুষ আপন মনোমত জিনিষ কিনিয়া ঘর সাজাইতেছে। কিন্তু কে সে

অজানা দোকানদার, যে মানুষের পছন্দ ও প্রয়োজন বুঝিয়া এমন করিয়া পণ্যসম্ভার নিত্য গুছাইয়া রাখিতেছে?

রূপ মনকে মানাইয়া চলিতেছে। মনের কল্পনা নয়, স্বপ্ন-সৃষ্টি নয়, বিভ্রান্ত অনুভূতি নয়, রূপের স্বাভাবিক স্বরূপগত পরমার্থ সত্তাই এই। রূপ বিশ্বেরও নহে, মনেরও নহে; বিশ্ব ও মনের মিলনে রূপ। রূপ মনের বাধ্য; মনের তৃপ্তির জন্যই রূপের স্বরূপতঃ বিকাশ। অ-জানাকে রূপদান করিতে হয় না। আমার জন্য, আপনার জন্য, সকলের জন্য অ-জানার অনির্ব্বচনীয় পরম রহস্য বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আসিতে বাধ্য হয়। পুরাণ বলে, ভগবান মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বের সমস্ত সুধা তিনি নিজ হস্তে দেবাসুর নির্ব্বিশেষে পরিবেশন করেন। সুধা পরিবেশন করিতে হইলে তাঁহাকে মোহিনী সাজিতে হয়।

কেন? তাহা বলিতে পারি না। ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত করিলে, তবে তিনি গুণ-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়েন, ইহাই শ্রুতির কথা। কিন্তু এই মায়ার আবরণ তিনি কেন গ্রহণ করেন? ভাগবত বলিলেন—

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ।

তিনি নির্গুণ হইলেও লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন। এই লীলা যে কি, তাহা আমরা বুঝি না। বুঝি না বলিয়াই বলি 'লীলা'। আমি বলি, আমারই জন্য এ লীলা। এই যে এক হইয়াও বহু, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, অ-রূপ হইয়াও রূপবান, ইহা মানুষের মনের নিকট স্ব-প্রকাশ করিবার জন্যই। মনের অন্তঃপুরে আসন পাইতে হইলে মনের মানুষ হইতে হয়।

মনকেও এই রূপের ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবার পক্ষে নির্ম্মল দর্পণই যুক্ত। সমল দর্পণে রূপের ছায়া ভাল পড়ে না। দর্পণ মার্জ্জনা করিবার জন্যও ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন।

শুনকের পুত্র ব্রহ্মবাদী অঙ্গিরা ঋষিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমি শুনিয়াছি যে, এমন বস্তু আছে, যাহা ভাল করিয়া জানিলে সমস্তই পর্য্যাপ্তরূপে জানা হইয়া যায়।

যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি—

আপনি আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ করুন।

অঙ্গিরা বলিলেন, জানা দুই প্রকার। এক অপরা বিদ্যা, অন্য পরবিদ্যা। অপরাবিদ্যার দ্বারা খণ্ড খণ্ড সত্যকে জানা যায়, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। সে জ্ঞানের দ্বারা যশঃ, মান, অর্থ, স্বর্গাদিলাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ-লাভ হয় না। পরাবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, পরমাত্মাকে চিনিতে পারা যায়।

যমের নিকট নচিকেতা যখন এই পরমাত্মা বিষয়ে জানিতে প্রার্থনা করিলেন, তখন যম কিছু গোলে পড়িয়াছিলেন। তিনি সেই কিশোর বালককে প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নচিকেতা পরা ব্রহ্মবিদ্যার প্রার্থী, তাঁহাকে কি অপরাবিদ্যা বা অবিদ্যা দিয়া ভুলানো যায়? অ-জানাকে জানিতে হয়, জানাকে ভুলিয়া। সমস্ত জানার রূপকে ভুলিতে পারিলে, অ-জানার রূপ মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়। যম ইহা সযত্নে আবরণ করিয়া রাখেন; কারণ জীব ইহা জানিলে, যমের অধিকার সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সেই রূপ দেখিয়া জীব অমরত্ব লাভ করে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে পরাবিদ্যার অধিকারী হইয়া জীব অকস্মাৎ সেই রূপ:দেখিয়া ফেলে। অজ্ঞানের যবনিকা দূরে সরিয়া যায়। কুয়াসার অপগমে প্রভাত রবির মত সত্য নেত্রপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন অর্জ্জুনের মতই ভয়ে বিস্ময়ে, আনন্দে, ভক্তিতে গদগদ হইয়া বলিতে হয়—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার; আবার, আবারও তোমাকে নমস্কার করি।

বিশ্বের জাগরণ

সুদূর অতীতের এক তমসাচ্ছন্ন যুগে, মহাশূন্যের এক বিরাট গহ্বরে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাসুষুপ্তিতে মগ্ন ছিল! তখন ইহার উপাদানরাশি ধূমপুঞ্জাকারে সেই মহাশূন্যের প্রাণহীন নিস্তব্ধতাপূর্ণ কক্ষে, বিশ্বপ্রাণের অনন্ত সম্ভাবনা বক্ষে লইয়া বিরাজ করিতেছিল! তাহার পরে কবে গভীর সুপ্তির দীর্ঘশ্বাসে সে বিরাট বীজপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিয়া পরাবর্ত্তিত হইল এবং সেই পরাবর্ত্তনের ফলে কবে তাহার দেহ অগণিত খণ্ডে দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তখন অসংখ্য সূর্য্য-চন্দ্র, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র দীপালীর দীপমালার মত মহাকাশের গহন তমসাচ্ছন্ন কক্ষে আলোকবিদ্ধ করিয়াছিল। তখনও বিশ্ব সুষুপ্ত; তখনও প্রাণের কোনও সাড়া ছিল না, সংজ্ঞার কোনও চিহ্ন ছিল না; ছিল শুধু স্পন্দন; ছিল শুধু ঘুমঘোরে অন্ধ আবর্ত্তন।

তখন ধরণীর বিস্তৃত তটে মহাসমুদ্রের ঢেউ অকারণ আছড়াইয়া পড়িত; বায়ু একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত মাতিয়া মাতিয়া ছুটিয়া বেড়াইত; কিন্তু ধরণী তাহাতে সাড়া দিত না। এমনইভাবে কত সহস্র সহস্র বর্ষ কাটিয়া গেল। তাহার পরে যেদিন নববারি সম্পাতে ধরণীর গাত্রে নব নব দূর্ব্বা-শৈবাল মুকুলিত হইয়া উঠিল, সেইদিন বুঝি বিশ্ব ঘুমন্ত শিশুর মত স্বপ্নে একটু হাসিয়া উঠিল। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কত পরার্দ্ধ বর্ষ অতীত হইল। তারপরে হয়ত কোথায়ও একটু অভিনব স্পন্দন দেখা গেল। তন্দ্রালস চোখে বিশ্ব

একবার চাহিয়া আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সেই বিশ্বের প্রথম জাগরণ। সেদিন প্রথম বিহগ-কাকলি প্রভাত সূর্য্যকে অভিনন্দিত করিল। নদ নদী, গিরি বন সব প্রাণের স্পন্দনে প্রথম সাড়া দিয়া উঠিল। অনাঘ্রাত ফুলের বাসকসজ্জায় সেই প্রথম গুঞ্জন-ধ্বনি শুনা গেল। সেই এক জাগরণ। সুষুপ্তির পর জাগরণ যেমন তন্দ্রাজড়িত অলসতায় আচ্ছন্ন থাকে, তেমনই বিশ্বের প্রাণ এক অজ্ঞ অন্ধ আকুলতার মোহে অভিভূত ছিল।

ইহা পশু জীবনের ইতিহাস। পশুজীবনে বিশ্বের জাগরণ পরিস্ফুরিত হইল মাত্র, সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। কত নিরলস সাধনার পর সেই জাগরণ-চেষ্টা মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইল। ইতিমধ্যে কত সহস্র সহস্র যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে কত নূতন জীবের জন্ম ও লয় হইল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তারপর যেদিন পশুজন্মের নানা স্তর অতিক্রম করিয়া মানব প্রথম এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে উপনীত হইল, সেদিন বিশ্বের আর এক জাগরণ। বিশ্বের ইতিহাসে আর এক সৃষ্টি! এ জাগরণে মোহ আছে, মূঢ়তা নাই; জড়তা আছে, কিন্তু তাহা চৈতন্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ; ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু তাহা বধির নহে। এ জাগরণে বিশ্ব বিস্ফারিত নেত্রে আকাশ, পাতাল, সলিল, সৈকত, সব দেখিয়া লইতেছে। যেখানে তাহার স্বাভাবিক দৃষ্টি ব্যাহত হইতেছে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ দিয়া সমস্ত দেখিবার ও জানিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে—জাগরণের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিচায়ক—বিশ্ব এবার আপনাকে আপনি দেখিয়াছে,—মানব চৈতন্যের স্বচ্ছ-দর্পণে বিশ্ব আপনার স্বরূপ দেখিয়া জানিয়া বুঝিয়া লইতেছে।

পশুজীবন ও মানবজীবনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। পশুপ্রকৃতি আত্মদর্শী নহে; মানব জ্ঞান আত্মদর্শী, আপনাকে আপনি জানিবার অধিকারী। ইতর প্রাণীর ভবিষ্যৎ আছে, অতীত তাহার নিকট চির তমসাবৃত। মানবেরও ভবিষ্যৎ আছে, ভাবনা আছে, দূরদৃষ্টি আছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে অতীতের স্মৃতি আছে, অতীতকে বর্ত্তমানের দরবারে উপস্থিত করিবার ক্ষমতা আছে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যে দূরত্ব রহিয়াছে, তাহাকে অনুমান ও সংকল্পের সেতুর দ্বারা সংযোজন করিবার নিপুণতা আছে। পশুর আছে—আহার, নিদ্রা, বংশবিস্তার; মানুষের এ সকলই আছে—আর আছে—ধ্যান, ধারণা, বিবেক। বিশ্বের জাগরণ আহারে বিহারে মরণে নয়; বিশ্বের জাগরণ —ধ্যানে সৌন্দর্য্যরচনায় সমাধিতে—বিজ্ঞানে, কাব্যকলায়, দর্শনে।

কিন্তু এ জাগরণ কবে সম্পূর্ণ হইবে? আত্মসাক্ষাৎকার যদি জাগরণের পূর্ণাবস্থা হয়, তবে কবে সে শুভ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় আসিবে? যদি বিশ্বপ্রাণ এক মহাপ্রাণের অনুপ্রাণনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে কবে সে মহাপ্রাণের যোগ ঘটিবে? যেদিন ঘটিবে সেইদিনই বিশ্বের প্রকৃত জাগরণ হইবে। যেদিন মোহ জড়তা কাটিবে, সেদিন অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচিবে, সেদিন হয়ত জীবজগতের উচ্চ শির সুবর্ণ-মুকুটে মহিমোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, যাহাকে আমরা এতক্ষণ বিশ্বের জাগরণ বলিয়া অভিহিত করিলাম, তাহার প্রেরণা কোথায়? সে জাগরণ কি এক অন্ধ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক বেগশীলতা বা ইহার মধ্যে কোনও অন্তর্নিহিত শক্তির খেলা রহিয়াছে? বাজীকর পুতুলের খেলা দেখায়। তারের টানে পুতুল উঠে, বসে, নৃত্য করে,

দর্শকদিগকে ভুলাইয়া আনন্দ দান করে। বিশ্বের এতবড় একটা বিরাট প্রসববেদনার মধ্যে এমন একটা তুচ্ছ বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে কি? অনন্তকাল ধরিয়া মহাশূন্যের সূতিকাগৃহে থাকিয়া বিশ্ব যে প্রাণের বীজ সযত্নে ফুটাইতে চেষ্টা করিতেছে, একি শুধু অনির্দ্দেশ্য নিয়তির খেলাঘরের অভিনয়?

ইতর প্রাণীর মধ্যে যেখানে চেতনা সম্যক্ স্ফুরিত হয় নাই, সেখানেও একটি অনির্ব্বাচ্য প্রেরণা আমরা দেখিতে পাই। ইতর প্রাণী নাচিয়া, খেলিয়া, যুঝিয়া তাহার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যুর চক্রনেমি ঘুরাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। সে নিজের জন্য একটু ঠাঁই করিয়া লইবার জন্য সংগ্রাম করিতে জানে, আহার-সংগ্রহের জন্য বুদ্ধি খেলাইতে জানে এবং যৌন সম্মিলনে নিজের দাবী কেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইয়া জয়লাভ করিতে হয়, তাহাও জানে। ইহা হইতে বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ইতর পশু এক অন্ধ সংস্কারের বশে নিয়তির বিধানে এই সকল কাজ করিয়া যায়। তাহাদের জীবনের অন্ধ প্রেরণা শুধু আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তিরূপে তাহাদিগকে পরিচালিত করে।

যতক্ষণ আমরা শুধু ইতর জীবজগতের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিবদ্ধ থাকি, ততক্ষণ কেবল আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রেরণাই দেখিতে পাই। তাহারা যে সুরসপ্তকের কয়েকটি পর্দ্দা মাত্র ধ্বনিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, সেকথা আমরা ভুলিয়া, তাহাদের ধরাবাঁধা সুরগুলিকে নিতান্তই সামঞ্জস্যহীন ও বেসুরো বলিয়া মনে করি। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের ঐ সুরগুলি এক বিশালতর সুরসপ্তকের অংশ; তাহার তান লয় বিশ্বের নিখিল-সঙ্গীতে পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিতেছে। এইটুকু যতক্ষণ আমরা মনে

না রাখি, ততক্ষণ আমরা জীবজগৎকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। কোনও একটি জীবের জীবন-মৃত্যুর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করুন, দেখিবেন যে, যে-অন্ধ প্রবৃত্তির বশে সে আত্মরক্ষায় তৎপর, যে নিয়তির বিধানে সে বংশবিস্তারে প্রবৃত্তিশীল, সে প্রবৃত্তির সহিত এক অজ্ঞাত প্রেরণার যোগ রহিয়াছে। ক্ষুদ্র রেশম-কীট যখন নানা স্তরের মধ্য দিয়া তাহার স্বরচিত কঠিন আবরণ কাটিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হয়, তখনই সে যৌন সম্মিলনের উপায় খুঁজিতে ব্যস্ত হয়, এবং সেই সম্মিলনের কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাহার জীবনের খেলা ফুরাইয়া যায়। এখানে যে প্রাণান্তকারী অন্ধবাসনা তাহাকে মৃত্যুর পথে প্রস্থিত করিল, সে ত তাহার দ্বারা বিশ্বের উদ্দেশ্যটুকু পূরণ করিয়া লইতে ত্রুটি করিল না। কয়েকটি জীব অপসৃত হইল বটে, কিন্তু তাহারা তাহাদের জীবনসূত্র প্রলম্বিত করিয়া দিল।

এই কথাটি আমি এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহি যে, এই জীবনের খেলাই প্রকৃতির চরম রহস্য নহে। বংশপরম্পরা-ক্রমে জীবনসূত্র প্রলম্বিত করিয়া কোনই লাভ ছিল না, যদি সেই জীবনসূত্রের দ্বারা একটি গভীরতর উদ্দেশ্য সাধিত না হইত। উদ্ভিজ্জগতের ফুল ফলের মধ্য দিয়া প্রথম যেদিন প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল, সেদিন সেই বিশ্ব-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তি নিঃসন্দেহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কি, তাহা ইতর-জীব-জগৎ কখনও উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা সুখে, দুঃখে, আহার নিদ্রায় জীবনের পথ অতিবাহন করে; গন্তব্যের সন্ধান তাহারা রাখে না।

এইখানেই মানবের ইতর-বিলক্ষণতা। মানব গন্তব্যস্থানের আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। বিশ্বের নানাদিক হইতে

যে আলোকরেখা সকল বিচ্ছুরিত হইতেছে, সে সকলকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই উজ্জ্বলতায় মানব আপনার অতীত ইতিহাস জানিতে পারে। কঠিন প্রস্তরের গাত্রে, শ্যামশষ্পরাজির আবির্ভাবে, সে তাহার জন্মকথা—প্রথম উন্মেষ-লগ্ন ধরিতে জানে। মানবের ক্রিয়াকলাপ নিম্নশ্রেণীর জীবের ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। তাহারও মধ্যে অনেক সময়ে অন্ধ প্রেরণা কার্য্য করিয়া সৃষ্টি-রচনার অনুকূল যে উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিয়া যায়। সেটুকু প্রকৃতি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। মানুষ তাহার নিজের পথ নিজে বাছিয়া লউক, অতীতের ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণায়মান পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ করে, করুক, ভবিষ্যতের অস্পষ্ট আলোক ভেদ করিয়া সে তাহার কল্পনার বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত সংসার রচনা করে, করুক ; কিন্তু বিশ্ব-উদ্দেশ্য পাছে সে ব্যাহত করিয়া দেয়, পাছে সে সেই উদ্দেশ্যের প্রতিকূল পথে গিয়া আপনাকে লোপ করিয়া বসে, সেইজন্য মানবের মধ্যেও সেই অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার সূত্রটি প্রলম্বিত রহিয়াছে। মানব আহারে বিহারে জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়ে আত্মসংস্থিতি ও বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে প্রকৃতির অধীন। উপায় সম্বন্ধে তাহার স্বাধীনতা থাকিলেও মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার অল্পই স্বাধীনতা আছে।

মানবের স্বাধীনতা আছে—তাহার সাধনায়, তাহার জ্ঞানে, তাহার সৌন্দর্য্য-কল্পনায় ; আপনাকে আপনি জানিবার যে অমূল্য অধিকার, তাহা মানবেরই আছে। জ্ঞানের সূত্র যতদূর প্রসারিত করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা দিতে পারে। সূক্ষ্মা-দপি সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায়, সারসত্যের ধারণায় মানব অক্লান্ত ভাবে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া আসিতেছে। যেখানে তাহার দৃষ্টি বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, সেখানে সে সীমা-

রেখা টানিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে না। পরন্তু তাহার সে অসফলতা হইতে সে আরও কঠোর সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যেখানে উপকরণ-সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা যায় নাই, সেখানে অনুমান অবশ্য ভ্রমসংকুল হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কিন্তু উপকরণের অভাব-পূরণ হইলেই অনুমানও সত্যের দিকে আসিতে থাকে।

স্বাধীনতার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমরা অনুভব করি সৌন্দর্য্য-কল্পনায়। সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি যেখানে যত বেশী আমরা দেখিতে পাই, সেই খানেই আমরা প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হই। সে প্রতিভা নূতন সৃষ্টি করিতে পারে, নিয়মের বাঁধাবাঁধিতে সে ধরা দেয় না, সে আপনার ভাবে আপনি নিমগ্ন। এই প্রতিভাই সৌন্দর্য্য-কল্পনায় মানবের ইচ্ছার স্বাধীনতা। ইহাতেও অবশ্য বাস্তবের কিছু কিছু সাহায্য লইতে হয় বটে। উপকরণ বা সামগ্রী-সংবলন না হইলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাও অসম্ভব; কিন্তু প্রতিভার নিকট এই আনুগত্য নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কবিতায় সময়ে সময়ে আমরা যখন কল্পনার অপূর্ব্ব বাধাহীন ক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হই, তখন কি আমাদের কখনও মনে হয় যে, সে কবিতায়ও কতকগুলি গোণা গাঁথা বর্ণমালার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে? যখন বীণার স্বরসমাবেশ-কৌশলে আমাদের মন গলিয়া যায়, তখন কি এক-বারও মনে পড়ে যে, ঐ বীণার তার সঙ্গীত-সাধনায় বাধা জন্মাই-তেছে? এ সব স্থানে জড় উপাদানকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজের প্রয়োজনে একান্ত ও পরিচিতভাবে নিয়োজিত করিতে পারাই মানবের স্বাধীনতার ধর্ম্ম।

কিন্তু এই স্বাধীনতাই সব নহে। কার্য্যের ক্ষেত্রে বাসনার মধ্যে মানবের যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা আমাদের কতটুকু আছে

তাহাই বিবেচ্য। আমরা আপনাদিগের ইচ্ছার অনুকূল বিষয় বাছিয়া লইতে পারি; সেই সকল উদ্দেশ্যের সহায়ক উপায় সকল অবলম্বন করিতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যেন চারিদিকে বাধা, চারিদিকে নিয়মের নিগড়, শক্তির দৈন্য। আমাদের কার্য্যকরী শক্তি যেন কিছুতেই স্ফুরিত হইতে পারিতেছে না। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, ইতর প্রাণী যেখানে অন্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়, আমাদের সেখানে প্রথম হইতেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এবং অনেক সময়ে বিফল চেষ্টার মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া পড়ি। ইহাই যদি পরিণাম, তবে আর মানবের স্বাধীনতা কোথায়?

ইচ্ছার স্বাধীনতা বাস্তবিক আছে কি না, এই বিরুদ্ধ মত-সমাকুল প্রশ্নের দুরবগাহ জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিলেও ইহা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, ইচ্ছার ক্ষেত্রে উপাদানের অবাধ্যতা লইয়া আমরা সব সময়েই বিব্রত হইয়া পড়ি। কিন্তু উপাদানের অত্যাচার যেখানে কম, যেখানে মানবের ইচ্ছা জাগতিক সংকীর্ণ বিষয়ের ঊর্দ্ধে বিচরণ করে—অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা স্বার্থ-সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বিশ্বপ্রাণের সহিত যোগ অনুভব করে, সেখানে স্বাধীনতা তত সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয় না।

স্বার্থের মধ্যেই ইচ্ছার প্রেরণা আমরা সর্ব্বপ্রথম অনুভব করি বটে; কিন্তু স্বার্থের নিম্নতলে মানব বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্যই জগতের চরিত্রনীতিতে যতপ্রকার স্বার্থবাদ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার কোনটিই সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গেই পরার্থেরও একটি প্রেরণা আমরা অনুভব করি। সুতরাং স্বার্থের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে গেলেই তাহার মধ্যে পরার্থপরতার সংস্রব আপনিই আসিয়া পড়ে। এই স্বার্থ-পরার্থ-মিশ্রিত তত্ত্বই আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির মূল

বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যখন ইহাকে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করি, তখন ইহাকে বলি "অধিক সংখ্যকের অধিকতম সুখ।"

কিন্তু এখানেও আমরা ইচ্ছার সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারি না! সুখ! সুখই কি সব? সেই যে জীবজগতের নিম্নাদপি নিম্ন স্তর হইতে সুখ-প্রবণতার একটি অন্ধ আবেগ নিখিল প্রাণিকুলের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহারই একটি নূতন সংস্কার কি মানবজীবনে আত্মপ্রকাশ করে? "অধিকতম সুখ" বলিতে কোনও নির্দ্দেশযোগ্য পদার্থের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। আর সুখ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা নিতান্ত আত্মীয়, আত্মার সহিত তাহার যোগ থাকিবেই। অধিক সংখ্যকের সুখ বলিতে সে যোগ আমরা যেন পাই না।

বস্তুতঃ সংসারকে তুমি তোমার অব্যবহিত বেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া লইতে পার, টাকা পয়সার হিসাবে পরিণত করিতে পার, অথবা একটি যৌথ কারবার বলিয়া মনে করিতে পার; কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ ধারণায় তোমার প্রাণ সাড়া দিবে না। প্রাণের মধ্যে এমনই একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা কিছুতেই তোমাকে সেই সঙ্কীর্ণ অচলায়তনের মধ্যে থাকিতে দিবে না। তোমার প্রাণ একবার বিশ্বকামনার সহিত মিশিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। এই নিখিল বিশ্বকামনা তোমার স্বার্থ নহে, আমার স্বার্থ নহে, যৌথ স্বার্থও নহে; ইহাতে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব কিছুই নাই, অথচ ইহাতে সকলই আছে,—বিশ্বমনের যোগ আছে, উদারতার আদর্শ আছে, প্রাণের তৃপ্তি আছে, ভূমার বিকাশ আছে। এসকল যাহাতে নাই, যাহাতে কেবল স্বল্প স্বার্থ মিশানো, যাহা সাময়িক আনন্দ

বা উপকার প্রদান করে, তাহাতে মানব কখনও চিরতৃপ্তি বা শান্তিলাভ করিতে পারে না। এইজন্যই কোনও চারিত্রবাদই এপর্য্যন্ত আমাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারে নাই। মোক্ষকেই অভীষ্ট বল, আর নির্ব্বাণকেই বরণীয় মনে কর, হিতবাদের মহিমা কীর্ত্তন কর, আর নিলর্জ্জভাবে স্বার্থের সাধনই প্রচার কর, কেমন যেন তাহাতে মন পরিতৃপ্ত হয় না। এ সকলই যেন সত্যকে অংশের দিক দিয়া দেখা হইয়াছে, সমগ্রের দিক দিয়া যেন দেখা হয় নাই। তুমি তোমাকে এবং তোমার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিবারের হিতসাধনকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ কর, অথবা তোমার নিজের সমগ্র বা জাতির হিত কামনা কর, মোক্ষের জন্য লালায়িত হও, আর সংসারে বিরক্ত হইয়া বাসনার উচ্ছেদসাধন করিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পলায়ন করিতেই চাহ, এসকলই অংশের হিতসাধন-চেষ্টার পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠান মাত্র।

জীবতত্ত্ববিৎ বলেন, একই মানব-শরীরে অসংখ্য জীবকোষ (living cells) বিরাজ করিতেছে, তাহাদের সমবেত জীবনই মানবের জীবন। এইখানেই ত একটি বিপুল যৌথ চেষ্টার পরিচয় পাই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এই যৌথ-চেষ্টাকে এককের চেষ্টা বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। সমাজের দেহেও এইরূপ অনেকগুলি জীব বাস করে, তাহাদের সমবেত জীবনকে আমরা রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এখানেও যৌথচেষ্টা বংশপরম্পরাক্রমে অনুসৃত হয়। কিন্তু এখানে যেন একত্বোপলব্ধির কিছু বাধা আছে। তাহা হইলেও ইহা ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে যে, এই সামাজিক জীবনেই মানবজীবনের অভিব্যক্তি, পরিপুষ্টি ও সার্থকতা। অন্যের জীবনের সহিত সম্পৃক্ত না হইলে একের জীবন অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

কিন্তু এই সামাজিক জীবনই কি ব্যক্তিগত জীবনের অভিব্যক্তির চরম নিদান ? সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ আমাদের শুধু অনুষ্ঠেয় নহে, পরন্তু ইহা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত প্রকৃত, স্বাভাবিক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সামাজিক জীবন নহিলে ব্যক্তিগত জীবন ব্যর্থ, নিরর্থক। পরন্তু এই যে প্রসারণ—যাহা জীব কীটানু হইতে ব্যক্তিতে এবং ব্যক্তি হইতে সমাজে ও রাষ্ট্রে বা সমগ্র মানবে সংক্রামিত হয়, সে প্রসারণ ঐখানেই নিবৃত্ত হয় না, তাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আরও উদার আরও গভীর বিশ্বমঙ্গলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। বিশ্বপ্রাণের যে বিকাশটি আমরা এখনও দেখিতে পাই নাই, বিশ্বজাগরণের যে স্তরটি এখনও সাক্ষাৎভাবে আমাদের গোচরীভূত হয় নাই, তাহারই প্রেরণা জীবনে অনুভব করিয়া সাধক অঙ্গুলিসঙ্কেতে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্লেটো যখন লক্ষ্যের বিষয়কে বলিলেন, "The Good" অথবা মঙ্গল, তখন তাঁহার মনে এই অজ্ঞাত অথচ অবশ্যম্ভাবী অনির্দ্দেশ্য অথচ অভীষ্ট এই বিশ্বমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানিনা। যেভাবেই ইহাকে উপলব্ধি কবিতে চেষ্টা করি না, ইহাকে যেন কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারি না। কিন্তু নিখিল বিশ্বের সহিত মানবের যে যোগ আছে, তাহার একটি নিবিড়তম সম্বন্ধ মানবকে উন্নতির সোপান দিয়া লইয়া যাইতেছে। জীবজগতের অন্ধ আকাঙ্ক্ষার মত একটি অজ্ঞাত ব্যাকুলতা দূর হইতে অতিদূরে মানবকে সেই বিশ্বমঙ্গলের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। এই যোগ যেদিন ঘটিবে, মানব সেদিন আকাঙ্ক্ষার সারবস্তু, বাসনার চিরন্তন লক্ষ্য, সাধনার চরম সফলতা লাভ করিবে, সেই দিনই, বিশ্বের জাগরণ সম্পূর্ণ হইবে। সেই সুদূর ভবিষ্যতের জন্যই প্রকৃতি অসংখ্য স্তর দিয়া আপনাকে লইয়া যাইতেছে।

ইহার মধ্যে কতবার পথভ্রান্তি ঘটিয়াছে। কতবার স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, কতবার কিছু হটিয়া যাইতে হইয়াছে ; কিন্তু ধীরভাবে নিশ্চিতভাবে অথচ অলক্ষিতে বিশ্ব উন্মেষের দিকে, আত্মবোধের দিকে, চৈতন্যের দিকে, পূর্ণ জাগরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অভিব্যক্তির ধারা

অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব অন্য অনেক সনাতন সত্যের মত বিজ্ঞানের পুরাতন দপ্তরখানায় স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করিতে চলিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে যদিও ইহা কবি ও দার্শনিকের কল্পনা ও স্বীকার্য্যমাত্রের ন্যায় মানবের মনে সময়ে সময়ে প্রতিভাত হইত; তথাপি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে ইহার পরমায়ু এক শতাব্দীও নহে। কিন্তু এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রটি এমন ভাবে আমাদের আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে চাহিলে, সেটা নিতান্তই অনাবশ্যক ও অবান্তর মনে হওয়াও বিচিত্র নহে। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিকল্প ডারউইন্ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই এই মহান্ সত্যটিকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহার শত শাখা বিস্তৃত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগকে অধিকার করিয়াছে। ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জৈববিদ্যা, চরিত্রনীতি, অর্থনীতি, এমন কি তত্ত্ববিদ্যায় পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব সংক্রামিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই আমরা একটি গতি বা অভিব্যক্তির ধারা অন্বেষণ করি; এবং যতক্ষণ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে সেই গতিশীলতা, বা ক্রমোন্নতি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ জ্ঞানের একাংশ অন্ধকার রহিয়া গেল বলিয়া গণনা করি।

তাহার কারণ এই যে, বিশ্বের অন্তরতম সত্তা সর্ব্বদা গতিশীল। গতিশীল বলিয়াই বিশ্বের নাম জগৎ। যন্ত্রবদ্ধতা ইহার প্রকৃতি নহে। যন্ত্র এক ভাবেই থাকে। যে ভাবে তাহাকে চালাইয়া দেও, সেই ভাবেই সে চলে। তাহার ব্যতিক্রম নাই।

যন্ত্রের ভিতর এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে একটুও নড়াইতে পারে। বিশ্ব যন্ত্র নহে, কেন না বিশ্বে নিয়মের পার্শ্বে ব্যতিক্রম আছে। সে রেলগাড়ীর মত লৌহবর্ত্মে অবিরাম চলে না; বা চলা বন্ধ হইলে, চিরদিনের মত স্তব্ধ, অসাড়, লৌহপঞ্জরের মত পড়িয়া থাকে না। পরন্তু একটি বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায় নানা দিকে নানা ভাবে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করিয়া নিয়ম-ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এইরূপ সংসরণ-শীল বলিয়াই এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির নাম সংসার।

অভিব্যক্তিবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জগৎসংসারের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহা ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই যে সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ-কল্পনা,—ইহা সত্যই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। বিশ্ব চরাচরের যেখানে যাহা কিছু আছে, গ্রহ-চন্দ্র-তারকা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট-কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্তই একই নিয়মের সুবর্ণসূত্রে শৃঙ্খলিত। এক দিকে জড় জগৎ, অপর দিকে জীব-জগৎ; আপাত-দৃষ্টিতে এ দুইয়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না। মনে হয় যেন, বিশাল জড়-বিশ্ব চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের চৈনিক প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, জীব-জগৎকে ঠেলিয়া পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। নিঃসাড়, নিস্পন্দ, বধির জড়পদার্থ-নিবহ জীবনের অশেষবিধ বিকাশের বহু দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জীবনের ভোজে তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু অভিব্যক্তির ধারা জীবনের সহিত জড়কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান এক দিকে জড়জগৎকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখাইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে একটি সুন্দর বংশগত সাদৃশ্য আছে। এই বংশগত সাম্য হইতে অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন ভূতসমূহ একই মৌলিক উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা একই বংশসম্ভূত বিভিন্ন শাখার ন্যায় আকার

ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। আমরা স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে ৭০ কি ৮০টি মূল ভূতের বা Elementsএর কথা পড়িয়াছি। কিন্তু এই মূল ভূতগুলি যে প্রকৃত মৌলিক তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারে না। আজ যাহা মৌলিক বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল তাহা বিশ্লেষণ-যন্ত্রে পড়িয়া যৌগিক পদার্থ প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। কয়লা ও হীরকের মধ্যে যেমন বংশগত সাদৃশ্য রহিয়াছে, সমস্ত জড়-পদার্থের মধ্যে তেমনই একটি মৌলিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—ইহাই জড়-বিজ্ঞানের মুখ্য প্রতিপাদ্য। জড়-দ্রব্যের ন্যায় জড়-শক্তির মধ্যেও এইরূপ গোত্রীয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। হার্ৎজ্ যখন তাড়িতের ক্রিয়ার সুন্দর ব্যাখ্যা প্রচারিত করিলেন, তখন ফ্যারাডের কল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল যে, আলোক ও তাপ, তাড়িত ও চুম্বক একই শক্তিপুঞ্জের ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়া-মাত্র। এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকারের শক্তিতে সহজেই রূপান্তরিত হইতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই অনুমানই স্বাভাবিক যে, সমস্ত জড়তত্ত্বের মূলে একপ্রকার অণু বা ধূলিকণা আছে, যাহার সংহতিতে নিখিল জড়বস্তু উৎপন্ন হইতেছে—একই মূল প্রকৃতি অবস্থাভেদে রূপান্তরিত হইয়া জগদ্-বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে ;—ইহাই জড়ের অভিব্যক্তির ধারা।

প্রাণী-জগতের মধ্যে এই অভিব্যক্তির ক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জড়ের মধ্যে যাহা অব্যক্ত, বা অল্প-ব্যক্ত—প্রাণীর মধ্যে তাহা সত্যই অভিব্যক্ত। জড়ের সম্বন্ধে 'ক্রম-বিকাশ বা 'উন্নতি' কথাটি আমরা এখনও প্রয়োগ করিয়া উঠিতে পারি না ; কিন্তু উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর সম্বন্ধে আমরা একটুও সন্দিহান নহি। জড়বস্তু অন্ধভাবে ক্রিয়া করিয়া যায়,—শক্তির প্রয়োগ হইলেই আমরা তাহার বিশেষ ফল দেখিতে পাই। লৌহে যে মরিচা পড়ে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, লৌহের উপর

বাতাসের ক্রিয়ায় এইরূপ একটি পরিবর্ত্তন ঘটে। পালে জোর হাওয়া লাগিলে নৌকা এইরূপ জোরে চলে, এই মাত্র। ইহার মধ্যে বিশেষ ব্যতিক্রম নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু প্রাণী জগতে যে কার্য্যপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ব্যতিক্রমের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে কার্য্য-কারণ-প্রবাহ, ইহাতে অন্ধ বাধ্যতা নাই।

প্রাণী-জগতের কার্য্য-কলাপে এমন একটি সূক্ষ্ম, অনবচ্ছিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সমস্ত নিয়মের সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। একটি মাকড়সার ক্রিয়া লক্ষ্য করিলেই এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। মাকড়সা অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়াও তাহার অভীষ্ট স্থানে জালের প্রান্ত বাঁধিয়া দিল এবং অনেকবার দোল খাইয়া খাইয়া অপর প্রান্তও আট্‌কাইল। তার পরে ধীরে-সুস্থে বৃহৎ একটি জাল বুনিয়া ফেলিল। আরও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মাকড়সা নিশ্চিন্ত ভাবে জালের কেন্দ্রভাগে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতে করিতে নিবিষ্ট মনে শুনিতেছে, মাছির গুঞ্জন। তারপর কোন এক মুহূর্ত্তে একটি মাছি উড়িয়া আসিয়া জালের সূতার সঙ্গে জড়াইয়া গেল। মাকড়সা যেন চোখের কোণে একটু হাসির ভাব লইয়া মুক্তির জন্য মাছির নানা ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করিতেছে। তার পর মাছিটি যখন ছাড়াইতে গিয়া আরও জড়াইয়া পড়িল, তখন সতর্ক পদক্ষেপে মাকড়সা তাহার শিকারের নিকটে গেল এবং আঘাতে আঘাতে তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া দিল। অবসর-মত তাহার ভোজন নিষ্পন্ন করিতে পারিবে, এই আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া সে সুস্থ চিত্তে বিশ্রাম করিতে গেল। এই ধারাবাহিক ক্রিয়া-কলাপ যে কোন একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিয়োজিত হইতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

এই উদ্দেশ্যানুকূল ক্রিয়ার পারম্পর্য্যই জীব-জগতের বৈশিষ্ট্য। এমন কি, উদ্ভিদ্-রাজ্যেও এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উদ্ভিদ্ ভূমিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, বাতাস ও বৃষ্টি অনায়াসে তাহার খাদ্য জোগায়; এই জন্য উদ্ভিদের ক্রিয়ায় বড় একটা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উদ্ভিদেরও সাড়ায় বৈচিত্র্য আছে। আমরা জানি, বৃক্ষলতা আলোক চাহে। অঙ্কুর হইতে বাহির হইয়া তাহারা আলোকের দিকে মাথা তুলে; অন্ধকারের দিকে ফিরাইয়া দিলেও, তাহারা আলোর সন্ধানে ফিরে। আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, সমস্ত জীবনী-শক্তি দিয়া একটু মুক্ত বাতাসের আস্বাদ পাইতে ব্যগ্র হয়। বৃক্ষলতাও প্রাণীদের মত ঘুমাইয়া পড়ে, আলোকে ও আঁধারে তাহাদের জীবনী শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, বিষ-প্রয়োগে তাহারাও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মদ্য বা অহিফেন সেবনে তাহাদেরও নেশা হয়, আঘাত পাইলে তাহারাও কাতর হয় এবং অল্পে-অল্পে আঘাতের ক্ষত শুকাইয়া গেলেও তাহাদের দেহে দাগ থাকে। এই সমস্তই প্রাণের ক্রিয়া। অবস্থার ব্যতিক্রমে ক্রিয়ার ব্যতিক্রম এবং উদ্দেশ্যের সহিত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য—ইহাই মোটামুটি প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে দেখিলে, আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ এই বৃহৎ পরিবারদ্বয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদিগের মধ্যে যে আনুক্রমিকতার ধারা রহিয়াছে, জড়-জগতে তাহা নাই। একখণ্ড লৌহ বা একখণ্ড হীরক জগতের সমস্ত লৌহ বা হীরকের অংশমাত্র। লৌহ হইতে লৌহের বা হীরক হইতে হীরকের উৎপত্তি হয় না। সিন্দুকের মধ্যে সহস্র-সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা অনন্ত কাল আবদ্ধ থাকিলেও, তাহা হইতে আর একটি মুদ্রাও জন্মগ্রহণ

করে না। জীবজগতে অল্প হইতে বহু জন্মলাভ করে—ইহারই নাম বংশ-বিস্তৃতি। একটি জীব হইতে অপর একটি জীব জন্মলাভ করে। এইরূপে জগতে বিশাল জীব-প্রবাহ চলিয়াছে। এই জীব-প্রবাহের একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, এক প্রকার জীব হইতে সেই প্রকারের জীবই জন্ম লাভ করে। মনুষ্য হইতেই মনুষ্য হয়, অশ্ব হইতেই অশ্ব হয়, মনুষ্য হইতে অশ্ব বা অশ্ব হইতে গর্দ্দভ জন্মলাভ করে না। গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করা যায় না, জীব তত্ত্ববিদেরা এই জনশ্রুতির সমর্থন করেন। কিন্তু মানুষের ছেলে সময়ে-সময়ে যে কিরূপে বানর হইয়া যায়, এ সমস্যা শিক্ষক, অভিভাবক ও জীবতত্ত্ববিদ্ সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে।

পূর্ব্বে যে সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সাদৃশ্যাত্মক অর্থাৎ মানুষে-মানুষে, গরুতে-গরুতে, কুকুরে-কুকুরে, অথবা লেবুতে লেবুতে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বংশগত সাদৃশ্য। একই বংশে যে সকল তরুলতা, বা যে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ইতর বিলক্ষণ গুণসম্পন্ন এবং সমান শ্রেণীর বা সমান বংশীয়ের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। পূর্ব্ব-বংশীয়ের গুণ উত্তর-বংশীয় জীবে সংক্রমিত হয়। সন্তান পিতৃ-পিতামহের ধারা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ধারা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে একই রকমের জীব পুনঃ পুনঃ অবিকল অনুবৃত্ত হইয়া পৃথিবীকে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন বা একঘেয়ে করিয়া তোলে। প্রকৃতি এই একঘেয়ে, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত অবস্থা পছন্দ করেন না। তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার অনন্ত কাল ধরিয়া বিবিধ রূপ, বিবিধ মূর্ত্তি যোগাইলেও শেষ হয় না। তাই যেখানে সাদৃশ্য, সেখানেই কিছু-না-কিছু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের সন্তান মানুষ হয় বটে, সুন্দর পিতামাতার সন্তান সুন্দর হয় বটে, কিন্তু সন্তান সব বিষয়ে পিতামাতার অনুরূপ হয় না।

একই পিতামাতার সকলগুলি সন্তানও একই রূপ হয় না। ইহাই জীব-জগতের অপর সাধারণ নিয়ম। প্রথম নিয়মের নাম বংশানুক্রম; দ্বিতীয় নিয়মের নাম ক্রম-বিপর্য্যয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পূর্ব্বপুরুষের সহিত উত্তর পুরুষের সাদৃশ্যই বা কতখানি এবং বৈষম্যই বা কতখানি হইতে পারে? অর্থাৎ পিতামাতার গুণ সন্তানে কতখানি বর্ত্তিতে পারে? জীব কতকগুলি গুণ বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়; আর কতকগুলি গুণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার গতিকে তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয়। জীবনের উপর অবস্থার প্রভাব প্রথমাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অবস্থার প্রভাবেই জীবন গঠিত হয়। প্রত্যেক জন্তুকে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত বনাইয়া চলিতে হয়; অবস্থার সহিত না বনাইতে পারিলে, জীবন ধ্বংসের অভিমুখে প্রস্থিত হয়। যে সকল জীব অবস্থার সহিত সর্ব্বতোভাবে আপনাকে মিলাইয়া মানাইয়া লইতে অক্ষম হইয়াছে, তাহারা কালের গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কত জীব জন্তু শুধু অবস্থার ফেরে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে,—সাক্ষী আছে কেবল ভূগর্ভে তাহাদের কঙ্কাল। এই যে অবস্থার সহিত, পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত মানাইয়া চলিবার অবিশ্রান্ত চেষ্টা, ইহাকেই জীবন-সংগ্রাম বলে। অনাদিকাল হইতে এইরূপে একটা মহা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা চলিতেছে, যাহার ফলে লক্ষ-লক্ষ জীব ঝরিয়া, খসিয়া, মুছিয়া যাইতেছে; আবার লক্ষ-লক্ষ প্রাণী বাঁচিবার মত, টিকিয়া থাকিবার মত শক্তিলাভ করিতেছে। এইরূপে প্রকৃতির নির্ব্বাচন-প্রণালী যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সাধন করিতেছে। এইরূপে উদ্বৃত্ত জীবসমূহের মধ্যে আবার যাহারা দায়াধিকার-সূত্রে পিতামাতার অর্জ্জিত যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহারাও অযোগ্য সাব্যস্ত হইয়া মহাপ্রস্থান করিতেছে। পিতামাতা কর্ত্তৃক অর্জ্জিত,

দৈব-লব্ধ যোগ্যতা শুধু যে সন্তানে বর্ত্তে, তাহা নহে; সে সকল গুণের পরিণতি ও উন্নতি সন্তান-পরম্পরায় সম্ভাবিত হয়। এই জন্যই পুত্রের বৈদিক অর্থ—যে পূরণ করে, অর্থাৎ পিতার ধারা অক্ষুন্ন রাখে। চিল এইরূপে দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, মাছরাঙ্গা জলের ভিতর মাছ দেখিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাকে ধরিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। জিরাফের গলা বৃক্ষের ফল পাড়িতে পাড়িতে লম্বা হইয়া গিয়াছে; গো-মহিষের শৃঙ্গ ঢুঁষাঢুঁষি করিতে-করিতে গজাইয়াছে। যাহাদের এরূপ সুবিধা হয় নাই, তাহারা ভবধাম হইতে চিরবিদায় লইয়াছে। যাহাদের প্রয়োজনের অনুরূপ এই সকল সুবিধা হইয়াছে, তাহারাই উদ্বৃত্ত হইয়াছে, রহিয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, আমরা বর্ত্তমান কালে যে সকল জীব দেখিতেছি, তাহারা অনেক ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়া জন্মলাভ করিয়াছে। পরিণতির পথে অগণিত জীব ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক নির্ব্বাচন। ইহার একদিকে সৃষ্টি, অপর দিকে সংহার। সৃষ্টি বা স্থিতি এবং সংহার একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক্ মাত্র। রাত্রি এবং দিনের মত ইহারা পরস্পর গলাগলি করিয়া রহিয়াছে। যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সাধিত হইতেছে, সেই নিয়মের ফলেই যত অযোগ্য, যত স্থিতিশীল জীব, তাহারা ঝরিয়া পড়িতেছে। জীব-জগতের এই উত্থান-পতন চক্রনেমির মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

হিসাব-নিকাশের সুদীর্ঘ যোগবিয়োগ অন্তে যেমন আমরা শুধু দেনা বা পাওনা মোট কত দাঁড়াইল, তাহাই জানিতে পারি, তেমনি অনাদিকালের এই নির্ব্বাচন-প্রণালীতে যুগযুগান্তর ধরিয়া যে ধ্বংস-নাটিকা অভিনীত হইতেছে, তাহারই শেষ অঙ্কটি মাত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। যাহা অতীত, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমানের ললাটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই জন্যই আমরা সুদূর অতীতের

ইতিহাস সংকলন করিতে সমর্থ হই। বর্ত্তমান জীব অতীতের ধারা রক্ষা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ-লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন-সংগ্রামের ফলে অর্জ্জিত হইয়াছে। একই পরিবারের বা শ্রেণীর বিভিন্ন জীব বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন গুণগ্রাম লাভ করিয়াছে।

গুণভেদ দেখিয়া আমরা জাতিভেদ কল্পনা করিয়া বসি। বাদুড় উড়িতে পারে বলিয়াই যে সে পক্ষী-জাতিভুক্ত হইবে, এরূপ নহে। বাদুড় স্তন্যপায়ী জীবের অন্তর্গত; কিন্তু ক্রমাগত উড়িবার চেষ্টা করিয়া-করিয়া, তাহারা একরূপ পক্ষ উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছে। এক-প্রকার কাঠবিড়ালীও উড়িয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতে পারে। হাঁস অন্যান্য পক্ষীরই মত। একপ্রকার হাঁস সারি বাঁধিয়া আকাশ-পথে উড়িয়া চলে। 'মানসং যান্তি হংসাঃ' ইহা প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধি। কিন্তু সন্তরণ করিবার প্রবল চেষ্টা হইতে তাহাদের পায়ের আঙ্গুল জোড়া লাগিয়া গিয়াছে; ইহাতে তাহাদের সন্তরণের সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে পক্ষের অব্যবহার হেতু, গৃহপালিত হংস উড়িবার শক্তি হারাইয়াছে; এখন তাহাদের বিস্তৃত পক্ষ বোঝা মাত্রে দাঁড়াইয়াছে, হয় ত কালে ইহাদের পক্ষ লোপ পাইবে।

মৎস্য জলে থাকিয়া-থাকিয়া যে ডানা গজাইয়া লইয়াছে, তাহাই বাতাসের সাহায্যে পক্ষীর পক্ষদ্বয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিমি মাছ জলে থাকিয়া মৎস্যের অনেকগুলি স্বভাব পাইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিমি মৎস্যের জ্ঞাতি নহে। ইহারা স্তন্যপায়ীদিগের জ্ঞাতি। এই সকল তথ্য পুরাতন কাহিনীতে দাঁড়াইয়াছে; ইহাদের বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমার এই প্রবন্ধের জন্য এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, আমরা আপাত-

দৃষ্টিতে যে সকল প্রভেদ দেখিয়া জীবসমূহের মধ্যে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র জাতি বা শ্রেণীর কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হয় ত কোনও স্থায়ী বা অপরিবর্ত্তনীয় পার্থক্য নহে। একই মনুষ্য-পরিবারের শাখা যেমন ভৌগোলিক সংস্থানের বিপর্য্যয়ে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ হয়, কেহ বিড়ালাক্ষ, কেহ হনুমন্ত এবং কেহ বা বহুলোমশ হয়, তেমনি একই পরিবারের বা আদিম অবিভক্ত শ্রেণীর জীবগণ অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে ভিন্ন-ভিন্ন গুণের আশ্রয়ভূত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই ক্রম-বিকাশবাদের প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে পৃথক-পৃথক ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হইত; ডারুইন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, অল্প-সংখ্যক বা একইমাত্র মূল জাতি হইতে সমস্ত জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম ও স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে নূতন-নূতন গুণের উদ্ভব হওয়ায়, সেগুলি জাতিগত পার্থক্যে পরিণত হইয়াছে; এবং আমরা তাহাদের জন্ম-কথা ভুলিয়া গিয়া, জাতি-বৈষম্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, জীবকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ, তাহারা একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখামাত্র।

এক্ষণে সমস্যা হইতেছে এই যে, বিড়াল ও ব্যাঘ্র, শৃগাল ও নেকড়ে, গাধা ও ঘোড়া, গোরিলা ও ওরাঙ্গকে আমরা এক পরিবারভুক্ত বলিয়া গণনা করিতেও পারি; কিন্তু সমস্ত পশু-জাতির মধ্যে ত এমন একটি সুস্পষ্ট জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই না। তাহার উত্তরে জীবতত্ত্ববিদ্ বলিবেন যে, আমরা প্রথমতঃ পৃথিবীর যাবতীয় জন্তুকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া দেখিলে, এই ঐক্যের সূত্রটি দেখিতে পাই। বিড়ালকে উপ-কথায় বাঘের খুব নিকট কুটুম্ব বলিয়া প্রচার করিলেও, আমরা তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের একটু আভাসমাত্র বই আর কিছুই পাই

না। মানুষ ও সাধারণ বানরে যে সাম্য, সে শুধু তিরস্কারের সময়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করে ; তাহাদিগের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার বিষয় বুঝিতে সাহায্য করে না। কিন্তু যদি বিড়ালের পার্শ্বে স্তরে-স্তরে বন্য বিড়ালগুলিকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, এবং তার পরেই ঠিক রয়েল বেঙ্গল জাতীয় বাঘ না আনিয়া, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগুলিকে পর-পর সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে বাকী থাকে না যে, কেমন করিয়া এই সমস্ত জীব এক বৃহৎ বিড়াল-পরিবারে স্থান পাইতে পারে। সেইরূপ বানর জাতীয় জীব যত প্রকার আছে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া, পর-পর শিম্পাঞ্জি, ঔরাঙ্গ ও গোরিলাকে দাঁড় করাইয়া তাহার পার্শ্বে কতকগুলি পার্লামেণ্টের মেম্বরকে স্থাপন না করিয়া, যদি লঙ্কার বনমানুষ বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণকে দাঁড় করিয়া দেওয়া যায়, এবং পর-পর নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান্, মোঙ্গোলিয়ান ও আর্য্যগণকে সাজাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক আপত্তির মীমাংসা সহজেই হইয়া যায়।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে স্তর-বিন্যস্ত ভাবে আমরা জন্তুদিগকে সাজাইতে পারি না। অনেক সময়ে এইরূপ সাজাইবার মধ্যে-মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছি, তাহাই আমাদিগকে এই ফাঁকগুলি পূরণ করিবার পক্ষে সহায়তা করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে অযোগ্য জীবগুলি বিনাশপ্রাপ্ত ও কালে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে সকল জীব জ্ঞাতিত্বের ধারা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিত, তাহারা লোপ পাইয়াছে ; কাজেই আমাদের শ্রেণী-বিভাগের পারম্পর্য্যে ফাঁক থাকিয়া যায়। ইহা যে কল্পনামাত্র, তাহা নহে। ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়

হইতে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। যে সকল জীব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কঙ্কাল ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। সেই সকল জীর্ণ কঙ্কাল আমাদের সমস্যা-পূরণে সহায়তা করে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সব সময়ে পৃথিবী কঙ্কাল জোগাইয়া আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন না। তাহার কারণ, কোটী-কোটী বৎসরে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাতে অনেক চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।

শুধু শ্রেণী-বিভাগ হইতেই যে আমরা জ্ঞাতিত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা নহে। প্রত্যেক জীবেরই একটি আদিম অবস্থা আছে; এবং সেই আদিম অবস্থায়, অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থায় সমস্ত জীবেরই আকৃতি প্রায় একরূপ। পরে যত সে ভ্রূণ অভিব্যক্তি লাভ করে, ততই তাহার বিশেষ-বিশেষ জাতীয় গুণ প্রকাশিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল গুণ অন্তর্নিহিত থাকে, তাহাই পরে পরিস্ফুট হইয়া উঠার নামই অভিব্যক্তি।

জীবজন্তুদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া আমরা অল্প কয়েকটি জাতিতে ~~উপনীত~~ হই,—যেমন স্তন্যপায়ী জীব, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ও উভচর। সমস্ত মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবকে এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই সকল শ্রেণী এক-একটি বৃহৎ পরিবার; এবং ইহাদের মধ্যে যে সমতা দেখা যায়, তাহা রক্তের সম্বন্ধ বা সমানগোত্র-জনিত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এক পরিবারের যাবতীয় জন্তুর মধ্যে যে আকৃতি, বর্ণ ও অভ্যাস বিষয়ে নানা বৈষম্য রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া জীবতাত্ত্বিক তাহাদের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন যে, ইহারা একই মূল বংশ হইতে বা একই আদিম পিতামাতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে, জীবন-সংগ্রামের অল্পাধিক তীব্রতার ফলে

ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা স্বভাব প্রাপ্ত হইলেও ইহাদের মূলগত প্রকৃতি এক। অবস্থার সংবলনে এই যে বৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে, ইহার একটি নির্দ্দিষ্ট ধারা বা পন্থা আছে, যাহাকে ক্রম-বিকাশ বলা যায়। ক্রম-বিকাশ অর্থে জীবতত্ত্বে ইহাই বুঝায় যে, জৈব পদার্থ ক্রমশঃ সরলতা হইতে জটিলতায়, একরূপতা হইতে বিবিধ-রূপতায়, সাজাত্য হইতে বৈজাত্যে উপনীত হয়। পূর্ব্বে জীবের আদিম অবস্থার প্রসঙ্গে গর্ভস্থ ভ্রূণের কথা বলিয়াছি। ভ্রূণ প্রথম অবস্থায় অনির্দ্দিষ্ট পিণ্ডের মত আগাগোড়াই একরূপ অবয়ববিশিষ্ট থাকে; পরে হস্ত, পদ মস্তক আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ক্রমশঃ জটিল করিয়া তুলে। গর্ভস্থ ভ্রূণের সম্বন্ধে যে অবিসংবাদী নিয়ম খাটে, সমস্ত জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। একটি বা কয়েকটি মৌলিক জীবপ্রকৃতি হইতে সমস্ত জীব-নিবহ উদ্ভূত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হই। অর্থাৎ মার্জ্জার যদি অভিব্যক্ত হইয়া ব্যাঘ্রে পরিণত হইয়া থাকে, বানর যদি বিবর্ত্তন-ফলে মানুষে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে ইহা মোটেই বিচিত্র নহে যে, মৎস্য সরীসৃপে, সরীসৃপ পক্ষীতে, এবং পক্ষী চতুষ্পদে ও চতুষ্পদ ক্রমে দ্বিপদ ও দ্বিভুজ জীবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বংশানুক্রমিকতার ফলে সমস্ত জীবনিচয়ের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্যের ক্রিয়া ক্রমবিপর্য্যয়ের দ্বারা বাধিত হয়। মৌলিক জীবোপাদান হইতে যেমন একটি সাদৃশ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তেমনই বিপর্য্যয় বা বৈচিত্র্যের দিকেও জীবের যথেষ্ট ঝোঁক রহিয়াছে। স্বাভাবিক নির্ব্বাচনে যে সকল বৈচিত্র্য বা বিপর্য্যয় জীবের সুবিধাজনক হইয়াছে, তাহারাই স্থিতিলাভ করিয়াছে। এই সত্যটি আমরা কার্য্যতঃও দেখিতে পাই। মানুষ ইচ্ছা করিয়াও জীবদেহে কতকটা বৈচিত্র্যের সংঘটন

করিতে পারে। পশুপালক এবং কৃষক জানে যে, বাছিয়া-বাছিয়া পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতার সংমিশ্রণ সাধন করিলে নূতন নূতন প্রকারের বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতি দেখা গিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যৌন-সম্মিলন ঘটাইয়া, বিভিন্ন বৃক্ষলতার কলম একত্র রোপণ করিয়া অদ্ভুত রকমের বৈচিত্র্য পাওয়া গিয়াছে। মানুষ যাহা অল্প পরিমাণে সাধন করে, প্রকৃতির বিশাল পরীক্ষাশালায় তাহা বহুল পরিমাণে সাধিত হইতেছে,—ইহাই বিজ্ঞানবিদ্‌গণের 'স্বাভাবিক নির্ব্বাচন'।

এই মতবাদ যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন তাহার প্রধান শত্রু ছিল জগতের ধর্ম্মমতসমূহ। অনেক ধর্ম্ম বলে যে, ভগবান পৃথক-পৃথক ভাবে জীব-সম্প্রদায় বা জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং এই সকল প্রাণী, জাতি অপরিবর্ত্তনীয়; অর্থাৎ এক জাতির জীব অপর জাতিতে কোনও কালে বিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিন্তু, এক্ষণে সমস্ত তর্ক নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মমত সকলও বুঝিয়াছে যে, পৃথক্ ভাবে পশুপক্ষী সৃজন করা অপেক্ষা একটি মূল বীজ সৃজন করায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সমধিক প্রকাশিত হয়। মনু বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।

ভগবান স্বয়ম্ভূ পূর্ব্বে জল সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বীজ আরোপণ করিলেন।

এই বীজে প্রাণী-জনক সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত আছে। কেন না যাহা আছে, তাহাই সময় ও সুবিধা পাইলে অভিব্যক্ত হয়; যাহা নাই, তাহা কোনও কালেই আসিতে পারে না। সুতরাং বংশানুক্রম সিদ্ধ হইতে হইলে, বীজাণুতে সমস্ত শক্তির বীজ নিহিত আছে স্বীকার করিতে হয়। এবং তাহা স্বীকার করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, কেন পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা অর্জ্জিত কোন

কোন গুণ উত্তরপুরুষে সংক্রমিত হয়। প্রত্যেক জীবকণা বা জীবপঙ্ক প্রথম হইতেই এরূপ ভাবে গঠিত যে, পরে যে সকল গুণ বা লক্ষণ তত্তদ্ জীবদেহে আবির্ভূত হইবে, তাহার অঙ্কুর সেই জীবপঙ্কেই নিহিত থাকে। সুতরাং যদি কোনও অর্জ্জিত গুণ আদিম জীবকণাকে আংশিক রূপেও রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই গুণ শুক্রশোণিতের সাহায্যে সংক্রমিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সন্তানে বর্ত্তে। যাহা এই মৌলিক জৈব উপাদানের উপর কোনও রূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই, তাহা সন্তানে সংক্রমিত হয় না। ইহাই ভাইসমানের Germ-plasm Theory বা বীজাঙ্কুর বা জীবাঙ্কুরবাদ। ডারুইনের Gemmules এবং ভাইস্ম্যানের Germ plasm এই একই মূল জৈব উপাদানের বিভিন্ন নাম মাত্র। ভাইস্ম্যানের মতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বংশানুক্রমিকতার সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করে। কেন যে একটি গুণ সন্তানে সংক্রমিত হইবে এবং অপর একটি গুণ কেন যে হইবে না, তাহা বীজাঙ্কুরের প্রকৃতি প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। একজন আজীবন সঙ্গীতকলার চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইল, সন্তান সে স্থলে পিতার ধারা মোটেই পাইল না; কিন্তু অপর এক ব্যক্তি তোতলা, তাহার সন্তান সে গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে অবিকল প্রাপ্ত হইল। ইহার কারণ এই যে, সঙ্গীত-কলার অনুশীলন তাহার মূল ধাতুর উপর একটুও ছাপ মারিয়া দিতে পারে নাই; অথচ তোতলার তোতলামি তাহার মূল ধাতুকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে যে, তাহার সন্তান সন্ততিতেও সেই ধাতু অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে অনেক ব্যাধি পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে সংক্রমিত হয় এবং অনেক ব্যাধি হয় না। চরকও এই প্রশ্নের মীমাংসায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং তাঁহার মীমাংসা অনেকটা আধুনিক মতের পরিপোষক :—

তত্র চেৎ ইষ্টমেতৎ যস্মাৎ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ, তস্মাদেব মনুষ্য-বিগ্রহেণ জায়তে, যথা গৌর্গোপ্রভবঃ যথা চাশ্বঃ অশ্বপ্রভবঃ ইত্যেবং যদুক্তং অগ্রে সমুদায়াত্মক ইতি তদ্‌যুক্তং।······যচ্চোক্তং যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মান্ন জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ভবন্তীতি তত্রোচ্যতে যস্য যস্য হি অঙ্গাবয়বস্য বীজে বীজভাব উপতপ্তো ভবতি তস্য তস্য অঙ্গাবয়বস্য বিকৃতিঃ উপজায়তে।

অর্থাৎ মনুষ্যদেহ হইতে যে মানুষ, গো-দেহ হইতে যে গো উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ, পিতার সমুদয় দেহ-যন্ত্র তাহার বীজে অনুস্যূত হইয়া থাকে। কিন্তু পিতা যদি জড় বা মূক বা বামন হয়েন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ সন্তানে না বর্ত্তিতেও পারে। দৈবগতিকে কখন-কখনও পিতৃবীজে এই সকল দোষ উপতপ্ত হইলে, সন্তানও তদনুসারী হয়।

দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাৎ দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতং। (শারীর-স্থান)

এক বীজাঙ্কুর হইতে যেমন সমস্ত প্রাণী-জগতের বৈচিত্র্য বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, জড়-জগতেরও তেমনি একটি মূল কারণ কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এক হইতে বহুর আবির্ভাব সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, জড় ও জীব এই উভয়াত্মিকা পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন ধারা হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় কি? সমস্ত চরাচর বিশ্ব এত বৈচিত্র্য, বৈষম্য, বিপর্য্যয় লইয়াও অদ্ভুত সামঞ্জস্যের সহিত ক্রিয়া করিতেছে। মানবের শ্রেষ্ঠ কলা-কৌশল-প্রসূত যন্ত্রও মাঝে মাঝে বিকল হইয়া যায়; কিন্তু এই আবহমান কাল হইতে চলিষ্ণু বিশ্ব-যন্ত্রের মধ্যে কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, একই প্রণালী জীব ও

জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্থাবর, জঙ্গম একই নিয়মে চলিতেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একই অভিব্যক্তির ধারা জীব ও জড়কে একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছে। একই ধূলিকণা বা বাষ্পপুঞ্জ হইতে জড়ের বহুবিধ রূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘে যাহা ধূমের আকারে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, জলে তাহাই নীলিমার দ্যুতি ফলায়। বরফের আকারে যাহা প্রস্তর-কঠিন, বাষ্পের আকারে তাহাই স্বচ্ছ ও স্পর্শের অতীত। সমস্ত জড় পদার্থের মধ্যে এই যে অন্তরঙ্গ ভাব আছে, তাহাই অতীতের কোনও অখ্যাত দিবসে হয় ত বীজাঙ্কুর রূপে প্রথম দেখা দিয়াছিল। সেই হইতে এই অগণিত জীব-প্রবাহের আরম্ভ হইল। পাষাণের বক্ষ ফাটিয়া ক'বে একটুকু ঘাম বাহির হইয়াছিল, আর তাহারই বিন্দু-বিন্দু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া এক পুণ্য প্রবাহিনীর সৃষ্টি করিল, যাহার পূত ধারা ধরার বক্ষ শীতল করিয়া দিয়াছে!

অনেকে মনে করেন, জীব হইতেই জীব জন্মে, অজীব পদার্থ বা জড় হইতে জীবের জন্ম হয় না। এই জন্যই কোনও আদিম জীবপঙ্ক বা Germ-plasmএর কল্পনা করিতে হয়। বৃক্ষ শুকাইয়া পচিয়া ভূ-গর্ভে অঙ্গারে পরিণত হয়, জীবদেহ পরিণামে পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়; কিন্তু অঙ্গার কখনও একটি দূর্ব্বাদলও উৎপন্ন করিতে পারে না এবং পঞ্চভূত কখনও প্রাণের সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রাণের সৃষ্টি প্রাণ হইতেই হয়, প্রাণহীন জড় হইতে হয় না। অথচ এই জড় নহিলেও আবার প্রাণের চলে না। প্রাণের সাড়া আছে সত্য; কিন্তু জড় পদার্থ না থাকিলে সে সাড়া কোন্ কালে বন্ধ হইয়া যাইত। বৃক্ষ, লতা জড় পদার্থ হইতেই রস সংগ্রহ করে, বাতাস হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গারক গ্রহণ করিয়া তবে বাঁচে। জড় মৃত্তিকা যদি তাহাদের

আশ্রয় না দেয়, বৃষ্টি বা জলসেচনের দ্বারা যদি তাহাদের রস-সঞ্চার না হয়, বাতাস, আলো ও তাপ যদি তাহাদের খাদ্য না জোগায়, তবে উদ্ভিদের পরমায়ু সেইখানেই শেষ হয়। আর উদ্ভিদ্ যদি না থাকে, তবে প্রাণী-জগতের পুষ্টিসাধন হয় কিরূপে? জড়ের দ্বারা উদ্ভিদের পুষ্টি, উদ্ভিদের দ্বারা এবং উদ্ভিদ্ ও জীব উভয়ের দ্বারা প্রাণীর পুষ্টি, ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম। তবুও প্রকৃতি জড়, অন্ধ, নিঃসাড়। জড় বা খনিজ পদার্থের ও উদ্ভিজ্জের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা একটি সূক্ষ্মরেখায় পর্য্যবসিত হয়; এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া মিলাইয়া যায়। তথাপি আমরা জড় ও জীবকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, তাহাদের সম্পর্ককে জটিল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, জড় হইতে জীবের উদ্ভব এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কোনও পরীক্ষাগারে এ পর্য্যন্ত জীবনের দানা একটিও প্রস্তুত হয় নাই। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া যেমন একটি নূতন রঙ প্রস্তুত হয়, প্রাণকে সেরূপভাবে উৎপন্ন করিতে আমরা দেখি নাই।

ন খলু চূর্ণহরিদ্রা-সংযোগ জন্মাঽরুণগণস্তয়োরন্যতরাভাবে ভবিতুমর্হতি।

—ভামতী।

প্রাণের রহস্য সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। এই জন্যই প্রাণকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা এতক্ষণ যে পারম্পর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ইহা অন্ততঃ কতকটা আশা করি যে, প্রকৃতির মধ্যে কোনও ফাঁক নাই; স্তরের পর স্তর, স্তরের পর স্তর এইরূপ ভাবে সামান্য

অণু-পরমাণু হইতে ক্রমান্বয়ে জীব-সৃষ্টির মুকুটমণি মানবাত্মা পর্য্যন্ত একই ধারায় চলিয়া আসিয়াছে।

জড়ে যে শক্তি, যে উপাদানপুঞ্জ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই জীব-জগতের ধারক এবং পরিপোষক। যে আলোক গ্রহনক্ষত্রে দীপ্ত হয়, তাহাই হীরক মরকত সুবর্ণে রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাই পত্রপুষ্পের অফুরন্ত শোভায় বিকশিত হইয়াছে। যে রস মেঘের বাষ্পকণায় পুঞ্জীভূত হইয়া রহে, তাহাই সরিৎ-সরোবরে বাহিত হইয়া বনৌষধির প্রাণে সঞ্চারিত হয়। আবার তাহাই জীব-দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে।

এই ক্রম-বিকাশের ধারা স্বীকার করিলে জড়বাদী হইতে হয়, ইহা আমি স্বীকার করি না। কারণ, এই যে উন্নতির স্তরলীলায়িত পন্থা, ইহা দৈবের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দৈব-শক্তি বা chance এই জগৎ-প্রপঞ্চের কারণ হইলে এত সামঞ্জস্য, এমন শৃঙ্খলা, এমন একনিষ্ঠ ধারা সম্ভব হইত না; জড়পদার্থ এমন ভাবে জীবের প্রয়োজন সাধন করিত না। জীবকে প্রস্তুত করিবার জন্যই যেন জড়-বিগ্রহ। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠার একটি বিরাট উদ্যোগ-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে। সমস্ত জগৎ যেন প্রাণের স্পন্দনে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে। নদী অমৃত-ধারা বহন করিতেছে, বাতাস অম্লজান অঙ্গারক যোগাইতেছে, তরু-লতা পত্রপুষ্পের সম্ভার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে, সূর্য্য আলোক ও তাপ দিতেছেন, একি কেবল একটা অন্ধ প্ররোচনা মাত্র? জীবাঙ্কুর কি কীট-পতঙ্গ, গো-অশ্বের মধ্য দিয়া নিরর্থক মানুষে পরিণত হইতেছে? এই যে অভিব্যক্তির ধারা ইহা কি অর্থশূন্য দৈবায়ত্ত ঘটনা-পরম্পরার অন্ধ আবর্ত্তন? এই প্রশ্নই মানবের দর্শনে, ইতিহাসে, কবিতায় ও বিজ্ঞানে, যোগে ও উপনিষদে অনন্তকাল ধরিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া

আসিতেছে। সময়ে সময়ে মনে হয়, বুঝি বা আমরা এ রহস্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাল অতিক্রম করিয়া প্রাণের রহস্য, আত্মার রহস্য, আবার দূর হইতে আমাদিগকে উপহাস করে; বৈজ্ঞানিকের মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়;—

"The question of questions for mankind—the problem which underlies all others and is more deeply interesting than any other—is the ascertainment of the place which man occupies in nature and of his relations to the universe of things. Whence our race has come; what are the limits of our power over nature, and of nature's power over us; to what goal we are tending—are the problems which present themselves anew and with undiminished interest to every man born into the world."

ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবতের পুত্র শিলক নামে ঋষি প্রবাহণ জৈবলিকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

অস্য লোকস্য কা গতিঃ

এই লোকের গতি কি?

আকাশ ইতি হোবাচ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যোঃ জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।

প্রবাহণ বলিলেন, আকাশ অর্থাৎ পরমাত্মাই এই লোকের গতি। সমস্ত স্থাবর জঙ্গম এই পরমাত্মা হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং এই পরমাত্মাতেই অস্তগমন করে অর্থাৎ লীন হয়। এই পরমাত্মাই ভূত সমূহ হইতে মহান্। অতএব অতীত বর্ত্তমান

ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই পরমাত্মা সকল ভূতের পরম গতি বা চরম আশ্রয়।

তপোবনের শান্ত শীতলচ্ছায়ায় বসিয়া সৌম্যকান্তি ঋষিগণ ধীরে স্বস্থ, সমাহিতচিত্তে চিন্তা করিতেছেন "ইহ লোকের গতি কি?" মন্ত্রের আশ্রয়স্থল স্বর; স্বরের আশ্রয় প্রাণ; প্রাণের আশ্রয় অন্ন; অন্নের আশ্রয় জল, কেন না জল নহিলে অন্ন উৎপন্ন হয় না; জলের আশ্রয় স্বর্গ; কেন না স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পতিত হয়; স্বর্গের আশ্রয় পৃথিবী এবং পৃথিবীর আশ্রয় আকাশ। আকাশ অর্থে ভূতাকাশ বা নভোমণ্ডল নহে, পরমাত্মা। পরমাত্মা হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের আশ্রয়। এই পরমাত্মাকে জানিলে জীবন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।

অভিব্যক্তির ধারা এই পরমাত্মায় আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া মানবীয় দর্শন পরিপূর্ণতা লাভ করিতেছে। সমস্ত জগৎ, সমস্ত জড় ও জীব, পরমাত্মার বিকাশে পরিণতি লাভ করে। দেহের উপাদান জড়; মনের পাত্র দেহ; প্রাণের আশ্রয় অন্ন; মনও অন্নময়, অন্নময়ং হি মনঃ; মনের আশ্রয় আত্মা আত্মার চরম আশ্রয় পরমাত্মা। অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য পরমাত্মায় পর্য্যবসিত হয়, ইহাই প্রাচীন ঋষিদিগের অভিমত।

আত্মদর্শন

জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই মানুষ সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে। মানুষের চেষ্টা যেন কোন ও অনির্দ্দেশ্য প্রেরণার ফলে সর্ব্বদাই সত্যকে ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা যাহা জানি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করি; যাহা জানি, তাহাও ভাল করিয়া জানিবার জন্য ব্যগ্র হই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রতিনিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা কিছু না কিছু জানিতে পারিতেছি। এই সকলের সন্নিকর্ষ হইতে যে জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। চক্ষুর দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই শুধু প্রত্যক্ষ নহে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা, শ্রবণ, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেও প্রত্যক্ষ বলা হয়, কারণ ইহার প্রত্যেকটি জ্ঞানই অক্ষ বা ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে জ্ঞান-লাভ হয়, তাহার প্রায় দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ চক্ষুর দ্বারা লভ্য হয়। শুধু তাহাই নহে, চক্ষু ঘটিত জ্ঞান অন্যান্য ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুস্পষ্ট, বহুদূরব্যাপী ও বিশ্বস্ত। অনুমানাদির তুলনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অবিসংবাদিত, সেইজন্যই ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞান মাত্রকেই প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতেও observation শব্দটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞান মাত্রে প্রযুক্ত হয়।

প্রত্যক্ষ

'দর্শন' শব্দের অর্থ ও জ্ঞান লাভ করা। সত্যের সাক্ষাৎকারের নাম দর্শন। চক্ষুর দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের মতই সত্যোপলব্ধি নিঃসংশয়, দৃঢ়ত্ব-সম্পন্ন এবং উজ্জ্বল। সত্যের প্রকাশ কবিকল্পনার

বিষয় নহে, তর্কজালের দ্বারা রচিত কোনও মতবাদ মাত্র নহে।

দর্শন

সত্য যখন কাহারও চিত্তপটে প্রতিফলিত হয়, তখন তাহা সমস্ত আশঙ্কা-সংশয়ের অন্ধকাররাশি বিনাশ করিয়া আলোকের মত, জ্যোতির মত, সূর্য্যের মত প্রকাশিত হয়।

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।—ছান্দোগ্য।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।—মুণ্ডক।

সেই জন্য যাঁহারা সত্যের উপলব্ধি করিতেন, তাঁহাদিগকে এদেশে ঋষি বা মন্ত্রের দ্রষ্টা বলা হইত; ইয়ুরোপে বলিত 'Seer.' সেই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধিকে 'দর্শন' বলা হয়।

Philosophy অর্থে 'দর্শন' শব্দটি আমাদের দেশে খুব প্রাচীন নহে। কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎকার যে প্রাকৃত দৃষ্টিরই মত, ইহা আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন ধারণা। তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়সাধ্য নহে, তাই উপনিষদ্ বলেন আত্মা দিব্য দৃষ্টি-সম্পন্ন।

মনোঽস্য দিব্যং চক্ষুঃ।

ইহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় জ্ঞানযোগী মহাদেবের তৃতীয় নয়ন কল্পিত হইয়াছিল। সেই জ্ঞান-নয়নের জ্যোতিঃ অগ্নি-জ্বলনের ন্যায় মদনকে ভস্ম করিয়াছিল। জ্ঞান বিনা কামকে ভস্ম করিতে পারে, এরূপ সাধ্য আর কিছুরই নাই।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে দর্শন শব্দের প্রয়োগ আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই ঃ—

আত্মা বারে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।

আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, ধারণা করিতে হইবে এবং ধ্যান করিতে হইবে।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শনহেতবঃ ॥

উপরি উক্ত প্রাচীন শ্রুতি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দর্শন শব্দের দ্যোতনা প্রাচীন কাল হইতেই কোন দিকে রহিয়াছে। উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ হইতেও আমরা এই অর্থই প্রাপ্ত হই। আত্মা চিৎস্বভাব বা চৈতন্যময়। চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের উপলব্ধি প্রসিদ্ধ। চক্ষু শরীরের অংশ মাত্র, সুতরাং জড়ের ধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং চক্ষুর ব্যাপার যে দর্শন, তাহা আত্মাতে প্রযুক্ত হইবে কি প্রকারে? আত্মদর্শন একটি অসাধারণ ব্যাপার হইলেও, ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট ইহাই পরম সত্য বলিয়া উপপন্ন হইয়াছিল।

আত্মদর্শন

প্রাচীন কালে তত্ত্ব জ্ঞানকে 'বিদ্যা' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। আমরা এখনও তত্ত্ববিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ কখনও কখনও ব্যবহার করিয়া থাকি। জ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা আছে যথা আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ইত্যাদি। জ্ঞানের মূল কাণ্ডের নাম বেদ। যাহাতে পরম তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাই বেদ। আধুনিক ভাষায় পারিভাষিক ভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, সম্যক্‌জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের প্রচলনের চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যায়।

Philosophy শব্দটি আমাদের অনেকের নিকট সুপরিচিত। ইহার মূল অবশ্য গ্রীস্ দেশে। হিরোডোটস লিখিয়াছেন যে ক্রিসাস্ (Croesus) এবং সোলন (Solon) এর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ক্রিসাস্ বলিতেছেন যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই সোলনের নাম শ্রুত আছেন। সোলন যে জ্ঞানের লোভে (philosophising) নানা দেশ পর্য্যটন

দর্শন ও Philosophy

করিয়াছেন, তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। লোকে দেশ পর্য্যটন করিতে যায় ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে অর্থের অথবা চাকরীর চেষ্টায়। সুতরাং কেহ যখন শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশ-পর্য্যটনে যায়, তখন তাহাকে নিঃস্বার্থ বা অহৈতুকী জ্ঞান-লিপ্সাপ্রণোদিত বলিতে হয়। ইহাই পাশ্চাত্য জগতে ফিলজফি কথার মূল। কথিত আছে, পাইথাগোরস আপনাকে ফিলজফস্ অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগী বলিতেন, 'জ্ঞানী' এ কথা বলিতেন না। এই কথাটির মধ্যে একটু তাৎপর্য্য আছে—তত্ত্বজ্ঞান যে নিঃস্বার্থতা-প্রণোদিত, ইহাই ঐ পারিভাষিক শব্দটির ইতিহাসে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের 'দর্শন' শাস্ত্র ঠিক নিঃস্বার্থতা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ প্রচলিত দর্শনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায়শঃ তাহাদের জন্ম পরমার্থ-চিন্তন হইতে। পূর্ব্ব মীমাংসা ব্যতীত অন্য দর্শনগুলির উদ্দেশ্য যে মোক্ষ-লাভ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। মোক্ষকেই প্রাচীন ঋষিগণ পরম পুরুষার্থ বা 'নিঃশ্রেয়স' (অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেয়ঃ নাই—summum bonum) এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ একটি পারমার্থিক বা পারলৌকিক প্রয়োজন থাকায় এদেশে দর্শন শাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্বের বা theologyর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ইউরোপের মধ্যযুগে যেরূপ তদ্দেশীয় দার্শনিক বিদ্যা ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া Church এর কবলে পড়িয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ ভাবে দর্শন শাস্ত্রের স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মমতের দ্বারা খর্ব্ব হইয়াছিল। এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে আমাদের দেশের দর্শনকে 'ফিলজফি' পদবীর যোগ্য মনে করেন না। পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক চিন্তা অব্যাহত-স্বৈরগতি।

ভগবৎতত্ত্ব, পরলোকবাদ, শ্রুতি স্মৃতির দ্বারা তাহার প্রণালী সীমাবদ্ধ নহে।

আমাদের দেশের দার্শনিক বিদ্যার যে স্বাধীনতা ছিল না, তাহা আমি স্বীকার করি না। লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তত্তৎকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, যে সকল দার্শনিক মত আমরা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে প্রাপ্ত হই, তাহা বহুকালের গবেষণার ফল। তাহাদের ক্রম-বিবর্ত্তন অল্প দিনে হয় নাই। ঐ সকল মত গঠিত হইবার জন্য শুধু যে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা নহে; সমাজ দেহে রাষ্ট্রনীতিতে ও ধর্ম্ম-জগতেও যে নানা ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য

যাহাই হউক, জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ করিবার যে চেষ্টা, সত্যের জন্য সত্য উদ্ধার করিবার যে সংকল্প, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। পাশ্চাত্য জগতে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় এই যে নিঃস্বার্থতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অশেষ কল্যাণের আকর হইয়াছিল। ইহার ফলে সে দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব মনকে উন্নতির পথে বহুদূর লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের যে মোক্ষবাদ, ইহারও অনুকূলে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, আদর্শ হিসাবে যেরূপই সিদ্ধান্ত করি না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত যে, জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রত্যেক কার্য্যই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত। জ্ঞানলাভ ক্রিয়ারও একটি উদ্দেশ্য থাকিবেই। অর্থোপার্জ্জনই হউক, আর প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠাদিই হউক, কোনও না কোনও উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান থাকিবেই। বেকন্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জ্ঞানই শক্তি। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি জন্মে। সেই শিক্ষার ফলে আজ মানব নিত্য নূতন জ্ঞানের আহরণে নিযুক্ত আছে এবং এই জ্ঞানের দ্বারা সে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে সংহত ও নিয়ত করিয়া নিজের কার্য্যে লাগাইতেছে। বিদ্যুৎকে দিয়া সে কল চালাইতেছে, পাখা ঘুরাইতেছে, বাতি জ্বালাইতেছে, দূর দূরান্তরে সংবাদ বহন করিতেছে। জল বায়ু পৃথিবী মন্থন করিয়া নব নব নিয়মের আবিষ্কার দ্বারা সে জগতের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

জ্ঞানই শক্তি

আর্য্য ঋষিগণ এই সকল জাগতিক ব্যাপার হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোনও হীন, তুচ্ছ সংকীর্ণ স্বার্থ-প্রাপ্তি নহে। মানব জীবনের চরম কল্যাণ, আত্মার পরম শ্রেয়লাভের চেষ্টায় তাঁহারা 'দর্শন'কে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন। পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করিয়া যে তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালী পরম পুরুষার্থে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাও কম নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহারা মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে কি বুঝিতেন। হিন্দুদিগের মুখ্য ষড়্ দর্শন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। মীমাংসা, ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগ। মীমাংসা দর্শন পূর্ব্ব এবং উত্তর অথবা কর্ম্মমীমাংসা এবং তত্ত্বমীমাংসা এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম-মীমাংসায় আত্মতত্ত্বের উপদেশ পাওয়া যায় না। স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য কি প্রকারে যাগযজ্ঞ করিতে হয়, তাহারই উপদেশ জৈমিনির ধর্ম্ম-মীমাংসা বা কর্ম্ম-মীমাংসায় দেখিতে পাওয়া যায়। জৈমিনির

মোক্ষ

মতে কর্ম্মই ফল-প্রদানে সমর্থ। ইহার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না।* এই পূর্ব্ব মীমাংসা ভিন্ন সকল দার্শনিক তত্ত্বের লক্ষ্য—মোক্ষ, মুক্তি বা অপবর্গ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মোক্ষধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সদোষাঃস্যুঃ পুনরাবৃত্তিকারকাঃ॥

ন্যায় মতে—

অথ শাস্ত্রস্য পরমং প্রয়োজনমপবর্গঃ।

মোক্ষই পরম প্রয়োজন।

কণাদ বলেন ঃ—

যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্ম।

ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলেন—

"নিঃশ্রেয়সমাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ।"

বিবৃতিকার বলেন—

"নিঃশ্রেয়সং মোক্ষঃ।"

সাংখ্য বলেন—

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি।

কৈবল্য অর্থে—মোক্ষ। মোক্ষই পুরুষার্থ।

পুরুষার্থো মোক্ষস্তদর্থং জ্ঞানমিদং গুহ্যং রহস্যং
শ্রীকপিলর্ষিণা সমাখ্যাতং (গৌড়পাদ ভাষ্য)

* যদিও লৌগাক্ষি ভাস্কর পূর্ব্ব-মীমাংসার্থ সংগ্রহে বলেন—

ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মানস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।

অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, তাহাই নিঃশ্রেয়স—অর্থাৎ মোক্ষের কারণ হয়।

যোগ দর্শনের লক্ষ্যও মোক্ষ বা কৈবল্য। অভ্যাসের দ্বারা দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ে অর্থাৎ ধন রত্ন স্ত্রী-পরিজন এবং স্বর্গাদি কাম্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ ব্যক্তি পুরুষ-দর্শন অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান-প্রসাদে পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-শূন্য গুণের প্রলয় হইয়া আত্মা মাত্র চিৎশক্তিতে নিয়ত অধিষ্ঠান করেন।

পুরুষার্থ-শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তেরিতি

(যোগসূত্র—কৈবল্য পাদ)

তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত সুখের নিকট পার্থিব কোনও সুখই দাঁড়াইতে পারে না।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

সুতরাং তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিলে, লোক জীবন্মুক্ত হইতে পারে। শ্রুতিও বলেন—"জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি।"

বেদান্ত আত্মাকে মোক্ষ-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ (বেদান্ত সূত্র ১ম পাদ ৭ম সূত্র)

'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এইরূপ শ্রুতি হইতে আত্মার চিৎস্বরূপতা ও 'অথ সংপৎস্যে' ইত্যাদি হইতে প্রারব্ধ-ক্ষয়ানন্তর মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

অতএব আমাদের প্রধান আর্ষ দর্শনগুলিকে মোক্ষদর্শন বলিলেও অন্যায় হয় না। বৌদ্ধ দর্শনে যে নির্ব্বাণের আদর্শ আছে, তাহাও এই মোক্ষেরই নামান্তর বলিয়া আমি মনে করি। অনাদি-বাসনা-সন্তান নিবৃত্ত হইলে নির্ব্বাণ-লাভ হয়।

রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (সর্ব্বদর্শন)

আর্হত দর্শনেও মোক্ষমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। সকলপ্রকার কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম হইতেই যাবতীয় ক্লেশ, কর্ম্ম হইতেই সংসার; জন্মমৃত্যু ক্লেশের নামান্তর। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইলে আত্মা ঘৃতাভিবর্দ্ধিত হোমানলশিখার ন্যায় উর্দ্ধে প্রয়াণ করে।

সংসারের অনিত্যতা

এক্ষণে এই যে ভারতীয় দর্শনের একান্ত কামনার বিষয় মুক্তি বা মোক্ষ, ইহার স্বরূপ কি? দর্শনগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে যতই মতভেদ থাক, একটি বিষয়ে বেশ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়,—সংসারের অনিত্যতা। এই অনিত্যতা-বুদ্ধি পাশ্চাত্য দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটো ইহার একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁহার মতে এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, অসার, ছায়াবাজী মাত্র। সত্যলোক জগতের পরপারে কোথাও আছে। এই মরজগতে বসিয়া আমরা কখনও কখনও সেই ধ্রুবলোকের কিছু কিছু আস্বাদ পাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাচ্যে এই অনিত্যতাবাদ এবং দুঃখাত্মকতাবাদ যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পাশ্চাত্যদেশে সেরূপ নহে। এদেশের কাব্যে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে—সর্ব্বত্র এই অসারত্ব-বাদ প্রসার লাভ করিয়াছে। তাই মোক্ষের জন্য এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা।

বন্ধ ও দুঃখ

আমরা মুক্তির প্রয়াসী। কিন্তু মুক্তি চায় কে? যে পরাধীন। আমরা এমন কোন পরাধীনতা ক্লেশ সহ্য করিতেছি, যাহা হইতে ছুটী পাইবার জন্য এরূপ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা! সাংখ্য বলিবেন, জগতের দুঃখরাশি আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে; আমরা ত্রিবিধ দুঃখের

হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই। এমনভাবে পরিত্রাণ চাই যে, আর কখনও সে দুঃখ আমাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে। দুঃখই বন্ধের হেতু।

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূর্ত্তকারী কামোপহতমনা বধ্যতে।

(তত্ত্বকৌমুদী)

কাম্যেঽকাম্যে চ কর্ম্মণি দুঃখাৎ দুঃখং ভবতি।

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

যাহা আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, তাহাও দুঃখ। সুখ-ভোগোঽপি দুঃখভোগ এব। সুতরাং দুঃখ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাই চিন্তনীয়। এই দুঃখ-নিবৃত্তি-বাদ সাংখ্য ও যোগদর্শনের মূল কথা।

জৈন দার্শনিকেরাও বলেন—

কর্ম্মণো নিরসনাদাত্যন্তিক কর্ম্মমোক্ষণং মোক্ষঃ।

(সর্ব্বদর্শন)

কর্ম্ম ত্যাগ করিতে করিতে যখন আত্যন্তিক কর্ম্মক্ষয় হয়, তখন তাহাকে মোক্ষ বলে। কারণ কর্ম্ম করিলেই অবশ্য তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।

কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত সকলই ক্ষয়শীল। শ্রুতিঃ বলেন—যথেহ কর্ম্মচিতো লোক ক্ষীয়তে এবমেবাঽমূত্র পুণ্যচিতো লোক ক্ষীয়তে।

সাংখ্য ও জৈন দর্শন হইতে আমরা কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হই। জন্ম মৃত্যু সকলই কর্ম্মের অধীন। কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। সুতরাং কর্ম্মের বিনাশসাধন করাই দর্শনের প্রতিপাদ্য। ন্যায় দর্শনও বলেন—

ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তেঃ।

কর্ম্ম না থাকিলে ফলও থাকে না। জৈনগণ বলেন যে কর্ম্মের গতিকে আত্মাতে একপ্রকার শক্তি জন্মে, যাহার ফলে আত্মা এই সংসারে পুনঃপুনঃ সেই সেই কর্ম্মানুযায়ী শরীর ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। আর্হত সিদ্ধগণ সেইজন্য সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিহার করাই চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কর্ম্ম কেবল বাহিরের ব্যাপার। শরীরের বা মাংসপেশীর কতকগুলি বিক্ষেপের নাম কর্ম্ম বইত নয়। সেই বিক্ষেপের মূলে যে আভ্যন্তর ব্যাপার আছে, তাহার বিনাশ না হইলে শুধু কর্ম্মের বিনাশে কি হইবে? জৈনেরা সেইজন্য বলেন, চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। কর্ম্মের বীজ-মাত্রও যেন না থাকিতে পারে, এমন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা তিনটী সাধনের নাম করিলেন, তাহাদিগকে ত্রিরত্ন বলে।

মোক্ষের পন্থা

সম্যগ্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ

(সর্ব্বদর্শন)

অর্থাৎ মোক্ষের তিনটি পন্থা সম্যকদর্শন, জ্ঞান এবং সচ্চরিত্রতা। সম্যক্‌দর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে যে প্রভেদ, জৈনদের মতে সম্যকদর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে সেই প্রভেদ। একটি Intuition, অপরটি knowledge. উভয়ই সাধন-সাপেক্ষ। একটির দ্বারা মনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বের স্ফুরণ হয়, অপরটি যুক্তি তর্ক আলোচনার দ্বারা সিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধেরা কর্ম্ম অপেক্ষা বাসনার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান হইলেন। বাসনাই কর্ম্মের মূল। কর্ম্ম সংসারের মূল। যাবতীয় কর্ম্ম-পরম্পরার মধ্য দিয়া একটি বাসনার সূত্র প্রলম্বিত রহিয়াছে।

সেই বাসনার সূত্র যতদিন বিনষ্ট না হইবে, ততদিন পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হইবে। নিওপ্লেটনিক দার্শনিকগণের মধ্যেও এইরূপ একটি তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; অপরিতৃপ্ত বাসনাই সমস্ত পৃথিবীর মূল কারণ ঃ—

"The whole world that we know arose and took its shapes from desire.—Plotinus

সুতরাং বাসনাকে বর্জ্জন করিলেই ভবোচ্ছেদ হইবে বা নির্ব্বাণ লাভ হইবে, ইহাই বৌদ্ধদিগের অভিপ্রায়।

সংকল্পং বর্জ্জয়েৎ তস্মাৎ সর্ব্বানর্থকারণম্।

—বিবেক চূড়ামণি

এই আদর্শ যতই সুসঙ্গত হউক না কেন, প্রাকৃত জগতে ইহা অতি কঠিন ব্যাপার। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মানব কোনও না কোন কর্ম্ম করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াহীনতার নামই মৃত্যু। সুতরাং কর্ম্ম বা বাসনার অতীত হওয়া আদৌ সম্ভবপর কি না, তাহাই সন্দেহ। এইজন্য শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা সমন্বয় করিলেন—কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্ম্ম করিতে হইবে; কর্ম্ম না করিলে চলিবে কেন? কর্ম্মের দ্বারা যে জগৎসংসার চলিতেছে! তোমার নিজের জন্য যদি কর্ম্মের আবশ্যকতা নাও থাকে, তাহা হইলে লোকশিক্ষার জন্য তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ—

কর্ম্মফল

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কাণ্ট্ বলিলেন আসক্তি শূন্য না হইতে পারিলে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না। মমতা, স্নেহ, প্রণয়, স্বার্থ প্রভৃতির প্ররোচনায় যে

কর্ম্ম করা যায়, তাহা হীন কর্ম্ম। সুতরাং এসকল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতেই কর্ম্ম করিলে তাহারই চারিত্রনৈতিক উৎকর্ষ স্বীকৃত হইবে।

কলাসক্তি

গীতা কিন্তু এরূপ অনাসক্তির কথা বলেন নাই। কর্ম্ম করিব অথচ দয়া, শ্রদ্ধা, সমবেদনা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি যাহা কর্ত্তব্যসাধনের প্রেরণা জন্মায়, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিব, ইহা সম্ভব নহে।

বিষয়েষ্বরতির্জন্তোর্মরুভূমৌ লতা যথা (যোগবাশিষ্ঠ)

গীতা ফলে অনাসক্তিই উপদেশ করিয়াছেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

কর্ম্মফলে যে আসক্তি তাহাই বাসনার বীজ। আমার যাহাতে অভিরুচি, আমার যাহাতে আবেশ, আমার যাহাতে সুখ, এমন কিছু করিবার জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্য ভগবান্ বলিলেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।

ফলের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজকে বিযুক্ত করিতে হইলে সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। যাহা কিছু করিলাম, তাহা সমস্তই শ্রীবিষ্ণুচরণে সমর্পিতমস্তু এই বুদ্ধি লইয়া করিতে হইবে। আমি স্বর্গ চাই না, ধন-জন পুত্র-কলত্র চাই না, ইন্দ্রিয়-সুখ চাই না, সংসারের কোনও বস্তুতেই আমার কামনা নাই, শুধু "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ মঙ্গলময় স্বামী।" আমি যেমন অবস্থায় থাকি না কেন, সুখে থাকি বা দুঃখেই থাকি, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক না, শুধু কামনা এই :—

"মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে" (বিদ্যাপতি)

তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন যতদিন কোনও পার্থিব কামনা লইয়া ভগবানকে ভজনা করিবে, সে ভজনা কাম নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কেবল তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহাকে ভজনা করার নাম প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
(চৈতন্যচরিতামৃত)

যতদিন ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন প্রেম অঙ্কুরিত হইতে পারে না। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি এক চার্ব্বাক ব্যতীত ভারতীয় সকল দর্শন শাস্ত্র কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানে ও সহজাত সংস্কারবলে দেহেই আত্মাভিমান হয়। অস্থিমাংস-বসার সমষ্টি নানা সুখদুঃখ ব্যাধিজরার আকর। যতকাল এই শরীর আত্ম-পদবাচ্য হয়, যতকাল ইন্দ্রিয়বিষয়ে 'আমার' এই অভিমান দূরীভূত না হয়, ততকাল জ্ঞানের আলোক হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। ততকাল মুক্তি হয় না—জ্ঞান বিনা মোক্ষ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? সেইজন্য বেদান্তশাস্ত্র অবিদ্যা দূর করিয়া দিবার উপদেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা দূর হইলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। (ব্রহ্মসূত্র)

অবিদ্যা কাহাকে বলে?

অজ্ঞানমবিদ্যাহম্মতিরিত্যমরঃ। অমর কোষে অবিদ্যার পর্য্যায় অজ্ঞান এবং অহম্মতি। অহম্মতির অর্থ যাহা আত্মা নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি;

অবিদ্যার ধর্ম্ম

"অহমিত্যস্য মননমহম্মতিরনাত্মন্যাত্মাভিমানাৎ।"

এই যে অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞান রূপ ভ্রম বা অবিদ্যা ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বিপর্য্যয়োঽজ্ঞানমবিদ্যা সা বুদ্ধিধর্ম্মঃ। (তত্ত্ব-কৌমুদী)

এই বিপর্য্যয় বা জ্ঞানের বৈপরীত্য হইতে আত্মার বন্ধন হয়।

বিপর্য্যয়াদতত্ত্বজ্ঞানাদিষ্যতে বন্ধঃ (তত্ত্বকৌমুদী)। ন্যায়সূত্রবৃত্তি বিপর্য্যয়ের অপর পর্য্যায় দিয়াছেন মিথ্যাজ্ঞান; অবিদ্যা শুধু জ্ঞানের অভাব নহে; পরন্তু অযথার্থ-নিশ্চয়তা রূপ মিথ্যাজ্ঞান।

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানাপরপর্য্যায়োঽযথার্থনিশ্চয়ঃ।"

অবিদ্যা যে বিদ্যাবিরোধিজ্ঞানান্তরম্ একথা যোগশাস্ত্রের ব্যাস-ভাষ্যও স্বীকার করেন।

জৈনেরাও বলেন—

মিথ্যাজ্ঞানাবিরতি কষায়াঃ বন্ধহেতবঃ (বাচকাচার্য্য)

মিথ্যা-জ্ঞান, অবিরতি বা আসক্তি এবং পাপ লোকের বন্ধনহেতু হয়।

এ স্থলে খৃষ্টানদিগের মুক্তিবাদ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ খ্রীষ্টানেরাও মোক্ষবাদী। পাপবশে আত্মার অধঃপতন ঘটিয়াছে। মানবের আদিম অবস্থা হইতেই এই পাপ আশ্রয় করিয়াছে। সেই পাপের ফলে মানবাত্মার স্বর্গচ্যুতি হইয়াছে। সুতরাং পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। খ্রীষ্টানদিগের এই মুমুক্ষুত্বের সহিত হিন্দুদিগের মুমুক্ষুত্বের আংশিক সামঞ্জস্য থাকিলেও পার্থক্য যথেষ্ট। খৃষ্টানের মুক্তিবাদ আগন্তুক এক পাপোৎপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রোথিত নহে। গ্রীস্ দেশের এক রহস্যবাদে (Orphic mysteries) আত্মার পতনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় মুক্তিবাদ

ঐ রহস্যবাদ হইতেই এই মৌলিক পাপের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। যাহা হউক, খ্রীষ্টানেরা মনে করেন যে মৃত্যুর পর আত্মা কিছু কাল দেহ-বিযুক্ত অবস্থায় বাস করে; পরে বিচারের দিন সমাগত হইলে আত্মা ভগবানের দরবারে হাজির হয়। সেখানে করুণাবতার যীশুখৃষ্ট তাহাদের সকলের পাপ নিজ-স্কন্ধে গ্রহণ করিলে পরে মানবাত্মা মুক্ত হয় এবং অনন্তকাল ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করিয়া অপার সুখের অধিকারী হয়। খৃষ্টানেরা পাপ ও মৃত্যু এই দুই তত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তদুপরি মুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাপ হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যুর দ্বার দিয়া অমৃতে প্রবেশ—ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মূল কথা।

Like the hand which ends a dream
Death with the might of his sunbeam
Touches the flesh and the Soul awakes.
—Browning

খৃষ্টীয় এই মুক্তিবাদের মধ্যে আমরা প্রাচ্য আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই না। আত্মার দর্শন-কাম্যতা ইহার প্রতিপাদ্য নহে। ইহাতে পাপতত্ত্ব আছে, অজ্ঞানতত্ত্ব নাই। দ্বৈত-জ্ঞান আছে, অদ্বৈত-সিদ্ধি নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আর্হত দর্শনে বন্ধের হেতু কষায় বা পাপ বলিয়া বর্ণিত আছে। "নিজ্জর" না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানবাদী যোগদর্শনকার বলিয়াছেন, চরিত্র-শুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান-লাভ করিবার যোগ্যতা হয় না।

সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়-জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ
(সাধনপাদ—৪১)

শুচিতা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, অর্থাৎ মনের নির্ম্মলতা; মনের নির্ম্মলতা হইতে আনন্দ; তাহা হইতে একাগ্রতা; তাহা হইতে

ইন্দ্রিয়জয় এবং ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শনযোগ্য শক্তি হয়।

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মতত্ত্বে চরিত্র-নীতির স্থান অতি উচ্চে। মৃত্যুর চিন্তা হইতে পরলোকের নানা প্রকার কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে। পরলোকবাদ ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাণ স্বরূপ। শোপেন-হাওয়ার বলেন "মৃত্যুই সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের জননী।" মৃত্যুকে বরণ করিতে কেহ চাহে না। সকলেই জীবনের প্রয়াসী; যোগশাস্ত্র ইহাকে অভিনিবেশ বলিয়াছেন—

হিন্দুদর্শনের বৈশিষ্ট আত্মতত্ত্বে

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। (সাধন পাদ)

আমার যেন মৃত্যু কখনও না হয়, আমি যেন চিরকাল থাকি, ইহা প্রাণীমাত্রেই কামনা করে। ইহারই নাম অভিনিবেশ। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইহাকেই বলেন Instinct of self-preservation. ইহকালে আয়ুর বৃদ্ধি এবং পরকালে যাহাতে অনন্ত জীবনলাভ হয়, তাহার জন্য সকলেই সচেষ্ট। এই দুই কাল রক্ষা করিয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই চতুর।

"যা লোকদ্বয়-সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।"

সুতরাং মৃত্যুর চিন্তা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিরল নহে।

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।

পাশ্চাত্য দেশে চরিত্র-নীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের সম্যক্ অনুশীলন হইলেও এ দেশের বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্বে। দার্শনিক যুগের আরম্ভ হইতেই ভারতবর্ষে আত্মতত্ত্বের অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ কখনও আত্মা ও মনের পার্থক্য স্বীকৃত

হইয়াছে। আত্মা ও মন একই পদার্থ এইরূপ ভাবই সচরাচর দেখা যায়। মন হিন্দুদর্শনে ইন্দ্রিয় মাত্র। চক্ষু যেরূপ দর্শনের ইন্দ্রিয় বা সাধন, মন সেইরূপ জ্ঞানের ইন্দ্রিয় বা সাধন। সেই জন্য ইহাকে অন্তঃকরণ বলা হয়। জড়ের ধর্ম্ম ও কিছু কিছু ইহাতে আছে। ইহা বিনাশী (ন্যায় মতে নহে)। পাশ্চাত্য দর্শন মনকে আত্মার সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া, আত্মতত্ত্বের দিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের দর্পণ-স্বরূপ। (Leibnitz এর দর্শন দ্রষ্টব্য) ইহাতে এমন এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহার ফলে মানবাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ভৌতিক উপাদানের দ্বারা ইহা গঠিত হইতে পারে না। জড়-জগতের ধর্ম্ম ইহাতে সম্ভব হয় না। জড়-জগতের যে পরিণাম তাহাও ইহার পক্ষে অপ্রযোজ্য। জগতের ছায়াবাজির মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য, যাহাকে আশ্রয় করিলে সেই ধ্রুব-জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা পার্থিব জ্যোতিঃ নহে—

The light which never was on land or sea.
(Tennyson.)

যিনি এই আলোক দেখিতে পান, তাঁহার নিকট সকল অজানাই জানা হইয়া যায়। কারণ জড়-জগতের বিরাট গ্রন্থ তাহার চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে, অধ্যাত্ম জগতের নিগূঢ় তত্ত্বও সে দেখিবার অধিকারী। কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব জানা বড়ই কঠিন। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ। অণোরণীয়ান্।

আরাগ্রমাত্র পুরুষোঽণুরাত্মা চেতনাবেদিতব্যঃ।

চৈতন্যৈকরস পদার্থ আত্মা—ইহাকে চৈতন্য দিয়া জানিতে পারা যায়। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, পরমাত্মাকে জানিলে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে না।

The mind that wishes to behold God must itself become God. (Philo the Jew)

আমাদের শাস্ত্রেও আছে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে সামানাধিকরণ্য আছে ইহা গ্রীক্ দার্শনিকেরও মত। জীবাত্মাকে তাঁহারাও বস্তুতঃ ভগবানের অংশ স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিতেন।

গীতা বলেন—

মমৈবাংশো জীবলোকো জীবভূতঃ সনাতনঃ।

নিওপ্লেটনিক দার্শনিকেরা বলিতেন, জীবাত্মা ভগবানের স্বরূপ হইতে বিস্ফুলিঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সেই কেন্দ্রের দিকে যাইতেই তাহাদের নিয়ত চেষ্টা। (Plotinus)

উপনিষৎ বলেন—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

(বৃহদারণ্যক)

শুধু যে জীবজগৎ, তাহা নহে। সমস্ত ভূতবর্গ সেই পরমাত্মা হইতে সত্তা লাভ করিয়াছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। (গীতা)

সূত্রে নিবদ্ধ মণিগণের ন্যায় সমস্ত বস্তু আমাতে গ্রথিত। সেই জন্য মধ্বাচার্য্য নিখিল বস্তু-তন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এক স্ব-তন্ত্র; অপর অ-স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।

স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষোঽশেষ সদ্‌গুণঃ॥

(সর্ব্বদর্শন)

পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা ভগবানকে causa sui আখ্যা দিয়াছেন। causa sui অর্থ স্ব-তন্ত্র, স্বয়ং সিদ্ধ ; কারণান্তরানপেক্ষ। স্পিনোজার মতে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর এক, বিশ্বেশ্বর হইতে বিশ্বের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই। সমস্ত সত্তাই ঈশ্বরে পর্য্যবসিত। নিও-হেগেলিয়ান সম্প্রদায় বলেন, পরিণামশীল প্রকৃতির মধ্যে যে বিবর্ত্তন, তাহা সেই বিশ্ব সত্তারই ক্রম-বিকাশ। এবং সেই বিশ্বসত্তা মানবাত্মায় এক চরম অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিণতি লাভ করে ; সকল ভূতের চিৎশক্তি তাঁহার আশ্রয়স্থল। সেই চিৎশক্তির পূর্ণবিকাশ মানবের আত্মার চরম অভিব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

God is a Being with whom the human spirit is identical, in the sense that He is all which the human spirit is capable of becoming.

(Green's Prolegomena)

মানবাত্মার চরম অভিব্যক্তি যে ভগবান্, এরূপ তত্ত্বের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য আপাত দৃষ্টিতে অতি নিকট বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু যতক্ষণ আত্মা কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারা না যায়, ততক্ষণ এরূপ তত্ত্বে আমাদের তৃপ্তি হয় না। আত্মা যে এই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অভিনব বস্তু ; ইহা যে ভৌতিক উপাদানের দ্বারা বিরচিত হইতে পারে না, এ তত্ত্বটি যেমন এদেশের মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন, তেমন আর কোনও দেশেই নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা হয়ত বলিবেন যে, আদিম বর্ব্বর জাতিদিগের animism হইতে আত্মা নামক পৃথক সত্তার কল্পনা আমাদের দর্শনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐটুকু বুঝিলেই আত্মতত্ত্বের কিছুই বুঝা হইল না। আত্মা কি ? আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা বলিব, মনকে আত্মা বলিব, না চিৎশক্তিকে আত্মা বলিব ?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ (গীতা)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা প্রকাশশীল বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; নিশ্চয়াত্মিকা বলিয়া বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ; এবং বুদ্ধিরও উপরে যিনি সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তিনিই আত্মা। এই আত্মাই অন্বেষ্টব্য। এই আত্মাই মোক্ষধর্ম্মশীল। এই আত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। এই আত্মার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে—

প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময় আত্মা।

এই আত্মাই "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

উপনিষদের যুগ হইতে এই তত্ত্ব ভারতবর্ষে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের Cultural individuality বা শিক্ষাসাধনাগত বৈশিষ্ট্য যদি কোথায়ও থাকে, তবে তাহা এইখানে। আমি বস্তুতন্ত্রতাকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না; ইয়ুরোপ বস্তুতন্ত্রের সাধনায় অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে; আরও নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমকিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিজ্ঞানের সাধনাকে অবহেলা করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে, দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইবে, পরমার্থ-চিন্তনেও সুতরাং ব্যাঘাত পড়িবে। আমাদের শাস্ত্রেও বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

কঠোর কর্ম্ম সাধন করিয়াও বল সঞ্চয় করিতে হইবে।

কর্ম্মণা যেন কেনাপি মৃদুনা দারুণেন বা
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ।

এরিষ্টটল্‌ও বলিয়াছেন যে পূর্ণ মানবত্ব লাভ করিতে হইলে অভাব দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হওয়া চাই।

কেহ কেহ মনে করেন আমাদের শাস্ত্রের আত্মতত্ত্ব ও মোক্ষবাদ দর্শনালোচনার স্রোত নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই সকল তত্ত্বের ফলে আমরা এমন একটি সীমানায় উপনীত হইয়াছি যে, আর আমাদের পক্ষে নূতন কোনও ভাবোন্মেষ হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখবাদ ও অদ্বৈততত্ত্ব জন্মান্তর ও কর্ম্মফল আমাদের মনে কেবল অবসাদ আনিয়া দিয়াছে, জাড্য জন্মাইয়াছে, আমাদের জাতীয় উদ্বোধন দূরে অপসারিত করিয়াছে। একথা যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা ভারতবর্ষের দর্শন-চর্চ্চার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দুঃখবাদ সত্ত্বেও যে দার্শনিক মতবাদের অপ্রাচুর্য্য ঘটে নাই, তাহা নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইতে জানিতে পারা যায়।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ আমাদের জীবনে বর্ত্তমানে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু একসময়ে তাহারই পার্শ্বে, সাংখ্য ও যোগ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দাবী করিত। ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, বেদান্ত বলিতেছেন,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; সাংখ্য বলিতেছেন ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই; বৈশেষিক দর্শনেও ঈশ্বর-প্রসঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্‌। এই সূত্রে তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে, কিন্তু 'ধর্ম্ম' হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরতত্ত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন প্রমাণাভাবে। পাতঞ্জল দর্শনকে সময়ে সময়ে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। কিন্তু একসময়ে যোগদর্শন ঈশ্বরকে তেমন আমল দেন নাই, একথাও কেহ কেহ বলেন। আমরা যে যোগসূত্র জানি তাহাতে ঈশ্বরবাদ অবশ্য সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, সমস্ত যোগদর্শনের সঙ্গে উহার ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ খুব বেশী নহে। ইহার জন্যই হয়ত ঐ ধারণা লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতে যোগদর্শন সেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত এক তত্ত্ব যোগদর্শনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরবাদ যোগদর্শনের ষড়বিংশ তত্ত্ব। যাহা হউক, সাংখ্য এবং যোগদর্শনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যাই আবহমান কাল ভারতের চিন্তার ধারাকে আকৃষ্ট করে নাই।

বৌদ্ধমতও এদেশের একটি অতি প্রাচীন মত। ইহার মূল উপনিষদে মিলিলেও ইহা নিশ্চিত যে, বৌদ্ধেরা হিন্দুদর্শনের অচলায়তন ভেদ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পন্থা আপনাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং যাগযজ্ঞের ফলদায়কত্ব অস্বীকার করিয়াও বৌদ্ধ মত যে ভারতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পরে মহাযানী বৌদ্ধেরা হিন্দু ধর্ম্মমত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধমতকে হিন্দুদিগের নিকট উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই হইতেই নাস্তিক দর্শনের স্রষ্টা ঈশ্বরবাদের বিরোধী তথাগত বুদ্ধ হিন্দুদিগের দশাবতারের মধ্যে স্থান পাইলেন। হিন্দু সমাজ, হিন্দুধর্ম্ম এবং সমস্ত দার্শনিক মতবাদ আর একবার ওলটপালট হইয়া গেল।

অনেকে মনে করেন যে, বেদান্তের মায়াবাদ বৌদ্ধ দর্শন হইতে আসিয়াছে এবং সাংখ্যমতও বৌদ্ধমত হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। অতি দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র সমূহের ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং সাংখ্য হইতে বৌদ্ধমত অথবা বৌদ্ধ হইতে সাংখ্যমত আসিয়াছে, এ সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভবপর নহে। এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, সাংখ্য ও বৌদ্ধদের মধ্যে সাদৃশ্য খুব বেশী। সাংখ্যের সংস্কার এবং সংস্কার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ বৌদ্ধদর্শনেও আছে। সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ এবং বৌদ্ধদিগের ক্ষণিক বাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। সাংখ্য এবং বৌদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী এবং নির্ব্বাণের পথিক। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ ধ্বংসবাদ নহে। উভয় মতবাদের মধ্যে এই সকল বিষয়ে সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈষম্যও অনেক। সাংখ্যের পুরুষবাদের চিহ্ন বৌদ্ধ মতে পাওয়া যায় না। সাংখ্য ত্রিগুণতত্ত্বেরও কোনও নিদর্শন বৌদ্ধ মতে নাই।

এই সকল দর্শনের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, চিন্তার রাজ্যে ভারতীয়দিগের গতানুগতিকতার অপবাদ স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে কালোপযোগী দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

দর্শনে সমন্বয়-প্রবৃত্তি

আধুনিক সময়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। সমন্বয়ের যুগ দর্শনের ইতিহাসে নিষ্ফল যুগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। অনেকে মনে করেন, ভারতের নানা দার্শনিক মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্থির যে, সত্য এক; ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সেই সত্যকে জানিবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী বলিলে অন্যায় হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সত্যসাধনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরমাত্র ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; সত্য-সন্ধানের মূল্য তাহাতে থাকে না। সেই জন্য কেহ কেহ যখন বলেন যে, ন্যায় বৈশেষিকের প্রথম সোপান আরোহণ করিয়া, তার পরে সাংখ্য-যোগের মধ্য দিয়া আমরা মীমাংসার অদ্বয় তত্ত্বে উপনীত হই, তখন আমার মনে হয় যে এইরূপ সিদ্ধান্ত দার্শনিক স্বাধীনতার হানিকর।

এই সকল দর্শনের মধ্যে যে মিল আছে, তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে প্রত্যেক দর্শনের বৈশিষ্ট্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সত্যানুসন্ধানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্তরায় আর কিছুই নহে। যুগ-ধর্ম্মানুসারে, মানব মনের পরিণতি অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-প্রবাহ পৃথিবীর বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। চিন্তাশীলের পক্ষে, সেই প্রবাহের প্রত্যেকটি তরঙ্গের মূল্য আছে। পূর্ব্ব মীমাংসার কর্ম্মকাণ্ডের পরে উত্তর মীমাংসার অদ্বৈত তত্ত্বের আবির্ভাব মানব-মনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বমীমাংসার নিরীশ্বরবাদ উত্তর-মীমাংসার ব্রহ্মবাদে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে যোগ দর্শনের দ্বারা সাংখ্যের এবং ন্যায়ের দ্বারা বৈশেষিকের পাদপূরণ করিয়া লইতে হইবে ; আমার বক্তব্য এই যে, ইহাতে দার্শনিক চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে ইতিহাসের নানা পটপরিবর্ত্তনের মধ্যেও দার্শনিক চিন্তার স্রোত অবাধে বহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন অশোকের সময় মাথা তুলিয়া উঠিল, দিগ্ দিগন্তে যখন তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িতে লাগিল, বাঙ্গালাদেশ তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বাঙ্গালার

রাজা শশাঙ্ক বোধিদ্রুম পর্য্যন্ত পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে পালরাজগণের সময়ে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবনে বঙ্গভূমি ভাসিয়া গেল, তখন নানাস্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর দেবতাকে বোধিসত্ত্বের পার্শ্বে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বঙ্গের অনেক স্থলে এখনও বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। নালন্দাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটবাসী ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পূর্ব্ববঙ্গের লোক। ইনি ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশীল বিহার হইতে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

তান্ত্রিকতার যুগ

বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের নিকট যখন অবাধে ঋণগ্রহণ করিতে লাগিল, তখন নানাধর্ম্মমত ও দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হইল। আমার বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে তান্ত্রিক মত বিস্তার এই সময় হইতে হয়। যদিও প্রবুদ্ধ ভারতের একজন লেখক কর্ত্তৃক তন্ত্রের উৎপত্তি উপনিষৎ ও বৌদ্ধযুগের মধ্যস্থলে কল্পিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তন্ত্রের প্রচার বঙ্গদেশে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের পরেই হইয়াছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন। মহাযান বৌদ্ধেরা দেবদেবীকে নির্ব্বাসন করেন নাই। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের * প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন বুদ্ধশক্তি চণ্ডিকাদেবীর উপাসনা

* মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন বলিয়া এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হইয়াছিল।

অতো ভাবাভাবান্তর্দ্বয়রহিতত্বাৎ সর্ব্বস্বভাবানুৎপত্তিলক্ষণা শূন্যতা মধ্যমা প্রতিপন্মধ্যমো মার্গ ইত্যুচ্যতে (Indian Logic—Dr. S. C. Acharya)

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি।

(বৌদ্ধ গান ও দোহা)

করিতেন। (আদ্যের গম্ভীরা) মাধ্যমিক দল হইতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিকাশ সাধিত হয়। এই সম্প্রদায় "কাল-চক্রযান" "মন্ত্রযান" ও "বজ্রযান" নামেও অভিহিত হয়। তন্ত্রের উপাস্য দেবতা "শক্তি"। এই আদ্যাশক্তি স্ত্রীও নহেন পুরুষও নহেন। এই শক্তি একাধারে বিদ্যা ও অবিদ্যা, পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া। ইহা দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে।

অদ্বৈতং কেচিদ্‌বদন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতাঃ।

(কুলার্ণব তন্ত্র)

বিশ্বের মূল কারণ, বীজ এই দ্বৈতাদ্বৈতরহিত শক্তি। এই শক্তি হইতেই মায়া, ইহা হইতেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই শক্তি ভুবনেশ্বরী-রূপে, জগন্মোহিনীরূপে জগৎ প্রসব করিতেছেন, আবার মহাকালী ভৈরবী রূপে সমস্ত সংহার করিতেছেন। তন্ত্রের মূল তত্ত্ব সংক্ষেপে ইহাই। বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্ত্ব এবং যোগদর্শনের সাধন তত্ত্ব ইহার প্রধান উপজীব্য। অধিকাংশ তন্ত্র শাস্ত্রের সংস্কৃত ভাষা দেখিলে তাহা আধুনিক এবং বাঙ্গালী সাধকের লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই উপলব্ধি হইবে যে, এক্ষণে এরূপ কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায় বঙ্গীয় হিন্দুদিগের মধ্যে নাই, যাহা তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত নহে। (See Arthur Avalon's Introduction to Principles of Tantra)

এ স্থলে সহজিয়া মতের উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য মনে করি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রসাদে মধ্য যুগে নাঢ় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ মতবাদ চলিতেছিল,

তাহা আমরা "বৌদ্ধগান ও দোহা" হইতে জানিতে পারি। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই সহজিয়া সাধন বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা অন্যস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মমত একটি উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে নিহিত। তাহার সহিত সহজিয়াদের মহাসুখবাদের আদৌ মিল নাই। সহজিয়া তান্ত্রিক-বৌদ্ধ মতের একটি অবান্তর ফল। তন্ত্রের পঞ্চ ম-কার সাধন হইতে সহজিয়ারা পঞ্চমটি বিশেষভাবে সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যে এইভাবের তান্ত্রিকতা গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নহে। অনেকস্থলে শক্তিবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মবাদের সুপবিত্র মিলনও দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় রাজা রাম-মোহন রায় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তান্ত্রিকতার শেষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। তিনি ভোগসুখ একেবারে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিতেন। নিজের জীবনেও কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রমণীমাত্রেই তিনি জগন্মাতার প্রতিকৃতি দেখিয়া মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও কোনও ধাতুদ্রব্য তাঁহার গায়ে ঠেকিলে শরীর আপনা আপনি সংকুচিত হইত। তান্ত্রিক শক্তি-আরাধনার সহিত বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব মিলন!

মুসলমান রাজত্বকালে নবদ্বীপ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া উঠে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র এখানে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত।

নব্যন্যায়

বাঙ্গালীর অদ্ভুত কৃতিত্ব নব্যন্যায়ে। কাউয়েল সাহেব বলিতেন, এই সকল তর্কশাস্ত্রের জটিলতায় ইউরোপীয় দিগের মাথা ঝিম ঝিম করে। বাস্তবিক ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা পারিভাষিকতার কত উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, তাহা

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণির তত্ত্বদীধিতি নাম্নী টীকা একজন বাঙ্গালীরই লেখা। দীধিতির রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি "পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি" নবদ্বীপে হরিঘোষের গোয়ালে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাঁর পরেও কয়েকজন অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন দার্শনিক বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। কণাদ তর্কবাগীশ চিন্তামণির একখানি টীকা রচনা করেন, তাহার নাম তত্ত্বটীকা। কণাদ তর্কবাগীশ এই অঞ্চলের লোক ছিলেন। আমাদের জেলার (যশোর) অধিবাসী গঙ্গাধর কবিরাজের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু চিকিৎসা-বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন না; নানাশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া তিনি উপনিষৎ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করেন। ইংরেজ রাজত্বকালের দার্শনিক ইতিহাস যিনি লিখিবেন, তিনি গঙ্গাধর কবিরাজ ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে বাধ্য। রাজা রামমোহন বেদান্তের ভাষ্য বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদান্তসার নামে এক-খানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তুলনা-মূলক ধর্ম্মমতের সমালোচনা মহাত্মা রামমোহনই জগতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি সকল ধর্ম্মের সার সত্যগুলি সংকলন করিয়া উপনিষৎ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা রাজা রামমোহনের অন্যতম কীর্ত্তি।

রঘুনাথ শিরোমণি যে সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গ-

দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। কলিযুগের অধঃপতিত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি হরিনামমাহাত্ম্য প্রচার করেন।

বৈষ্ণব দর্শন

প্রেমের সহিত নাম করিলেই জীবের গতি হয়, এই তত্ত্ব তিনি আপামর সাধারণে বিলাইলেন এবং নাম প্রেমের মালা গাঁথিয়া আচণ্ডালের গলে দোলাইলেন। তাঁহার পরিকরগণ হরিনামের তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাঁদেরই মধ্যে একজন শ্রীমদভিরাম গোস্বামী এই রাধানগরে গোপীনাথের শ্রীপাট স্থাপনা করিয়াছিলেন। অভিরাম-গোপাল ব্রজলীলায় শ্রীদাম সখা ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

অভিরাম মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল শাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী॥

ব্রজভাবে ভাবিত হইয়া তিনি মুরলী-বাদনের ইচ্ছা করিলেন, এবং অন্য কিছু না পাইয়া একগাছি ষোল শাঙ্গের কাষ্ঠকে বাঁশী করিয়া বাজাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধক নির্জ্জনে তাঁহার বাঞ্ছিতকে লইয়া এই নির্জ্জন পল্লীতে অবশিষ্ট জীবন“নাম” করিয়া কাটাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন, তিনিই এই শ্রীপাটের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া এই স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্তও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। নবাব সরকারের চাকুরী ত্যাগ করিয়া তিনি এইস্থানে আসিয়া নাম জপ করিয়া কাটাইতেন। রাম-মোহনের মাতা ফুল ঠাকুরাণী নিজে সম্মার্জ্জনীর দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখিতে হইত, তখন তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেন। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এইরূপ ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয়শিষ্য

শ্রীরূপগোস্বামী এই ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; পরে উহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী কর্ত্তৃক ষট্ সন্দর্ভে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী নামে টীকায় পরিপুষ্টি লাভ করে। ভাগবতের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও পদামৃতসমুদ্রের সংকলয়িতা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিলাম, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এদেশে দার্শনিক চিন্তার ধারা অব্যাহত ভাবে বহিয়া গিয়াছে। এই চিন্তাধারায় আত্মতত্ত্বের নব নব বিকাশ, নব নব অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই আমাদের দেশের জল বায়ু ও প্রকৃতির অনুকূল। ইহা ভারতীয়দিগের বৈশিষ্ট্য। অধুনা দর্শন অপেক্ষা বিজ্ঞানের আদর বেশী। বিজ্ঞান ইহলোকের কল্যাণসাধন করে। অধ্যাত্মতত্ত্ব পরলোকের কল্যাণ লক্ষ্য করে। আজ কাল নগদ মূল্যের আদর বেশী। তাই মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত বলেন যে, অহিংসা—যাহা ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—হিন্দুজাতির রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু। হইতে পারে, আমরা আমাদের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার ফলে কিছু উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সে উদাসীনতা দর্শনের অপরাধ নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য। আমি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত একমত; তিনি বলিয়াছেন যে আমাদের যদি পুনরুত্থান হয়, তবে তাহা এই অধ্যাত্ম-বিদ্যার ফলেই হইবে। অস্ত্রশস্ত্রের প্রচণ্ডতা অপেক্ষা যদি অধ্যাত্ম বলেই জগৎকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা যায়, তাহা হইলে আমাদের এখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু চাই সেই রূপ গুরু, যিনি সমাধিপ্রণত হৃদয়ে পরমার্থচিন্তায় নিবিষ্ট হইবেন এবং সেই মৌন গুরুর পার্শ্বে উপসন্ন শিষ্যেরও সমস্ত সংশয় আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।

ভারতীয় ভাবধারা ও স্বাধীন চিন্তা

আপনারা আমাকে আপনাদের দর্শন-শাখার সভাপতিরূপে মনোনীত করিয়া যে সম্মান প্রদান করিলেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিব কি না, স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনারা হয় ত অনেকে জানেন, আমি আজ কয়েক বৎসর দর্শনের রসাল বনবীথিকা হইতে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছি। আপনাদের আহ্বান পাইয়া আমার প্রিয়বিরহবিধুর হৃদয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘালোকে বিভ্রান্ত-চিত্ত যক্ষেরই ন্যায় আশা ও বেদনায় দোলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আজ যে স্থলে আমরা সমবেত হইয়াছি, তাহার পূত স্মৃতি-বিজড়িত রজোরাশি অঙ্গে মাখিয়া ধন্য হইব, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের যোগ্যতা অযোগ্যতা ভাবিবার সময় পাই নাই। পুণ্যশ্লোক বঙ্কিমচন্দ্র, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গ-সাহিত্য-নন্দনের কল্পবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের আবাসভূমিতে দাঁড়াইয়া দর্শনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, ইহা সামান্য সুকৃতীর কথা নহে। আমি এ গৌরবজনক অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব কি না, তাহা যিনি নিখিল কল্যাণের বিধাতা, একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। তবে মূলাযোড়, ভট্টপল্লী, নৈহাটী, হালিসহরের মধ্য-স্থানে দাঁড়াইয়া কোনও দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করা শুধু আমার কেন, যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে এক অগ্নিপরীক্ষা। এই সকল স্থান এক সময়ে বিদ্যাগৌরবে সমুজ্জ্বল ছিল। এই স্থানকে একটি 'বিদ্বন্মণ্ডল' বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। এখনও ভট্টপল্লী বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের মুকুটমণিরূপে শোভা পাইতেছে।

এরূপ স্থলে আমার ন্যায় ব্যক্তির অনধিকারপ্রবেশজনিত অপরাধ আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মধ্যে আত্মতত্ত্ব বহু বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আত্মার স্বরূপ কি? জগতের সহিত, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি? এই সকল প্রশ্নই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে আলোড়িত, প্রলুব্ধ করিয়াছে। দৃশ্যমান জগতের অনিত্যতা যতই হৃদয়ে ছায়াপাত করিয়াছে, ততই আত্মার দিকে তত্ত্বান্বেষীদিগের সতৃষ্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পরিণামশীল জগতের সত্যতা যত থাক্ না থাক্, আত্মার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় উদিত হইতে পারে না। সমস্ত তত্ত্বপদার্থের মধ্যে আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসংশয় বস্তু। কারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মা যাহাই হউক না কেন, আত্মা যে আমাদের পক্ষে একটি পরম সৎ পদার্থ, সে বিষয়ে কেহ সন্দিহান হইতে পারে না। কারণ, 'সন্দেহ'রূপ চিত্তবৃত্তি আত্মা ব্যতীত অন্যপাত্রে থাকিতে পারে না। আত্মার সম্বন্ধে আমরা যতই সন্দেহ করি, তত নিবিড় হইতে নিবিড়তরভাবে আত্মা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া উঠে। নিজের ছায়াকে যেমন উল্লঙ্ঘন করা যায় না, তেমনি আত্মাকেও সত্যের কোটি হইতে বহিষ্কৃত করা চলে না। তার পর আত্মা আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রিয় হইতে প্রিয়তম, গূঢ়াতিগূঢ় সত্য পদার্থ। আত্মার সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, জয়-পরাজয়, লাভালাভ যেমন আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়, তেমন আর কিছুই নয়। আত্মাই মানবের পরম প্রিয়তম।

ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ কামায় প্রিয়ো ভবতি,
আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবতি।

সেই আত্মাই আমাদের শ্রোতব্য, মন্তব্য ও ধ্যেয়। এই খানেই আমাদের ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে বেশ একটু প্রভেদ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে যে আত্ম-তত্ত্বের অনুশীলন নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে আমাদের দেশে যেমন এই আত্মতত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধানের মূল প্রপাতস্বরূপ, উহাদের দেশে সেরূপ কোনও দিন হয় নাই। আত্মতত্ত্বের এই মূল উৎস হইতে নানাদিকে নানাধারা-প্রবাহ ছুটিয়াছিল। আত্মা যদি মূল জিজ্ঞাস্য হয়, তবে যাহা কিছু আত্মার হিত বা অহিতবিধান করে, তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু আত্মাই মুখ্য প্রয়োজন,অন্য সমস্ত গৌণ। বস্তুতঃ আত্মাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের জ্ঞানের জগৎ গঠিত হয়। কৌতূহল যেখানে বহির্ম্মুখী, সেখানে জ্ঞানের দীপালোক গিয়া পড়ে বাহিরের বস্তুর উপর। বহির্ম্মুখী জিজ্ঞাসা হইতে রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিজ্ঞান জন্মলাভ করে। অন্তর্ম্মুখী জিজ্ঞাসা হইতে আত্মতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, বা তত্ত্ববিদ্যা, চরিত্রনীতি, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়। মানবের জ্ঞানের ইতিহাসে রসায়ন, ভূতত্ত্ব প্রভৃতির স্থান নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পরন্তু আজকাল মানবীয় সভ্যতা যেরূপ দ্রুত বহির্ম্মুখত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, বাহ্য-বস্তুর বিচারই আমাদের জ্ঞান-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে মনীষী মুনিঋষিগণ অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার অনুশীলনেই যত্নশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহা জানিলে সব জানা হয়, কিছুই আর অজানা থাকে না, যাহা জানিলে সমস্ত সংশয় নিরস্ত হয়, যাহা জানিলে সকল রহস্যের সার জন্মমৃত্যু-রহস্যের আঁধার যবনিকা চিরতরে উদ্ঘাটিত হয়, যাহা জানিলে মায়ামোহময় সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

কর—'তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।' ইহাই ভারতীয় সার সত্য'।

ভারতবর্ষেই সম্ভবতঃ আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সর্ব্বপ্রথম প্রতিপাদিত হইয়াছিল। সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ' শুনিয়া আসিতেছি। একই দেহে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষীর বসতি, তাহা আমরা প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। দেহকে আমরা কোনও দিনই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি নাই। সেই ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা দেহাত্মবাদকে আসুরিক মত বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। দেহ জড়প্রকৃতির অন্তর্গত সুতরাং অনিত্য। জড়প্রকৃতি সর্ব্বথা অনিত্য, জীবের জীবন অনিত্য, সংসার অনিত্য—এই অনিত্যতার অপার পারাবারে একমাত্র আত্মাই বটপত্রলীন নারায়ণের ন্যায় ভাসিতেছে। সেই মায়া বা অনিত্যতার সাগর-তরঙ্গে আত্মা দোলা খাইলেও নিমগ্ন হয় না। নশ্বরতার মহাপ্রলয়ে এই আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।

গীতা, ২য় অধ্যায়।

অবয়ব নাই বলিয়া আত্মা অচ্ছেদ্য ও অক্লেদ্য; অমূর্ত্ত বলিয়া অদাহ্য; দ্রবত্বরহিত বলিয়া অশোষ্য; অবিনাশী বলিয়া নিত্য; চিরস্থির বলিয়া স্থাণু। ইহার রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইহা একরূপভাক্, নিজের রূপ কখনও পরিত্যাগ করে না বলিয়া আত্মা অচল। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, এই জন্য আত্মা সনাতন। আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, এই জন্য ইহা অব্যক্ত। ইহা শুধু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর নহে, ইহা মনেরও অগোচর। আত্মাতে

কোনও বিকার বা পরিবর্ত্তন সংঘটন করা যায় না, এই জন্য ইহা অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আত্মা আপনার এই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব যতক্ষণ বুঝিতে না পারে ততক্ষণ ইহার বন্ধন। একবার আত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে আর বন্ধন থাকে না, দুঃখ-শোক থাকে না, জন্মমৃত্যু থাকে না—'তত্র কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ অভেদমনুপশ্যতঃ।' ইহার নাম মোক্ষ। আমাদের প্রায় সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই মোক্ষপর। মোক্ষ, কৈবল্য, নির্ব্বাণ আমাদের নিকট পরম নিঃশ্রেয়ঃ, পরমপুরুষার্থ। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এই জন্য মনে করেন, হিন্দুরা দুখঃবাদী বা pessimist এবং এই পেসিমিজিম হিন্দুদের সর্ব্ব কর্ম্মশক্তিকে ক্ষুণ্ণ, খর্ব্ব করিয়াছে। কিন্তু আমার তাহা মনে হয় না। আমাদের মুক্তি-সাধনা আত্মতত্ত্বেরই নির্গলিত ফল। আত্মাই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে আত্মা-ব্যতিরিক্ত জগতের যাবতীয় বস্তুজাতই অসৎ। সুতরাং এই সদসৎবুদ্ধি যত দিন না হয়, যত দিন আত্মাকে স্বরূপতঃ না জানা যায়, তত দিনই অসতের সংসারে বাস করিতে হয় এবং অসৎসংসর্গের যাহা দোষ—বন্ধন, সেই বন্ধন ঘটে। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলেই, বন্ধন টুটিয়া গেলেই মোক্ষ। সাংখ্যদর্শনে অবশ্য ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ, এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃখবাদ কি পরিমাণে প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যদর্শনের অন্তর্গত, তাহা লইয়া এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রকৃত সাংখ্যমত এই যে, নৃত্যপরা প্রকৃতির রূপ পুরুষের চোখে পড়িলেই আর অভিনয় থাকে না। অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সহজ ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলেই প্রকৃতির খেলা ঘুচিয়া যায়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সাংখ্যের মতেও আমরা দুঃখ হইতে পলায়ন করিবার জন্যই যে মোক্ষ খুঁজি, তাহা নহে।

আত্মার স্বরূপ কি, তাহা জানিতে গিয়াই মোক্ষের অনুসন্ধান আসিয়া পড়ে। কারণ, তত্ত্বতঃ আত্মাকে লাভ করা আর মোক্ষকে প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। কাযেই আমি ইহাকে দুঃখবাদ বলিতে প্রস্তুত নহি।

আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, দুঃখকে বরণ করিতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। সুখের অনুসন্ধানে আমাদের কোনও দিন তেমন তৎপরতা দেখা যায় নাই। পৃথিবীর ধারণায় যাহা সুখের উপাদান, মান যশঃ অর্থ বিত্ত পুত্র কলত্র—ইহা অল্পই হউক আর বেশীই হউক—কোনও দিন আমাদের চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। পুরাণ আমাদিগকে স্বর্গের যে ছবি আঁকিয়া দেখাইয়াছে, তাহা সুখের মানস-সরোবর, ভোগের বিলাস-কানন, আরামের স্বপ্নমণ্ডিত কল্পলোক। সেখানে চিরবসন্ত হইতে উর্ব্বসী, রম্ভা, তিলোত্তমা পর্য্যন্ত কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু ভারতের আত্মা তাহাতে মজে নাই। আমরা জানি, দেবতাদেরও স্বর্গসুখ চিরস্থির নহে। কল্পান্তে হউক আর কোটী কল্পান্তে হউক, স্বর্গ-সুখেরও শেষ আছে। অতএব কায নাই ও স্বর্গ-সুখে। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।' কোথায় সেই ভূমা, কোথায় সেই আনন্দ—যাহা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে! বেদান্ত বলেন, ভূমাই ব্রহ্ম, সেই আনন্দই ব্রহ্ম। সেই আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূতবর্গ জন্মলাভ করিয়াছে, আবার সেই আনন্দেই প্রবেশ করিবে।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। জীব পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন। আত্মা বা পুরুষ বহু। পরমাত্মা এক, অদ্বিতীয়, বিরাট্। মনে হয়—

ভিন্নোঽচিন্ত্যঃ পরমো জীবসঙ্ঘাৎ
পূর্ণঃ পরো জীবসঙ্ঘো হ্যপূর্ণঃ।

যতস্তসৌ নিত্যমুক্তো হ্যয়ং চ
বন্ধান্মোক্ষং তত এবাভিবাঞ্ছেৎ ॥

জীবসমূহ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন এবং অচিন্ত্য। পরমাত্মা পূর্ণ, জীবসমূহ অপূর্ণ। পরমাত্মা নিত্যমুক্ত, আত্মা বন্ধন হইতে মোক্ষের অভিলাষী। কিন্তু তত্ত্বের দিক্ দিয়া এই ভেদবাদ টিকিতে পারে না। কারণ, যাহা মায়াও নহে, ব্রহ্মও নহে, যাহা প্রকৃতিও নহে, চৈতন্যও নহে, এরূপ কোনও সত্তা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং পরমাত্মা ও আত্মা তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সেই জন্য গীতা বলেন—'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।' এই ঈশ্বর বা পরমাত্মা সর্ব্বথা সর্ব্বপদার্থের মধ্যে অনুস্যূত। কোনও একটি মুক্তার মালা যেমন শুধু মুক্তার সমষ্টিমাত্র নহে, তাহাদের মধ্যে একটি সূত্র প্রলম্বিত থাকাতেই যেমন 'মালা' সম্ভব হইয়াছে, এই জাগতিক পদার্থের মধ্যে সেইরূপ একটি সূত্র থাকাতেই ইহা সংসাররূপ বিচিত্র অথচ সমঞ্জসীভূত বিশ্বে (Universe) পরিণত হইয়াছে।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

তিনি সকলের অন্তরাত্মা। তিনি সকলের সাক্ষিভূত। তিনি

মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ।

উপাধি, অবিদ্যা, মায়া তিরোহিত হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়।

ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ—গীতা
ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডকোপনিষৎ
তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা—বিষ্ণুপুরাণ

ইহাই তত্ত্ববিদ্যার মীমাংসা। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা অবিদ্যার ফলে। 'পরিচ্ছেদ' 'প্রতিবিম্ব' বা 'আভাসের' জন্য জীবাত্মা পরমাত্মা

হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত যথা—সূচীরন্ধ্র দিয়া আকাশ দেখিলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশ দেখা যায়। জীবাত্মা সেইরূপ সার সত্যের কণিকামাত্র। প্রতিবিম্বের উদাহরণ যথা,—বালুকা-কণায় সূর্য্যতেজ প্রতিফলিত হইলে যেমন সেই বালুকাই খণ্ড-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখায়। এইরূপ প্রতিবিম্বযোগে অন্য বস্তুতে যে চাক্‌চিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা আভাসের দৃষ্টান্ত। পরিচ্ছেদই হউক, প্রতিবিম্বই হউক, আর আভাসই হউক, আমরা দেখিতেছি যে, পৃথিবীতে এক চৈতন্যস্বরূপ বস্তুসত্তা আছে—তাহাই আত্মা। অবস্থাবিশেষে ইহা খণ্ড খণ্ড চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয় ; সেই খণ্ড-চৈতন্যই জীবাত্মা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তত্ত্ব হিসাবে এই যে মতবাদ, ইহার স্থান অতি ঊর্দ্ধে। গ্রীক্ ও আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে ইহার অল্পাধিক পরিচয় মিলিলেও, ভারতবর্ষীয় দর্শনে এই আত্মতত্ত্ব যেরূপে উপদিষ্ট বা আলোচিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোনও জাতির চিন্তাধারায় আমরা পাই না।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী যখন অধ্যাত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া এক অপ্রতিহত চৈতন্য, অদ্বিতীয় সত্য উপলব্ধি করিল, তখন ধর্ম্মতত্ত্ব সেই সত্যকে আত্মসাৎ করিয়া লইল। তত্ত্ববিদ্যা যেখানে এক ধ্যানগম্য পরতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল, ধর্ম্মতত্ত্ব সেখানে সেই পরতত্ত্বকে উপাসনা ও আরাধনার বিষয় করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য যে, তত্ত্ববিদ্যা ঔপপত্তিক ভাবে যাহা গ্রহণ করিল, তাহার সহিত সাধ্যসাধনের কোনও সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব চাহে আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটাইতে। ইহাতে আত্মা উপকৃত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা অণু হইতে পারে, পরমাণু হইতে পারে, বাষ্প হইতে পারে, চেতন হইতে পারে, অচেতন প্রধান হইতেও

ক্ষতি নাই। তাহার সঙ্গে আত্মা যে একটি নিবিড় পরম ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ পাতাইবে, এমন কোনও কথা নাই। পরকালের সুবিধা বা অসুবিধার কোনও কথাই চরম সত্য পদার্থের প্রসঙ্গে উঠিতে পারে না। আমাদের আদর্শ চরিত্রনীতি স্থির করিয়া দেয়, অথবা আমাদের পক্ষে বিধি-নিষেধ স্থির করিয়া দেয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র। তত্ত্ববিদ্যা কেবল নিখিল বিশ্বের একমাত্র বস্তুসত্তা বা চরম সত্য পদার্থ কি, তাহা জানাইয়া দেয়। সুতরাং চরিত্রনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র বা তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্র বিভিন্ন হইলে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা এই :—দর্শনশাস্ত্র বলিয়া দিল, 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।' আমরা ধর্ম্মতন্ত্রের ভাষায় প্রণব জুড়িয়া বলিলাম, 'ওঁ তৎসৎ।' আমরা বলিলাম, তিনি আমাদের বুদ্ধির প্রয়োজক,—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—তিনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী দেবাদিদেবতা, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। দর্শনশাস্ত্র বলিল, সৎপদার্থ উপাধি-বিরহিত, মন বা বাক্য তাহাকে ধরিতে পারে না। আমরা বলিলাম, 'নির্ব্বিকল্পং নিরাকারং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।' আমরা তাহাকে প্রণাম করি। দর্শনশাস্ত্র বলিল, প্রকৃতির ঊর্দ্ধে চৈতন্যময় পুরুষ বর্ত্তমান। পুরাণ-কাব্যে সেই পুরুষ-প্রকৃতির লীলাকে পরম মধুর যুগল উজ্জ্বল রসে পাক করিয়া পরিবেষণ করিল। তত্ত্ববিদ্যার দিক্ দিয়া আত্মা পরম প্রেষ্ঠ, আত্মা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু জগতে কি আছে? পুরাণ বলিল, ঠিক। 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। তিনি আত্মারও আত্মা। কাব্যের ভাষায় আরও ভাল করিয়া বলা হইল :—

"অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমারি কেবলি তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥"

এই যে ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত পরাবিদ্যার যোগ, ইহাকে আমি নিন্দা করিতেছি না। ইহা যে অস্বাভাবিক, তাহাও নহে। পরাবিদ্যা যেখানে অন্ধকারের পরপারে জ্যোতিঃস্বরূপ এক অনির্ব্বচনীয় সত্যের সাক্ষাৎ পায়, সেখানে ধর্ম্মতত্ত্ব সেই সত্য ও আত্মার মধ্যে যে এক অবিচ্ছেদ্য স্নেহসূত্র রচনা করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? আমাদের ব্রহ্ম শুধু তত্ত্ব-বিদ্যার শেষ মীমাংসা নহে, ব্রহ্ম আমাদের উপাস্য, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ, সংসার সাগরে কাণ্ডারী, আমাদের প্রিয়াদপি প্রিয় পরম দেবতা। সৎ, চিৎ, আনন্দ যেখানে মূল সত্তার উপাদান, সেখানে সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ মুরলীধর পিঞ্ছমৌলি ঠাকুর আমাদের নিত্য পূজার বিষয়।

জগতের অন্যান্য ধর্ম্মমতগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবেন যে, অন্য কোথাও দেবতা ও সার সত্যে, ধ্যান ও অর্চ্চনায় এরূপ একাত্মভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। প্লেটোর Ideaকে কেহ পূজা করে নাই, স্পিনোজার Infiniteকে বা হেগেলের Absoluteকে কেহ আরাধ্য দেবতা করিয়া তুলে নাই। এই সকল তত্ত্বকে ভগবানের সঙ্গে গাঁথিয়া দিলেও জগতের কোনও ধর্ম্মমত (Religion) তাহা নত-মস্তকে গ্রহণ করে নাই; আমাদের দেশে তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রে ডুবিয়া গেল। ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাদানুবাদের অবসর তেমন নাই। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বাগ্‌বিতণ্ডা যতই থাক, সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবৈষম্যের অবকাশ অত্যন্ত অল্প। ধর্ম্মমত সহজে সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয়। স্বাধীন চিন্তা তাহাতে ব্যাহত না হইয়া পারে না। কোনও সম্প্রদায় বলিল ব্রহ্ম; কোনও সম্প্রদায় বলিল আত্মা। কেহ মাঝখান হইতে বলিয়া দিলেন, ঐ একই তত্ত্ব, ভেদ কিছুই নাই। 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি

শব্দ্যতে।' এইরূপ সমন্বয়-চেষ্টায় স্বাধীন চিন্তাকে আরও ব্যাহত সীমাবদ্ধ করিয়া তুলে। আমার বক্তব্য এই যে, ভারতীয় স্বাধীন চিন্তার ধারা ধর্ম্মমতের সহিত মিশিয়া গিয়া যেন বালুকারাশির মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয় দর্শনেও সময়ে সময়ে এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতির যুগ আসিয়াছিল। ধর্ম্মমতের প্রাবল্যে দর্শনের অমল, শুভ্র ধারাটি হারাইয়া গিয়াছিল। আমাদেরও সেইরূপ একটি নিষ্প্রভতার যুগ আসিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মমত লইয়া যতই গর্ব্ব করি না কেন, যতই তাহার দার্শনিক ভিত্তি থাক না কেন, ধর্ম্মমত দর্শন নহে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় চিন্তা, পারলৌকিক চিন্তা আর নিঃস্বার্থ দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন। আমাদের দার্শনিক চিন্তা-ধারাকে পুনরায় জীবন্ত উৎসে পরিণত করিতে হইলে, ধর্ম্মমতের সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। অন্যথা নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য চেষ্টা হইবে কেন? কৌতূহল জাগ্রত হইবে কেন? শ্মশানে বসিয়া শক্তির আরাধনা করিয়া সাধক কৈবল্য লাভ করিতে পারেন বটে; কিন্তু বিজ্ঞান প্রত্যেক পরমাণুকে শক্তির কেন্দ্ররূপে গণনা করিয়া তবেই ত নূতন নূতন রহস্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন।

ভারতের দার্শনিক চিন্তা যে বর্ত্তমানে অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে আশা করি, মতভেদ হইবে না। ব্যাধির সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, তবে আমি তাহার যে কারণ অথবা প্রতীকারের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানে যাঁহারা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই চারি জন ভারতীয়ের নামও করা যাইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক জগতে আমরা বহুদিন যাবৎ কিছুই দিতে পারি নাই। এখনও পাশ্চাত্য জগতে ফুইলে, বার্গসন, ক্রোচে, অয়কেন, বার্টর্যাণ্ড রাসেল,

আইন-ষ্টাইন প্রভৃতির নাম সকলেরই পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অধ্যাত্মবিদ্যার জন্মভূমি ভারতবর্ষ আজ তন্দ্রাগত। অথচ পাণ্ডিত্যের যে কিছু অভাব আছে, তাহা ত বোধ হয় না। আমাদের মধ্যে এখনও অনেক মনস্বী, প্রতিভাবান কবি ও বিদ্বজ্জন আছেন। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার ফল উল্লেখ করিবার মত আমরা কিছুই পাই না। ইহার কারণ কি?

আমাদের যে মৌলিক চিন্তাশীলতার অভাব ঘটিয়াছে, তাহার আর একটি কারণ—আমাদের শিক্ষাপ্রণালী। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দার্শনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা হয় সংস্কৃতে না হয় ইংরাজীতে চিন্তা করেন। যাঁহারা হিন্দু ষড়্দর্শন অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা সকলেই যে সে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। কিন্তু ঐসকল দর্শনশাস্ত্রে যে শেষ কথা বলা হইয়াছে, আর কিছুই বলিবার, বুঝিবার বা জানিবার নাই, এরূপ যাঁহারা ভাবেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় বেশী নহে। শাঙ্করভাষ্য প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে পারে, কিন্তু শাঙ্কর মত যে সকলেরই গ্রহণীয়, এ কথা মনে করিবার হেতু নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বহু দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সে সময়ে লোকের মনের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয় নাই; মৌলিক চিন্তার অভাব ঘটে নাই। মাধবাচার্য্যের সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহে অন্ততঃ ষোলটি দার্শনিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়—বেদান্তকে বাদ দিয়া। তাহার পরেও অনেক দার্শনিক মতের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আমাদের মধ্যে নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কোনও কালে চলিত ভাষা ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু চলিত ভাষা না হইলেও ইহা দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর ভাষা যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে ফল এই হইত যে আলোচনা,

বিচার, অনুশীলনের অনেক সুবিধা হইত। এক্ষণে সে সুবিধার একান্ত অভাব। দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠন একান্ত পরিমিত। কয় জনেই বা পড়েন, আর কয় জনেই বা আলোচনা করেন? নবদ্বীপের অবস্থা সে দিন দেখিয়া আসিয়াছি। যে নবদ্বীপ টোলের ছাত্র-দিগের বাদ-বিতণ্ডায় এক সময়ে কোলাহলময় ছিল, এখন সেখানে দুই চারি দশটি মাত্র ছাত্র দেখা যায়। টোলের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে, পণ্ডিতও বিরল। এইরূপ সর্ব্বত্র। সুতরাং আলোচনার অভাবে, প্রয়োগের অভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যাহারা ইংরাজীতে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি, তাহারা বিদেশীয় ভাষার পেষণে মৌলিকতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। স্বাধীন চিন্তা, মৌলিকতা, নবতথ্যাবিষ্কারিণী প্রতিভা মনের স্বাভাবিক সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। মাতৃভাষার সাহায্যে যেমন বস্তুজ্ঞান হয়, বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয়লাভ হয়, ভিন্ন ভাষায় তাহা হয় না। জানি না, সংস্কৃতভাষা তাহার পুরাতন বিভব ফিরিয়া পাইবে কি না। সে সৌভাগ্য যে আর হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যদি সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমেয়। যদি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষার পুনরভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হয়, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষার আশ্রয় অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে মাতৃভাষায়ই মৌলিক চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। আমরা ইংরাজীর সাহায্যে শুধু দৈনন্দিন ব্যাপার নির্ব্বাহ নহে, আমাদের যত রকম জ্ঞানানুশীলন আছে, তাহাও এই বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা স্বাভাবিক নহে। ইহা কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। সংস্কৃত

ভাষা ঠিক এই হিসাবে আমাদের পক্ষে অপরিচিত না হইলেও ইহা ধ্রুব সত্য যে, মাতৃভাষায় আমরা যে সকল স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ভাববিকাশের সুযোগ পাই, অন্য কোনও ভাষায় সেরূপ হইতে পারে না। আমি জানি, ইহাতে সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন। তাঁহারা জানেন—এবং আমরাও স্বীকার করি যে, সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষার জননী এবং সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনেতিহাসের আলোচনায় আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, ইহা আর আমাদের পক্ষে অপরিচিত বা নূতন ভাষা বলা চলে না। ইংরাজীর মোহে যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহাদেরও যুক্তি ঐ একই। কিন্তু আমার মত আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। সংস্কৃত ভাষা বঙ্গভাষার যতই নিকট-আত্মীয়া হউক, আমাদের মাতৃভাষার তুলনায় তাহা যে একটু দূরসম্পর্কীয়া, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই জন্যই ইচ্ছা হয়, কবে সংস্কৃত ও বিশ্বের সমস্ত চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করিয়া আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা রাজরাজেশ্বরীরূপে জগতের সভায় বিরাজ করিবে! আমি আশা করি, তখন হয় ত জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে আমরা বহু মণিমুক্তা উপহার প্রদান করিতে সমর্থ হইব।*

* ১৩৩৮ সালের বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলনে দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

বিরোধ ও সামঞ্জস্য*

আলো ও ছায়ার ন্যায়, বাক্য ও অর্থের ন্যায়, তাল ও লয়ের ন্যায়, সামঞ্জস্য ও বিরোধ যে নিখিল বিশ্বে এক অপরিহার্য্য দ্বন্দ্বের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এই কথাটি আমরা সব সময়ে ঠিক বুঝিতে পারি না। সময়ে সময়ে যখন মনের ঝোঁকটি সামঞ্জস্যের দিকে থাকে, তখন মনে হয়, জগতের সমস্ত বস্তু পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া কেমন তালে তালে নাচিয়া চলিয়াছে। যেন চতুর্দ্দিকে এক বিশাল অপ্রমেয় সাম্য-শান্তি-মধুরতার সুধাধারা বহিয়া যাইতেছে; কোথায়ও একটু বাধা নাই, ব্যতিক্রম নাই, অসামঞ্জস্য নাই, সবই সরল, সুজ্ঞেয়, পূর্ণ—যেন গ্রহপুঞ্জের সঙ্গীত হইতে ঝিল্লীর তান পর্য্যন্ত সকলই এক বিরাট্ একতানে (কোরসে) মিশিয়াছে।

আর যখন বিরোধের দিকটা আমাদের মনে প্রবল ভাবে আঘাত করে, তখন নিয়ম, সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা সকলই বিচ্ছিন্ন, ব্যাহত, অর্থহীন বলিয়া প্রতীত হয়। মনে হয়, সমুদ্রবক্ষ হইতে দূর তট-ভাগের যে বনরাজি যত্নে সাজানো একটি উদ্যানের মত প্রতিভাত হইতেছিল, বস্তুতঃ তাহা বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ-নিচয়ের সমবস্থান মাত্র। দূর হইতে প্রথম দৃষ্টিতে যাহা শ্রেণীবদ্ধ, সুসজ্জিত ও পরস্পর গ্রথিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পরে তাহা অসংযত, উপেক্ষিত ও বিচ্ছিন্ন মনে হয়। যখন মৃত্যুর নির্ম্মম স্পর্শে শিশুর জীবন-কোরক ঝরিয়া পড়ে, জলপ্লাবনে যখন শতসহস্র নরনারী গৃহ-পরিজনশূন্য হয়, ভূকম্পে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, সহস্র সহস্র

---

* কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

জীবন অকালে প্রকৃতির করাল গহ্বরে বিলীন হইয়া যায়, বর্ব্বরতার পাশব শক্তিতে দীর্ঘকাল সঞ্চিত সভ্যতার গৌরব অভিভূত হইয়া পড়ে, সত্যের আলোক অসত্যের প্রশ্বাসে স্তিমিত হইয়া যায়, তখন আমাদের মন অন্ধকারে রোরুদ্যমান শিশুর মত বিরোধে সংশয়ে আকুল হইয়া উঠে না কি ?

এ স্থলে বিরোধ ও সামঞ্জস্য শব্দ দুইটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটু আভাস দেওয়া বোধ হয় কর্ত্তব্য। ইহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গেলে প্রথমেই এমন সকল বিরোধ উপস্থিত হইবে, যাহার সামঞ্জস্য করা নিতান্ত সহজ-সাধ্য নহে। তর্কশাস্ত্র বিরোধকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। মর ও অমর, ভাব ও অভাব, সত্য ও অসত্য প্রভৃতি বৈপরীত্য-বোধক শব্দকে ইহাঁরা বিরোধের তালিকায় ফেলিতে চাহেন। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার বিরোধকেও তর্কশাস্ত্র মানিয়া থাকেন, যথা আলোক ও অন্ধকার, মিলন ও বিরহ, শ্বেত ও কৃষ্ণ ইত্যাদি। কিন্তু এ শ্রেণীর বিরোধ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিরোধকেই তাঁহারা অধিকতর স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন—

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তর-স্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানাম্ উক্তিমাত্র বিরোধতঃ॥

ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি

দুইটি বস্তু যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তবে হয় তাহার একটি না হয় অপরটি হইবেই হইবে। উভয়ের অতিরিক্ত কিছু হইতে পারে না। যাহাদের বিরোধ উক্তিমাত্রই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের কখনও ঐক্য বা সামঞ্জস্য সম্ভবে না। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে ইহাকে Law of Excluded Middle বলে। আমরা ইহাকে 'অপ্রকারান্তর-স্থিতি' নিয়ম বলিতে পারি। একই সময়ে একই অংশে বা দেশে কোনও দ্রব্য বিরুদ্ধ ধর্ম্মাত্মক অর্থাৎ নীল

এবং অ-নীল হইতে পারে না। দেশকালের কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ইহা যে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের একটি অব্যভিচরিত মৌলিক সত্য, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু তর্কের রাজ্যে ইহার যাথার্থ্য অবিসংবাদী হইলেও অন্যক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। সমস্ত বিশ্বকে যদি এমন দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় যে, তাহারা পরস্পর বিরোধী, যেমন চেতন ও জড়, ভাব ও অভাব ইত্যাদি, তাহা হইলে আমরা তর্ক শাস্ত্রের সংকীর্ণ গণ্ডী ছড়াইয়া দেখিতে পাই যে, তাহাদের বিরোধের মধ্যে কেমন একটি সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ভাব ও অভাবের বিরোধ তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে এবং সে দিক দিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে,

নাসতো বিদ্যতেঽভাবঃ নাভাবো বিদ্যতেঽসতঃ।

কিন্তু বস্তুতত্ত্বের আলোচনায় এ বিরোধ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, ভাব ও অভাবের, সৎ ও অসতের, Being and Non-being এর সংমিশ্রণেই সমস্ত পরিণাম, সমস্ত অভিব্যক্তির উদ্ভব হয়। এইরূপ চেতন ও অচেতন পরস্পর বিরোধী হইলেও সমস্ত বিশ্বে এই দুইয়ের মিলনই দেখিতে পাওয়া যায়। একজন দার্শনিক অচেতনকে একেবারে বাদ দিয়া চেতন ও জড়ের বিরোধকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফল এই হইল যে তিনি ইতর জীব ও উদ্ভিদাদির কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না।* ইহারা চেতন ও অচেতনের বিরোধকে আরও পরিপূর্ণ, আরও যথার্থ সামঞ্জস্য দান করিয়াছে।

এইজন্য বলিতেছিলাম যে তর্কশাস্ত্রের বাহিরে বিরোধের এই সংকীর্ণ অর্থকে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এস্থলে

* Bishop Berkeley

বিরোধকে আরও ব্যাপক অর্থে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে দ্বন্দ্ব, যেখানে প্রভেদ, যেখানে বৈপরীত্য সেইখানেই বিরোধ। বস্তুতঃ জগৎ সংসারে এই বিরোধ ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া ও প্রভাব অতীব বিস্ময়কর। যুষ্মদস্মদের বিরোধ, সুখ দুঃখের বিরোধ, ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ, জীব ও ব্রহ্মের বিরোধ, আদর্শ ও অনুষ্ঠানের বিরোধ, এইরূপ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ বিরোধ ও তাহার সামঞ্জস্য লইয়া জগৎ সংসার রচিত হইয়াছে। আমরা সহজ দৃষ্টিতে যেখানে সামঞ্জস্যই দেখিতে পাই, একটু অবহিত হইয়া দেখিলে তাহারই অভ্যন্তরে বিরোধের অন্তঃস্রোত দেখিতে পাইব। আবার যেখানে আপাততঃ বিরোধের ভাবটি সবলে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহারই প্রচ্ছন্নভূমি সামঞ্জস্যের দ্বারা রচিত।

এই যে আলো ও আঁধারে ঘেরা জগৎ, ইহাকে বুঝিবার জন্য মানবের আত্মা সেই স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যাকুল ভাবে ফিরিতেছে। কিন্তু এখানেও সেই আলো ও আঁধার, সেই সামঞ্জস্য ও বিরোধ। মানব জগৎকে বুঝিবার চেষ্টা করে, বুঝিতে পারে বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, গৌরব করে, এবং আরও বুঝিতে পারিবে বলিয়া আশা করে। কত যুগ হইতে যুগান্তরে এই আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া মানবের ইতিহাসকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। মানবের বুদ্ধি স্বর্গে, মর্ত্তে, ভূগর্ভে, এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা গ্রহগণকে এক নিয়মের সূত্রে বাঁধিয়াছি; উদ্ভিদ্, জীব ও মানবকে এক জাতিত্বে গাঁথিয়াছি। আমরা তাড়িতকে তাপের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়াছি। ধূমকেতুকে পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া চলিতে বাধ্য করিয়াছি,—এমন এবং আঁরও অনেক কৃতিত্ব আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি দাবী করিতে পারে। মানবের বুদ্ধি দর্পিত চরণে চলিয়াছে, আর বিশ্বসংসার যেন তাহার নিকট মাথা নত করিয়াছে। ক্রুদ্ধ

শিশু যেমন তাহার খেলনাগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, প্রকৃতি তাহার অসংখ্য দ্রব্যজাত তেমনই ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে; মানবের বুদ্ধি জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্য-রাশির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়াছে। এই সামঞ্জস্যকেই প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature) বলে। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠাই সব নহে। ইহার ঊর্দ্ধে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে, সর্ব্বত্র বিরোধ বিরাজ করিতেছে। আমাদের বুদ্ধির দৌড় আর কত দূর? বুঝিতে গেলে আর কিছুই বুঝা যায় না। যেখানে বুঝি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে যাই, সেই খানেই দেখি কিছুই বুঝি নাই। সক্রেটিস তাঁহার সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, কেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি কিছুই বুঝেন নাই। জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যের অন্তরালে যে বিরোধের কঠোর ভ্রূকুটী রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্বভাবতঃ নিরাশায় মন পূর্ণ হইয়া উঠে।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

যিনি জানেন না, তিনিই জানেন আর যিনি জানেন, তিনি জানেন না। যিনি জানেন, তাঁহার অজ্ঞাত; আর যিনি জানেন না, তাঁহারই জ্ঞাত।

এ কথাটি ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত হইলেও, জ্ঞানের যে মৌলিক বিরোধাত্মক ধর্ম্ম, তাহাই বিশেষ ভাবে বিবৃত করিতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সান্ত, সবিকল্প; কাজেই পদে পদে এইরূপ বিরোধ বিভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে এবং ঘটিবে। কথাটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই যে জ্ঞানের মধ্যে একটি বিরোধের ভাব সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কি বাস্তবিকই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ

অথবা জ্ঞানেরই একটি প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। বিষয় ও বিষয়ীর (Subject and Object) ভেদ, আত্মা ও আত্মাতিরিক্তের বৈষম্য, বিদ্যা ও অবিদ্যার বিরোধ, পারমার্থিক সত্য ও নামরূপ-ব্যাকৃত জগৎপ্রপঞ্চের স্বাতন্ত্র্য,—এ সকলই জ্ঞানের স্বভাবগত ধর্ম্ম বলিয়াই ত আমরা জানি। এ সকল বৈলক্ষণ্য যেখানে নাই, সেখানে জ্ঞানের কোনও সত্তা আছে কি না, তাহা অন্ততঃ আমাদের বুদ্ধির গোচর নহে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, এ সবিকল্প জ্ঞানের কথা হইতেছে। সবিকল্প জ্ঞানে বিরোধ-বৈলক্ষণ্যেরই প্রাধান্য। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানে এবিরোধ এক শান্তি-সমুজ্জ্বল সামঞ্জস্যে পরিণত হয়। তখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ থাকে না, তুমি-আমির বিসংবাদ থাকে না, তখন যুক্তি তর্ক পর্য্যবসিত হইয়া গিয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রত্যক্ষেরই ন্যায় সুগম ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই যে অলৌকিক জ্ঞান, ইহার উদাহরণ স্থল—ঋষিগণ ও ব্রহ্ম স্বয়ং। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্রহ্ম-জ্ঞানের নিকট স্বচ্ছ, পরিস্ফুট ও সুসমঞ্জস বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ জ্ঞানের ধারণা আমরা করিতে পারি কি? আমাদের অস্পষ্ট ধারণাগুলিকে আশার বহুবর্ণে চিত্রিত করিয়া মনোমুগ্ধকর করিয়া তুলিতে পারা যায় বটে। কিন্তু তাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্বের স্বভাবতঃ জটিল বিষয়গুলি আরও জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই যে একটি সত্যকে উপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা নহে। একদিকে যেমন সতর্কতাটি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়, অপরদিকে তেমনই ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যাহা কিছু আমরা ধারণা করিতে পারি না, তাহাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে হইবে। ঋষিগণের জ্ঞান বা ঈশ্বরের

জ্ঞান বিষয়-বিষয়ী-ভেদ-শূন্য কি না, এ প্রশ্ন তুলিবার অধিকার আমাদের নাই বলিয়া আমি মনে করি। কারণ নিজের ছায়াকে কেহ যেমন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ বিষয়-বিষয়ীর ভেদকে বিষয় না করিয়া জ্ঞান হইতেই পারে না।

আমাদের এইরূপ ধারণা হয়ত অবিদ্যার কার্য্য, মায়ার খেলা, সীমাবদ্ধ জ্ঞানের স্বধর্ম্ম। হইতে পারে; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে আমাদের জ্ঞান যদি মায়ার দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ মায়া যদি আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ গড়িয়া দিয়া থাকে, তবে সেই মায়াকে পরিহার করিয়া "জ্ঞান" হইতে পারে না। তাহাকে অন্য আখ্যা দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা জ্ঞান নহে।

আর যদি জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বা দীনতা হইতে এই সকল বিরোধের সদ্ভাব হইয়া থাকে, তবে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, মানবজীবনের ক্রমোন্নতি সহকারে জ্ঞানের অভিব্যক্তি বলে এ সকল বিরোধ একদিন তিরোহিত হইবে। বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্ত্তনে যেমন নূতন নূতন সত্যের আলোক পাওয়া যাইতেছে, তেমনই বিরোধ বৈষম্যেরও নূতন নূতন সামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হইবে। তখন আর সার্কাসের অশ্বের মত তীব্রবেগে এক নির্দ্দিষ্ট, সংকীর্ণ, তুচ্ছ পরিধির মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতে হইবে না; তখন হয়ত জ্ঞানের গতির সঙ্গে সঙ্গে পথও অনেকটা অতিবাহিত হইবে এবং তৎ সঙ্গে সম্মুখের নূতন নূতন দৃশ্যও নয়ন-গোচর হইবে। মানব যদি জীবন-বিবর্ত্তনের শেষ স্তর না হয় অর্থাৎ উন্নতির প্রবাহ যদি মানবে আসিয়া অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও শুষ্কতা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে এ কল্পনা অসঙ্গত বোধ হয় না যে, ভবিষ্যতের মানব বহুস্তরের মধ্য দিয়া এমন এক স্তরে উপনীত হইবে, যেখানে বিরোধের কঠিন তটভূমি সামঞ্জস্যের পারাবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কে বলিতে পারে যে, এই নূতন সামঞ্জস্যের

আবির্ভাবের সঙ্গে আবার নূতন বিরোধের ভিত্তি গঠিত হইবে না? কে বলিতে পারে যে, যেমন সমস্যাগুলি এক এক করিয়া ঝরিয়া পড়িবে, তেমনই আবার সহস্র নূতন সমস্যা ও সংশয় জাগিয়া উঠিবে না?

আমরা একটি অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকি, যখন মানব কর্ম্মজীবনের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, যখন তাহার সমস্ত সংসার-গ্রন্থি শিথিল হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, যখন তাহার সমস্ত সংশয় জাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; ইহা সামঞ্জস্যের চিত্র বটে। ব্রহ্মের আবরণ বা যবনিকা স্বরূপ * মায়া যখন তিরোহিত হয়, তখন এই সামঞ্জস্যের ভাব আসে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্তু এখানেও সন্দেহ এই যে, যে বিরোধের মধ্য দিয়া মানব সামঞ্জস্যে উপনীত হয়। তাহার কি কোনও চিহ্নই আর থাকে না? আত্মা কি তাহার ইতিহাসকে বিনাশ করিয়া এই অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্যকে প্রাপ্ত হয়? তাহা হইলে ত আবার সেই বিরোধের কথা আসিল। আত্মা যদি আপনাকে পাইতে হইলে, তাহার আত্ম-স্বরূপকে একেবারে পরিবর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে ত সেই বিরোধ আবার সামঞ্জস্যের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল! আত্মা ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার আত্মত্ব—তাহার স্মৃতি, তাহার অনুভূতি, উপলব্ধি, তাহার যাহা কিছু নিজস্ব, সবই এক প্রলয় কালীন একাকারে বিলীন হইবে কেন?

তাই মনে হয় যে, বিরোধ ও সামঞ্জস্য এই উভয় ধর্ম্ম লইয়া আমাদের জ্ঞান, আমাদের চরিত্র, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের কামনা সকলই গঠিত। এদুইটির একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে

* "যবনিকা মায়া জগন্মোহিনী"—রামানুজ

আমরা ধারণা করিতে পারি না। আমাদের সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য সত্যাসত্য, নিত্যানিত্য, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য কারণ, জড় ও চেতন জীব ও ব্রহ্ম—এমন কতকগুলি অনপনোদনীয় দ্বৈত সূচনা করে, যাহার বিরোধ ও সামঞ্জস্য হইতে মানবের যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। আমি জানি যে, ইহার মধ্যে অনেকগুলি দ্বৈত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মতভেদ আছে বলিয়াই ত এত কথা বলিলাম। বিরোধকে, দ্বন্দ্বকে, দ্বৈতকে পরিহার করিয়া এক সমঞ্জসীভূত নির্দ্বন্দ্ব অদ্বৈতকে বরণ করিবার জন্য কাহার না আকাঙ্ক্ষা হয়? কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কখনও চরিতার্থতা লাভ করিবে কি? শৈত্য জলের প্রকৃতি-সিদ্ধ, শৈত্যকে বাদ দিয়া জলকে পাওয়া যায় না। সেইরূপ বিরোধ ও সামঞ্জস্য এই উভয় তত্ত্ব-বিরচিত জ্ঞান একের দ্বারা পূর্ণায়তন হইতে পারে না। অনিত্য প্রাতিভাসিক সত্তাকে মিথ্যা বলিয়া নিত্য সত্তাকে অবলম্বন করিতে চাহ, আমার বোধ হয় সে চেষ্টা সফল হইবে না। এই জন্যই আমরা বিরোধাপন্ন দ্বন্দ্বগুলিকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়ি। আমি আমার স্বার্থকেই সর্ব্বাগ্রে বাঁচাইতে চাহি; কিন্তু আমার সমাজ তাহাতে বিরোধী, রাষ্ট্র শক্তি তাহাতে বাদী। এ বিরোধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সামঞ্জস্য করিতে চাহ, ক্ষতি নাই। কিন্তু পারিবে কি? স্বার্থকেই একমাত্র নিয়ামক, একমাত্র লক্ষ্য করিয়া তুলিলে একপ্রকার সামঞ্জস্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে স্বার্থ শেষরক্ষা করিতে পারে না। এমন কি; তোমাকেও বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। মিডাসের মত সোণার কান্তি, সোণার শরীর, সোণার খাদ্য পাইয়া, উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারি বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য; ঐ সোণাই শেষে কাল হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়। সমাজের দিক দিয়া এই বিরোধের সমাধান করিতে গেলেও ফল যে বড় বেশী ভাল হয়, তাহাও বলা

যায় না। প্রাচীন কালে স্পার্টা সমাজের কল্যাণকে লক্ষ্যভূত করিয়া ব্যক্তিকে বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনকে কঠোর বন্ধনে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়াছিল। কিন্তু সে বাঁধন আঁটিল না; সমাজ দেহ ব্রণ-কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাহারও একটি সহজ সামঞ্জস্য বা সমাধান প্রাচীন কাল হইতে মানবের একাগ্র চিন্তা ও সাধনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তিকে বিনাশ কর, কামনা বর্জ্জন কর, আসক্তিকে দূর কর, মোক্ষ লাভ করিবে। কিন্তু সে মোক্ষ লাভ করিবে কে? যে রক্ত মাংসের শরীরধারী জীবের জন্য এই ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিলে, তাহারও ফাঁসির পরোয়ানা যে সেই সঙ্গে লিখিয়া দেওয়া হইল, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? পক্ষান্তরে নিবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রবৃত্তি লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা কর, সে চেষ্টাও ত কই সার্থক হয় না। আলেয়ার আলোকের পশ্চাতে অনুসরণ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া হস্ত পদ ক্ষত বিক্ষত করিয়া আসিলে, অথচ গন্তব্য পথ আরও দূরে সরিয়া গেল! সুতরাং এ প্রকারে সামঞ্জস্য হয় না। বৈষ্ণব কবি সুখ দুঃখের প্রসঙ্গে বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তার ঠাঁই॥

এই কথাটি প্রায় সকল দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের সম্পর্কে খাটে। জীবন ও মৃত্যুর মত বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী দুইটি জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন; কিন্তু তাহাদেরও বিরোধের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে! তাহারা যেন বিধাতার সৃষ্টি-বীণার দুইটি তার। একটিতে ঝঙ্কার দিলে অপরটি আপনি বাজিয়া উঠে। তাহারা এত কাছাকাছি থাকে, পরস্পর এত আপনার, তবু

তাহাদের বিরোধ; একের উৎপত্তিতে অন্যের বিনাশ, তবু তাহাদের মিলন, এ রহস্য তর্কশাস্ত্র বুঝিবে কিরূপে? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, প্রতিমুহূর্ত্তে যখন জীবন বাড়িতেছে, তখনই প্রতিমুহূর্ত্তে সে মৃত্যুকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করিতেছে! জীবনের অভিব্যক্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়াই কি হইতেছে না? তিল তিল করিয়া শরীর বিনষ্ট হইতেছে, আর তিল তিল করিয়া নূতন শরীর গঠিত হইয়া আমাদের স্বাস্থ্যের মাত্রা ও জীবনের পরিণতি সূচিত করিতেছে। এইরূপে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবনের প্রবাহটি চলিয়াছে, বিরোধের মধ্য দিয়া সামঞ্জস্য গঠিত হইয়া উঠিতেছে। জীবনের পথে মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া তখনই লোকে শিহরিয়া উঠে, যখন এই হ্রাস-বৃদ্ধি, জোয়ার-ভাঁটার ফলে একবার শুধু হ্রাসের পরিমাণ, ভাঁটার টান প্রবলভাবে দেখা দেয়, একবার সেই বিরোধ-সামঞ্জস্যের তারটি ছিড়িয়া যায়। কিন্তু কে বলিবে যে, সেই বিরোধের পরপারে আর সামঞ্জস্যের ধারা বহে না? কে বলিবে যে, মৃত্যুর দ্বার দিয়া অমৃতের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না? মৃত্যু হয় ত এক ক্ষণিকের বিস্মরণ। তার পরেই জাগরণ। ঝটিকা কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থাকে বিধ্বস্ত করিয়া বিরোধের রুদ্রমূর্ত্তি প্রকটিত করে; কিন্তু তাহার পরেই আবার প্রকৃতি যে সামঞ্জস্যের শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, সে মূর্ত্তি কি সুন্দর! মরণের বিরোধময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আবার জীবন যে কি সুন্দর, শান্ত, সমঞ্জসীভূত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাই জানিবার অতন্দ্রিত কৌতূহল লইয়া বিশ্বাসী মানব মৃত্যুর সম্মুখীন হয়—

For tho' from out our bourne of time and place
The flood may bear me far,
I hope to see my pilot face to face
When I have crossed the bar—Tennyson.

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রের মতবাদগুলি এই বিরোধ ও সামঞ্জস্য-তত্ত্বের প্রচুর উদাহরণ যোগাইতে পারে। বিশ্বের মূল তত্ত্বগুলির আলোচনায় বিরোধ ও সামঞ্জস্য কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে, দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিলে তাহা আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ বিরোধের প্রণিধান হইতে দর্শন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবং প্রত্যেক দার্শনিক মতবাদই এইরূপ কোনও না কোনও বিরোধের সামঞ্জস্য-সাধনে তৎপর বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। পারমার্থিক ও প্রাতিভাসিক সত্যের বিরোধ, প্রকৃতি ও পুরুষের বিরোধ, ক্ষণিক ও অক্ষণিকের বিরোধ, জড় ও চেতনের বিরোধ, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যে বিরোধ, জ্ঞান ও বিশ্বাসে বিরোধ, চিন্তা ও কর্ম্মে বিরোধ এইরূপ শত শত বিরোধ দার্শনিক চিন্তার লীলাভূমি। এই বিরোধকে দূর করিয়া সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহাই হইল দার্শনিক দিগের আকাঙ্ক্ষা। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে অতিক্রম করিয়া একত্ব বা সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে জগতের দার্শনিক ইতিহাস তাহার সাক্ষী। কোনও দার্শনিক মতই এ পর্য্যন্ত একেবারে নিরস্ত হয় নাই, এক সময়ে যে মতবাদ পরাস্ত, অগ্রাহ্য, নির্জীব বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, বহু শতাব্দী পরে তাহারই চিতাভস্মের মধ্য হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইয়া দার্শনিক জগতে বিপুল বিপ্লব বাধাইতেছে। সেইজন্যই দর্শনশাস্ত্রের সমস্যা-গুলি নিতান্ত অবাধ্যভাবে পৌনঃপুনিক নিয়মে দেখা দিয়া শুধু মানব বুদ্ধির নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করে।

বিরোধ ও সামঞ্জস্যের উপলব্ধি তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics) ইতিহাসে একটি বিস্তৃতস্থান অধিকার করিয়া আছে। একটু স্থিরভাবে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন

কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই তত্ত্বটি কোনও না কোনও আকারে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বেদান্তের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব ও সত্ত্ব-তমোগুণ বিভাগ, বৌদ্ধের শূন্যবাদ, পাইথাগোরাসের সামঞ্জস্যবাদ প্রভৃতি এই বিরোধ ও সামঞ্জস্যকে অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক এম্পিডক্লিজ যখন মৌলিক পদার্থ-চতুষ্টয়ের (four Elements) কল্পনা করিলেন, তখন তিনি তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগের জন্য প্রীতি ও দ্বন্দ্ব নামে (Love and Discord or Hate) দুইটী তত্ত্বের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বিরোধ ও প্রীতি জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্যের সংঘটন করিতেছে। এম্পিডক্লিজের মতে বিরোধ অপেক্ষা প্রীতিই প্রবল, সেইজন্য তিনি প্রীতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এম্পিডক্লিজের পূর্ব্বে ইলিয় সম্প্রদায়ের (Eleatics) পার্মেনাইডিজও প্রীতির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পার্মেনাই-ডিজের কবিতার যতটুকু পাওয়া যায় (তিনি তাঁহার মত পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন), তাহা হইতে বোধ হয় যে, তিনি জগতের মূল তত্ত্বকে এক অদ্বিতীয়, অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনশীল সত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পার্মেনাইডিজের মতে প্রকৃতির উপাদান দ্বিবিধ—তেজ ও তমঃ। তেজ—লঘু, উষ্ণ, উজ্জ্বল, এবং কোমল; তমঃ—গুরু, শীতল, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কঠিন। এখানেও আমরা বিরোধ ও সামঞ্জস্যের মিশ্রণ লক্ষ্য করিতে ভুলিব না। পার্মে-নাইডিজের প্রীতি এই বিরুদ্ধ-প্রকৃতিক সত্তাদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে।

বর্ত্তমান কালে কাণ্ট্ আমাদের চিৎশক্তিকে বিরোধ-লক্ষণা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এক দিকে দেখিতে গেলে তাঁহার দর্শন বিরোধের তত্ত্বেই পরিপূর্ণ; জ্ঞান ও অনুভূতির বিরোধ (Reason

and Sense), বস্তু ও রূপের বিরোধ (Matter and form), পরিদৃশ্যমান ও পারমার্থিক তত্ত্বের বিরোধ (Phenomenon and Noumenon)—এই নানা বিরোধের পরিকল্পনায় কান্টের দার্শনিক মত কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে।

হেগেলের দর্শন কান্টের বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলিকে (antinomies) এক নূতন সামঞ্জস্যের দ্বারা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি বিশুদ্ধ ভাব ও অভাবের (Pure Being and Non-being) ঐক্য অনুভব করিয়া, তাহা হইতে এই পরিণামধর্ম্ম-প্রবণ প্রকৃতির (phenomenal world) তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি যে প্রণালী অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে এক কথায় বলিতে গেলে বিরোধ ও সামঞ্জস্যের সমন্বয় বলিতে হয়। তাঁহার দার্শনিক প্রণালীর ভিত্তি :—অবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা (thesis), বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা (antithesis) এবং সামঞ্জস্য (synthesis)। এই ক্রমের দ্বারা তিনি জড় ও চৈতন্যের মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র গঠন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তব জগৎ আমাদের এই প্রণালীর নাগপাশে আবদ্ধ হইতে চাহিবে কি না, যথার্থ সজীব, চক্ষুকর্ণ-গোচর সত্তার পরিবর্ত্তে এইরূপ নির্জীব, রক্তশূন্য অপ্রকৃত তত্ত্বগুলিকে আমরা মানিয়া লইব কিনা, তাহা বিচার্য্য। তবে এইমাত্র বলিলে আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, জগৎ-প্রণালী বিরোধ ও সামঞ্জস্যের লীলাভূমি, এগুলিকে আমাদের জ্ঞানের দৈন্য বা সসীমত্বের স্কন্ধে ফেলিলে চলিবে না। ইহাদিগকে স্বরূপ সত্তার অপরিহার্য্য অংশ বলিয়া গণনা না করিলে উপায় নাই।

দর্শনের দিক ছাড়িয়া দিয়া জীবনের ক্রিয়া-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলেও এই সত্যটি আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। জীবন কতকগুলি বিরুদ্ধ শক্তির মিলন ; জীবনের ক্রিয়া

ঘাত প্রতিঘাতে পরিস্ফুট হয়। জীবনের স্পন্দন নির্জীবের সংঘর্ষে। চেতনের বল অচেতনের সংঘাতে। এইরূপে জীবনের নানা অবস্থায় আমরা বিরোধ ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বার্গসনের (Bergson) মতে জীবনই যথার্থ সত্তার নিয়ামক। আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিরোধ ও সামঞ্জস্য যাবতীয় জৈবক্রিয়ার নিয়ামক। সুতরাং এই দুইটী তত্ত্বকে মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। একই বৃত্তের ভিতর ও বাহিরের দিকের (concave and convex sides) মত ইহারা বস্তুতত্ত্বকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই দুইটিকে তত্ত্বতঃ স্বীকার করিলে একবাদ ও বহুবাদ (monism and pluralism), অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ (spiritualism and materialism), মায়াবাদ ও পরমার্থবাদ (appearance and Reality), সগুণ বাদ ও নির্গুণবাদের ভিত্তি নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া উঠিবে। এগুলিকে তখন এক মহাসত্যের অংশ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিব। আর মানবের বুদ্ধি যেখানে উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে গমন করিতে গিয়া ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে, সেখানে আর নিরাশায় আমাদিগকে ব্যাথিত করিতে পারিবে না। জীবন ও মৃত্যুর বিরোধকে আর আমরা এক প্রকাণ্ড ব্যর্থ রচনার দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করিতে পারিব না।

আমি যাহা বলিতে চাহিয়াছি, তাহা এই নীরস বিষয়ের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দ্ব্যর্থশূন্য পরিস্ফুট ভাবে বলিতে পারিয়াছি কিনা, জানিনা। তবে যাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

শিক্ষা ও মাতৃভাষা*

আমাদিগের দেশে শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক লোকেরই কোনরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ ব্যবস্থা করেন, আমরা তাহারই অনুবর্ত্তন করি মাত্র। সাধারণ লোক এ সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে শিক্ষার যেরূপ প্রসার ও সমাদর হইতেছে, তাহাতে আমাদের এরূপ ঔদাসীন্য যে নিতান্তই লজ্জাকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক বালক বালিকা যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রমজীবিদিগের জন্য, মূক ও বধিরের জন্য, অন্ধদিগের জন্য শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

শিক্ষাই সভ্যজাতির এক মহাশক্তি। যে জাতি যত শিক্ষিত হয়, জীবন-সংগ্রামে ততই সে স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই এখনও হিন্দুজাতি বহিরাক্রমণের প্রবল বন্যায় পুনঃ পুনঃ বিক্ষুব্ধ হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রীকের গৌরব-সূর্য্য বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে। তাহার স্বাধীনতা পর পদ দলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সাহিত্য-দর্শনময়ী প্রতিভা মানব সমাজে এখনও চিরনূতন রহিয়াছে। রোম গিয়াছে, তাহার সভ্যতার দাবি সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সভ্য জগৎ ক্রমশঃই উপলব্ধি করিতেছে যে, নৈতিক শক্তি শারীরিক শক্তি অপেক্ষা মহীয়সী; সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ চলিয়া যায় নাই, তাহা আধুনিক সভ্যতার অসম্পূর্ণতার নিদর্শন। সমগ্র মানবজাতির আশা, উদ্যম

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে পঠিত।

ও লক্ষ্য সভ্যতার দিকে কেন্দ্রীভূত। শিক্ষা মানব-সমাজের কেন্দ্রগামিনী শক্তি। সমাজের বিভিন্ন অংশকে একত্র গ্রথিত করিতে হইলে, দুরূহ জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইতে হইলে, শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমি জানি না, অথচ এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা কর্তৃপক্ষের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সকলেরই ব্যক্তিগতভাবে ও সাধারণভাবে স্বার্থ রহিয়াছে, অথচ এমন দুরদৃষ্ট যে এ বিষয়ে আলোচনার একান্তই অভাব।

শুধু জ্ঞানোপার্জ্জন শিক্ষা নহে, শিক্ষা সর্ব্বতোমুখী হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষা মানব-প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে, পরিবর্ত্তন করে ও আলোকিত করে। যে শিক্ষা চরিত্রোৎকর্ষ বিধান করে না, মানসিক ভাব ও বৃত্তিসমূহের সম্যক্ স্ফুরণে সহায়তা করে না, যাহা কেবল পরকীয়া বিদ্যার অনুবৃত্তি মাত্র, তাহা কখনও শিক্ষা নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষা মানব-প্রকৃতির পশুত্ব অপনোদন করিয়া তাহাকে দেবত্বে দীক্ষিত করিবে, তবেই সে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল; নহিলে শিক্ষার অভিনয় হয় মাত্র।

আজকাল অনেকস্থলে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই সে নিন্দা শিক্ষা-নীতির উপর বর্ষিত না হইয়া, শিক্ষিত যুবকদিগের ভাগ্যেই হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবককে এক অদ্ভুত জীব বলিয়া প্রমাণ করা যেন একটি উপাদেয় কাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসা হয় না, বিশ্ববিদ্যালয় একবার ছাড়িতে পারিলে আর তাহার কথা তাহারা মনে করে না, এ অপবাদ ত মুখে মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ অপবাদ কি

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমণ্ডিত যুবক স্বেচ্ছায় মস্তকে বহন করিতেছে? আমরা পরীক্ষা পাশ করিয়াই যদি অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আর কাহারও পরীক্ষা পাশ করিয়া কাজ নাই।

শিক্ষানীতির সংস্কার সম্বন্ধে যে বিপুল প্রশ্ন অন্তর্নিহিত আছে, তাহার মীমাংসা করা এ ক্ষুদ্র লেখকের সীমা ও সাধ্য, উভয়েরই অতীত। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুইটি বিষয়ের অবতারণা করিব মাত্র। প্রথম, প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের বাঞ্ছনীয়তা। দ্বিতীয়, প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে মাতৃভাষার অপরিহার্য্যতা। প্রথমটি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোনও জাতি কখনও শিক্ষা ব্যতীত অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় নাই, কখনও হইবে না। এক সময়ে কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর জাতি বিপুল সংখ্যা এবং প্রভূত পাশব বলের প্রভাবে মধ্য এসিয়া ও উত্তর ইউরোপ খণ্ডে এক প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় সভ্যতার সূর্য্য বিলুপ্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল বটে, কিন্তু ধ্বংসের অনুচরগণ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, সময়ের গাত্রে একটিও রেখা রাখিয়া যাইতে পারিল না। অথচ রোমক সভ্যতা আজিও স্নিগ্ধ উষার ন্যায় মানব জাতির বিচিত্র জ্ঞানাকাশ ব্যাপিয়া আছে। বাহুবল অচিরস্থায়ী, সভ্যতা (culture) অজর, অমর। সেই সভ্যতার মূল শিক্ষা।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ধর্ম্মের আলোকে প্রদীপ্ত ছিল, তাই আজিও রম্য গোধূলির ন্যায় সে পুরাতন সভ্যতা আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার খরজ্যোতি তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। দেবভাষা সংস্কৃত আমাদের সম্মুখে তাহার অতুলনীয় বিভব সর্ব্বদা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব গৌরব কোথায়? সংস্কৃত ভাষার কুঞ্জকাননে আর ত নিত্য নূতন সঙ্গীত শুনিতে পাই না। আর ত সে পুরাতন বীণায় নূতন রাগিনী বাজে না।

সংস্কৃত সভ্যতার যুগ চলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘাতে সংস্কৃতকে পরিম্লান হইতে হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজি ও সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন ইংরেজি ভাষা এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের অবলম্বন স্বরূপ বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেশের ভাগ্য-গঠন বিষয়ে দেশীয়গণের অংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। ইংরেজি জয়লাভ করিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্যায় দেশ প্লাবিত হইতে চলিল; কিন্তু শতাব্দী ধরিয়া এই বিদেশীয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া আমাদের মুক্তিপথ প্রশস্ত হইল কৈ? প্রতি বৎসর অগণিত যুবক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার দিয়া ভারতীর মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতেছেন; প্রকৃত অর্ঘ্যদান কতজনের ভাগ্যে ঘটে? পুণ্য জ্ঞান-পিপাসা মনে জাগে না; অমরত্বের আস্বাদনও ভাগ্যে ঘটে না। উপাধি-ধারী যুবকের অধ্যবসায়ের অভাব নাই; তাহার শিক্ষা যে ভিত্তিহীন!

কিন্তু কালের স্রোত ফিরিয়াছে। উষার আগমনে সর্ব্বত্র উন্মেষের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে: দীনত্বের গৌরব আমা-দিগকে ঋণ-গ্রহণে সঙ্কুচিত করিতেছে। শুধু যে বিদেশীয় শিক্ষার গৌরব কমিয়াছে, তাহা নহে; বিদেশীয় আচারে উপহাস বর্ষিত হইতেছে, বিদেশীয় শিল্প ধনীর বিলাসগৃহে শোভা হারাইতে বসিয়াছে, বিদেশীয় বুলি বাঁকাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লওয়া কঠিন হইয়াছে। বক্তারা অভ্যস্ত ইংরেজির ছটা ছাড়িয়া মাতৃভাষার দীন খঞ্জ কলেবরে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুষুপ্তির বিশ্রম্ভালস জড়তার অবসানে চৈতন্যের আভাস দৃষ্ট হইয়াছে। খেলা ধূলার অবসানে ক্ষুধার্ত্ত সন্তান মাতার আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়াছে। জোয়ার আসিয়াছে, পালে অনুকূল বাতাস লাগিয়াছে, দিক সকল নির্ম্মল হইয়াছে, যাত্রার এই প্রশস্ত সময়।

মাতৃভাষার প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিব্য আলেখ্যের ন্যায় দূর হইতে প্রলুব্ধ করিতেছে। এ শুভলগ্ন যদি ভ্রষ্ট হয়, তবে আর কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।

বঙ্গভাষাই আমদের বাঙ্গালীর শিক্ষার একমাত্র স্বাভাবিক ভিত্তি। সর্ব্বজাতির মধ্যেই মাতৃভাষা জাতীয় শিক্ষার অবলম্বন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। জাতীয়তার দিক ছাড়িয়া দিলেও, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুকুমার-স্বভাব শিশুগণের চিত্তবৃত্তি-স্ফুরণের পক্ষে মাতৃভাষা যেমন অনুকূল ও স্বাভাবিক, অন্য ভাষা কোন ক্রমে তেমন হইতে পারে না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অতুল সম্পদশালিনী সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া দীনা বঙ্গভাষার শরণ গ্রহণ করিব কেন? বহু শতাব্দীর জ্ঞান-পুষ্ট ভাষাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে কি? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে। বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে হইলে দুইটি স্রোতকে মিলাইয়া দিতে হইবে। বঙ্গভাষা নূতন ও সজীব আকারে সংস্কৃতকে আলিঙ্গন করিবে। বাঙ্গালা সংস্কৃতের এক নূতন সংস্করণ হইবে। আমার মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যের সজীবতা সম্পাদন করিতে বাঙ্গালাই কেবল সক্ষম। সংস্কৃতকে বাঁচাইয়া রাখা প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃত বঙ্গভাষা সংস্কৃতকে বাঁচাইয়া রাখিবে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বঙ্গভাষায় হইতে হইলে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ মিলন অবশ্যম্ভাবী। কেননা নূতন ভাব-প্রকাশের জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন হইলে, সংস্কৃত অপেক্ষা অন্য কোনও ভাষাই আমাদের নিকটতর আশ্রয় নহে। পাছে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ ইংরেজি ভাষার অধিকার খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে, এজন্য কেহ কেহ এরূপ উৎকর্ষকে সন্দিগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। যদি

বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলেও উপায় নাই। প্রকৃত শিক্ষা মাতৃভাষার অনুগামিনী। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। যে নিয়মে বসন্তে কোকিল গাহে, প্রভাতের বাতাসে ফুল ফোটে,—মাতৃ-ভাষার সংসর্গে শিশুর মানসিক শক্তিনিচয় স্ফুরিত হওয়া তেমনি একটি নিয়ম। আমরা সে প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, কাজেই শিক্ষা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। চীনেরা যেমন সৌন্দর্য্যের কুহকে লৌহের জুতা পরাইয়া রমণীগণের পা ছোট করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পায়ের যাহা স্বাভাবিক কার্য্য, ভ্রমণ—তাহার শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি বিদেশীয় ভাষার কঠিন আবরণে বঙ্গীয় যুবকের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যাহা অস্বাভাবিক, তাহাই অমঙ্গলপ্রসূ। এই অমঙ্গলকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মাতৃভাষার শরণ লইতে হইবে। শিশু যখন হাঁটিতে শিখে, তখন মাতৃভূমির উপরেই পা ফেলিয়া ফেলিয়া শিখিয়া থাকে; Parallel Bar বা তারের উপর অভ্যাস করে না। হাঁটিতে শিখিলে তখন Parallel Bar বা Rope dancing এ বাহাদুরী লওয়া সম্ভব হয়। আমরা নিজের ভাষা দিয়া আরম্ভ করিলে পরের ভাষাও আমাদের নিকট সরল ও উপকারক্ষম হইবে, শিক্ষাও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেখানে ইংরেজির নাগপাশ তত কঠিন নহে, সেখানে বাঙ্গালী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে বিমুখ হয় নাই। বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর প্রতিভা অসঙ্কুচিত, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র তাহার উদাহরণ স্থল। গণিতেও বাঙ্গালী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

একটি কথা এই, ইংরেজি সাহিত্যের সংসর্গে বাঙ্গালা এত পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ইংরেজি আমলেই বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি

হইয়াছে, ইংরেজি ভাষা প্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছে, আমরা ইংরেজিকে পরিত্যাগ করিব কি প্রকারে? করিবই বা কেন? ইংরেজির প্রভাব তিরোহিত হইলে বাঙ্গালার দশা কি হইবে, কে বলিতে পারে? আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, ইংরেজির সাহায্য আমাদের ভাষার পক্ষে আদৌ আবশ্যক নহে। তাঁহারা বলেন, ইংরেজির সংসর্গ প্রাপ্ত না হইলে বঙ্গভাষা শৈশব অতিক্রম করিতে পারিত না, ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আর এ সংসর্গ শুভাবহ নহে। তাহার যেটুকু কাজ ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন তাহাকে তাহার সুদূর জন্মস্থানে ফিরাইয়া দাও। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে বিদেশী-বর্জ্জন যেমন অপরিহার্য্য, ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য। বিদেশীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে বয়ন-শিল্প ও ভাষা অচিরকালের মধ্যে উন্নতি লাভ করিবে।

আমি ঠিক বলিতে পারি না, বস্ত্র-শিল্প ও ভাষা সম্বন্ধে একই যুক্তি প্রযোজ্য কিনা, তবে আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি-বিধানের জন্য ইংরেজিকে বয়কট করা অত্যাবশ্যক নহে। বয়কট বলিতে যে বিদ্বেষের ভাব মনে আসে, তাহা যে এরূপ গভীর তত্ত্বমীমাংসার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে, ইহা বলা বাহুল্য। ইংরেজি সাহিত্যের নিকট বঙ্গভাষা কৃতজ্ঞ। তাহার ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধনীয়। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গভাষা তাহার গতি ও ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতেছে। বঙ্গভাষার সে গতিকে ব্যাহত না করিলেই তাহার উন্নতির সহায়তা করা হইবে, যাহা স্বাভাবিক, তাহাকে প্রতিরোধ না করিলেই আপনি সে প্রসার লাভ করে। বঙ্গভাষা ইংরেজির সঙ্গ ত্যাগ না করিয়াও

অল্পে অল্পে তাহার স্থায্য অধিকার আদায় করিয়া লইতেছে। এমন একদিন ছিল যে প্রাথমিক শিক্ষার সংকীর্ণ ক্ষেত্র লইয়া বঙ্গভাষাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের মধ্যে নিতান্ত নগণ্য একটি স্থান পাইবার জন্য বঙ্গভাষাকে দীনভাবে যাচ্ঞা করিতে হইয়াছিল। পদকপুরস্কারের লোভে পরীক্ষার্থিগণ ইচ্ছাসুখে একদিনমাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বাঙ্গলা রচনার পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে কোন কোন ছাত্র বাঙ্গালা গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সেরূপ বিকল্প যে নিতান্ত অভাবপক্ষে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিতেন না। কারণ তাহা না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রহণ করিতেন, এফ, এ পরীক্ষায় তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন ছিল কি? এফ-এ পরীক্ষার্থীরা বাঙ্গালা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কেবল মেয়েদের জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। তাঁহাদিগকে এফ-এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইত।

এরূপ বৈষম্য যে সুব্যবস্থার বিরোধী, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নববিধানে বঙ্গভাষাকে পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সমধিক প্রসার দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষা তাহার ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক বি. এ পরীক্ষার্থীর পক্ষে বঙ্গভাষা অবশ্য গ্রহণীয়। মধ্য পরীক্ষায়ও বাঙ্গালা সংস্কৃতের ন্যায় একটি স্বাধীন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর, ইচ্ছা করিলে, মাতৃভাষায় লিখিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, সেই

সমিতি উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা সমর্থন করিয়া এম-এ পরীক্ষাতেও বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনকে বাঙ্গালা ভাষার রীডার (Reader) নিযুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাতৃভাষাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বালকের অনেক অমূল্য সময় যে নিতান্ত অনাবশ্যক রূপে বিদেশীয় ভাষার বন্ধুর ও কঙ্করময় পথে বিচরণ করিতে কাটিয়া যায়, তাহা বহুদিন হইতে শিক্ষাসংস্কারার্থিগণের মন আন্দোলিত করিতেছিল। বাঙ্গালা যাহাতে শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রথম হইতে এ জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে পরিষৎ বাঙ্গালা সাহিত্য বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। তখন সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে শিক্ষানীতির যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপেক্ষা ও উপহাসের সামগ্রী ছিল, আজ তাহাই সম্পূর্ণ সফল হইতে চলিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে পেড্‌লার সাহেব যখন শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটার ছিলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজি স্কুলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। এতদিনে পরিষদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। ইংরেজি স্কুলের নিম্ন শ্রেণী সমূহে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হইল—যদিও তাহার ফলে অনেক অদ্ভুত বাঙ্গালা সম্বলিত পাঠ্য পুস্তকের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সে সকল গুল্ম-কণ্টক তিরোহিত হইয়া বঙ্গভাষা অচিরকালে দিব্য শাখা-পল্লব-সমন্বিত হইয়া উঠিবে, আশা করা যায়। শিক্ষা-

বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য নিরপেক্ষ ভাবে শিক্ষার নিম্নস্তরে যাহা করিতেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নববিধানে বঙ্গভাষাকে উচ্চ-স্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্যক্‌রূপে তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎও বাঙ্গালা ভাষার সমুচিত আদর করিতে ত্রুটী করেন নাই। শিক্ষাপরিষদের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই নিম্ন ও উচ্চ উভয়বিধ শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষাকে মুখ্য ও ইংরেজিকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গভাষাকে উচ্চ শিক্ষার স্তরে উন্নীত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান ভাইস-চান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়—সমগ্র বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এই নবব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে অনেক বাধা ও বিরোধ খণ্ডন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, নবপ্রবর্ত্তিত প্রথার ফলে ইংরেজির প্রভাব ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিবে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর শুভাশুভ এই শিক্ষা-নীতির উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃত শিক্ষা মাতৃভাষার সহিত অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থির দ্বারা জড়িত, তাহা হইলে সেই মাতৃভাষারই শ্রীবৃদ্ধি-সাধন প্রত্যেক সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি ইংরেজির প্রভাব পরিম্লান হয়, তবে তাহাই বিধাতার বিধান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। একটি জাতির শুভাশুভের তুলনায় এ ক্ষতি অতি তুচ্ছ।

কিন্তু তাহা বলিয়া এখন হইতেই বিলাতী পণ্যের ন্যায় ইংরেজি ভাষাকে বয়কট করিতে হইবে, ইহা কখনও যুক্তি-সঙ্গত

বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ এইরূপ প্রবৃত্তি ঠিক স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক কি না সন্দেহ-স্থল। বরং বঙ্গভাষাকে সৌষ্ঠব সমন্বিত করিবার জন্য ইংরেজি বা পৃথিবীর অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ ভাষার ঋণ গ্রহণ করা অধিকতর জাতীয়তার পরিচায়ক। হিন্দুরা শিক্ষার জন্য অপরের দাসত্বগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজি সাহিত্য পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, ইংরেজি ভাষা ভারতের বিভিন্ন বিশ্লিষ্ট অংশগুলিকে একতার বন্ধনে বাঁধিয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃত সভ্যতার স্রোতোহীন স্থির যমুনায় খরস্রোতা ভাগীরথীর ন্যায় তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছে, তাহার সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে। এখন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যাহাতে ধীরে সরল পথে এবং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়, তাহাই করা শুভাবহ। অকস্মাৎ কোনও দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে শারীর প্রণালী যেমন বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সমাজতন্ত্র তেমনি আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিপর্য্যস্ত হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেও রক্ষণ-শীলতার প্রয়োজন আছে। অবিমিশ্র উদারনীতি বা রক্ষণ-শীলতা অপেক্ষা বিবর্ত্তনশীল জাতীয় জীবনে উভয়ের সংমিশ্রণই অধিকতর মঙ্গলজনক। পূর্ব্ব প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে ; স্বাভাবিক নিয়ম আপনি সে পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনকে বিপ্লবে পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই।

বঙ্গ-সাহিত্যের ভাব-ধারা

আপনারা আমাকে অদ্য যে সম্মানের আসন প্রদান করিলেন, ইহার জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ, ইহা বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল না। আমার প্রতি আপনাদের এই পক্ষপাতিত্বে যাঁহারা অসন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। বহু কৃতী ও যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি-পদ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে গৌরব কিছুই নাই। যোগ্যতার পুরস্কার ত দিতেই হয়, না দিলে কলঙ্কভাজন ও প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু অযোগ্যকে যে পুরস্কার দেওয়া যায়, তাহা যুগপৎ মহত্ত্ব ও গৌরবের বিষয়। সেই মহত্ত্ব ও গৌরব আজ যথার্থই আপনারা অর্জ্জন করিলেন।

আগ্রা বলিতে আমাদের মনে কত কি ভাব আসে! আগ্রা অর্থে সৌধকিরীটিনী নগরী নহে, সমৃদ্ধিশালী একটি সহর মাত্র বুঝায় না। ইতিহাসের কত কাহিনী ইহার সঙ্গে বিজড়িত আছে, মোগল সম্রাটের তীক্ষ্ণ রাজনীতি-বুদ্ধি-বিদ্ধ অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা ও ঔদার্য্য মিশ্রিত আছে, সম্রাটের দক্ষিণ ও বাম হস্ত-স্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের অদ্ভুত কার্য্যদক্ষতা ও বাহুবলের কত অতীত কথা গ্রথিত আছে, কাব্যকলার অফুরন্ত উৎসস্বরূপ মমতাজের স্মৃতি-সৌধমালা যমুনার নীলজলে শত শ্বেতশতদলের ছায়া-সমন্বিত শান্তিতে তন্দ্রালস জড়িমায় বিভোর হইয়া আছে! কতবার এই প্রসিদ্ধ তাজমহল দেখিয়াছি; কিন্তু শিল্পীর এ কি অপূর্ব্ব কলা-কৌশল যে, যতবারই দেখি, নয়নের রূপতৃষ্ণা মিটে না! বাস্তব ও আদর্শের এমন অপরূপ নিবিড় সম্মিলন জগতে বুঝি আর হয় নাই। মনে হয়, যেন কোনও যাদুকরের সম্মোহন

মন্ত্রে অকস্মাৎ শিল্পীর মানসী প্রতিমা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক দৈব মুহূর্ত্তে তাহাকে বর দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। মনে হয়, তখন সে শুভ মুহূর্ত্তে শুক্লা একাদশীর চাঁদ গগন-কিনারে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, যমুনার নীলিমায় তরঙ্গভঙ্গ স্থগিত হইয়াছিল, আর মলয়বাতাসের শেষ শ্বাসটুকু উদারা মুদারা তারার সমস্তগুলি পর্দ্দায় ঝঙ্কার দিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল। নীল আকাশে শুধু দুই একটি তারা জাগিয়া ছিল, আর জাগিয়া ছিল তাহারই মধ্যে প্রিয়বিরহী সম্রাট্ শাজাহানের স্মৃতির পরশটুকু। মার্ব্বেল-নির্ম্মিত তাজ, অথচ প্রস্তরের কঠিনতা নাই ; স্মৃতির মূর্চ্ছনার মতই কোমল —তাজ। কত ব্যথা, কত অশ্রু, কত দীর্ঘশ্বাস তাজকে অবয়ব দান করিয়াছে। সম্রাটের জমাট-বাঁধা অশ্রুরাশি যেন কালক্রমে স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে। প্রিয়ার জন্য প্রিয়তমের স্বচ্ছ শুভ্র পবিত্র প্রেম মরণকে উপেক্ষা করিয়া চিরসুন্দররূপে বিরাজ করিতেছে !

এই অনিন্দ্যসুন্দরী স্বপ্নময়ী মর্ম্মরকীর্ত্তির পাদপীঠতলে দাঁড়াইয়া সাহিত্য-রসে যাহার মন আপ্লুত হয় না, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য কে আছে ? সুতরাং আজকার এই সাহিত্য-সম্মিলনে কাহাকেও কষ্ট করিয়া সেই রসের উদ্বোধন করিতে হইবে না। নির্ঝরিণী যেখানে স্বচ্ছন্দ সলিল-প্রবাহের চিরবিরামহীন ধারা বহাইয়াছে, সেখানে কূপ খনন করিবার প্রয়াসে কি প্রয়োজন ?

সাহিত্য রসের ভাণ্ডার। রস অর্থ—যাহা আস্বাদন করা যায়। রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ ইতি রসঃ। সাহিত্য কথাটির মূল কি, তাহা আমি জানি না। তবে ‘সহিত’ হইতে যে ইহা আসিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। ধাত্বর্থ হইতে পাওয়া যায়, সাহিত্য অর্থে সম্মিলন বা সাধুভাষায় সম্মেলন। কিন্তু কিসের সম্মেলন ? মানুষের পরস্পর সম্মেলন হইতে যদি এই কথাটির জন্ম হইয়া থাকে, তবে

বুঝিতে হয় যে, একাধিক ব্যক্তি সমবেত ভাবে যাহা উপভোগ করিতে পারে, তাহাই সাহিত্য। উপভোগ বা আস্বাদন করিতে হইলে চাই রস। সুতরাং সাহিত্য রসের বস্তু, এসম্বন্ধে ভুল নাই। একটু ঘুরাইয়া বলিলে বলা যায় যে, সাহিত্য ভাব ও ভাষার সম্মেলন। ভাব যেখানে ভাষার 'সহিত' নিবিড়ভাবে সম্মিলিত হয়, সেখানেই সাহিত্যের জন্ম। ভাব কথাটিকে তলাইয়া বুঝিলে সেই রসেরই কাছে পৌঁছিতে পারা যায়। মনের স্থির সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে, যে কল্লোল ছুটে, তাহাই ভাব। মানুষের যত ব্যথা-বেদনা, যত মান-অভিমান, যত অনুভূতি-অনুমান সবই এই ভাবের খেলা। যাহা এই ভাবকে প্রেরণা দেয় তাহার নাম রস। চিত্ত-সমুদ্রে যখন রসের বাতাস বহে, তখনই তাহাতে ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়। নহিলে চিত্ত শান্ত, সমাহিত, নিস্তরঙ্গভাবে অবস্থিতি করে।

রসের সহিত ভাবের এই নিবিড় সম্বন্ধ আমরা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, যখন আমরা স্মরণ করি যে, সাহিত্যের জন্ম কবিতায়। কবিতা ও কাব্য রসের প্রথম ও প্রধানতম আশ্রয়। ভাব যখন ভাষাকে রসের পাকে ফেলিয়া আবর্ত্তন করে, তখনই তাহাতে কাব্যের জন্ম হয়। কাব্যের পরিণতিতে যেমন রসের দানা বাঁধে, এমন আর কিছুতেই নহে। এই যে রসের দানা (crystals) বাঁধে কাব্যে, ইহা সময়ে সময়ে হীরকদ্যুতিতে জগৎ উজ্জ্বল করে। কালিদাসের কুমারসম্ভব, মাইকেলের মেঘনাদ-বধ, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা এগুলি রসের হীরকসন্নিভ ক্রিষ্টাল।

কবিতার খেলাঘরের মধ্যে সাহিত্যের শৈশব কাটিলেও, কৈশোরে ও যৌবনে সাহিত্যকে নানাক্ষেত্রে রসের অনুসন্ধান করিতে হয়। তখন সাহিত্যের ক্ষেত্র আর সীমাবদ্ধ থাকিতে চাহে না। মানুষের প্রয়োজনের পরিধি যখন বিস্তৃত হয়, তখন শুধু

রসসৃষ্টি লইয়া সাহিত্য তুষ্ট থাকিতে পারে না। আমরা যে দিকে চিন্তার জাল বিস্তার করি, যে দিকে আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি যায়, সাহিত্য সেই দিকে নূতন নূতন রাজ্যের বার্ত্তা বহন করে। সাহিত্য তখন বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, পশুপালন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয়। সুতরাং সাহিত্য সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের সম্মেলন বা মিলন-ক্ষেত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ইহার পরিধি বিস্তৃত। সেই জন্য আমরা বলি, ঐতিহাসিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, দার্শনিক সাহিত্য ইত্যাদি। বিশিষ্টীকরণ বা Specialisation অনেক পরের কথা। সাহিত্যের বিপুল অবয়ব ছেদ করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। এই বিশিষ্টীকরণ সব দিকে সুবিধা-জনক বলিয়া মনে হয়। কেন না, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজ-নীতি, কাব্য, উপন্যাস ইহার এক একটি এরূপ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে যে, ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার বিশিষ্টীকরণের প্রয়োজন হইতেছে। ইতিহাসের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া প্রাচীন, মাধ্যযুগিক ও আধুনিক—এই বিভাগ করিতে হইয়াছে। এইরূপ বিজ্ঞানে আলোকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, তড়িতবিজ্ঞান প্রভৃতি শাখা-বিভাগ স্বীকার করা হইয়াছে।

চিন্তার ধারা একটি—সত্য, কিন্তু ভাবের উপলখণ্ডে আহত হইয়া ইহা শত ধারায় প্রবাহিত হয়। এইরূপ শত ধারায় যখন চিত্তের উৎস ছুটে, তখন নায়াগ্রার জলপ্রপাতের মত ইহারও জীমূতমন্দ্র গর্জ্জনে বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত হয়। সেই বিখ্যাত জল-প্রপাতে যেমন ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ প্রতিফলিত হয়, মানবের ভাবপ্রবাহেও সেইরূপ প্রতিভার নানা সুষমাময় বর্ণ-বৈচিত্র্য আবির্ভূত হয়। ভাবের ধারা ব্যাহত হইলে বা কোনও একটি নালিকায় চালিত হইলে, চিত্তের প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হয়। ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অনতিদীর্ঘকালে পৃথিবীর জ্ঞান-মণ্ডপে একটি সম্মানজনক আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভাবপ্রকাশের পক্ষে যে সাহিত্য যত উপযোগী, সে সাহিত্য তত উন্নত। আমরা এই মাপকাঠি লইয়া যখন আমাদের সাহিত্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখি যে, আমরা যতই গৌরব করি না কেন, আমাদের সাহিত্য বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে, এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। ইংরাজী ভাষার পাষাণ চাপের নিম্নে বাঙ্গালা ভাষা যাহা করিয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে, সত্য; কিন্তু সে গৌরব করিতে করিতে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এখনও দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিবার আছে। এখনও আমাদের সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যের হিসাবে যে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমাদের সাহিত্য কবিতা ও উপন্যাসে ভরপূর। আমরা বাঙ্গালী কথা, কাহিনী ও কল্পনা ভালবাসি। সংস্কৃত সাহিত্যের আমল হইতে আমাদের এই কল্পনা-প্রিয়তা দেখা যায়। উপনিষদে পর্য্যন্ত গল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কথা-সরিৎ-সাগর কথা-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সঙ্কলন। বৌদ্ধ সাহিত্যেও কথা-সাহিত্য অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বৌদ্ধ জাতকগুলি শুধু গল্পের সমষ্টি নহে; বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত এই গল্পগুলির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মূল পালি হইতে এই জাতকগুলি অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণ ও উপপুরাণগুলি আমাদের গল্পপ্রিয়তার অভ্রান্ত নিদর্শন।

কবিতা সম্বন্ধেও আমাদের কিছুমাত্র ঔদাসীন্য দেখা যায় না। সেই কোন্ দিন তমসার তীরে নিষাদ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি

হত হইলে ঋষি-কবির হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া শ্লোক বা কবিতার রুদ্ধ প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিল, তার পরে কত যুগযুগান্ত অতীত হইয়াছে, কিন্তু কবিতার স্রোতস্বতী চিরন্তন প্রবাহে চলিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ত কবিতার ছন্দোময়ী গতিতে নৃত্যশীল। ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের ভেষজ-প্রস্তুত-প্রণালী পর্য্যন্ত কবিতার ছন্দে নন্দিত। বেদে, নাটকে, পঞ্চতন্ত্রে কখনও কখনও কবিতার মোহ কাটাইতে পারিলেও, দেখা যায়, যখনই কোনও সারবান্ ভাবের অবতারণা হইতেছে, তখনই কবিতার আশ্রয়-গ্রহণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে যে গীতি-কবিতার যুগ আরব্ধ হইল, আজিও তাহা চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে মহা-কাব্যের তূর্য্য-নিনাদ শোনা গেলেও তাহা গীতি-কবিতার মুরলী-ধ্বনিতে মিলাইয়া গিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় তাঁহার অমর কাব্যের পরে ব্রজাঙ্গনার শরণ লইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিতা গীতি-কবিতার এক বিরাট পর্ব্ব। শ্রীকৃষ্ণলীলা যে কত কবির কল্পনাসুন্দরীকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। এত বড় কাব্য-সাহিত্য পৃথিবীর আর কোনও জাতির আছে কি না সন্দেহ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বিংশ সহস্রের কম হইবে না। আমাদের বাঙ্গালীর বড় গৌরবের কবি রবীন্দ্রনাথ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া গীতি-কবিতার মধুরসে আমাদের চিত্ত-মধুব্রতকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। রবির চতুষ্পার্শ্বে কত যে ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহ উদিত হইয়া কাব্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া-ছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে? বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের উদীয়মান কবি পর্য্যন্ত সকলেই কল্পনার ছায়া পথে বিচরণশীল।

আমরা যে কল্পনাবিলাসী, তাহা আমাদের কবিতা ও উপন্যাসের শ্রীবৃদ্ধি হইতে বুঝিতে পারা যায়। কবিতা বা উপন্যাস যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। তবে বাস্তবরাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেই বা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে কিরূপে? বাঙ্গালা সাহিত্যকে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্ট না দেখিতে পাইলে আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। সে দিন এক জন ইয়ুরোপীয় মহিলা আমার নিকটে উচ্চশিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি ভূগোল ও ইতিহাসের নাম জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি নাই। এইরূপ পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমাদের দৈন্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আমি যখন কোনও পুস্তকাগারে গিয়া বসি এবং সোনার জলে লেখা নয়নসুখকর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি আলমারীতে পাশাপাশি সজ্জিত দেখিতে পাই, তখন আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আমি ভাবি, কবে বঙ্গ-সাহিত্যের সেই সুদিন আসিবে, যে দিন তকতকে ঝক্‌ঝকে বাঙ্গালা বই এমনই গর্ব্বভরে আলমারীতে ঝলমল করিবে। আমাদের পরম প্রিয়তম প্রবাসী কবি গাহিয়াছেন—

মোদের গরব মোদের আশা
আমাদের বাঙ্গালা ভাষা।

কবে সে আশা পূর্ণ হইবে, কবে গর্ব্ব করিয়া বড় বড় বাঙ্গালা বই হাতে লইয়া আমরা অর্থনীতি, সমাজনীতি, বস্তুবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধিগত করিতে পারিব। আমাদের এই দৈন্য যে শুধু কল্পনা-প্রবণতার জন্য, তাহা নাও হইতে পারে। ইংরাজী ভাষায় সমস্ত গম্ভীর ও জটিল বিষয়ের বই পাওয়া যায় এবং আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষভাবে জ্ঞান-পিপাসু, তাঁহাদের সকলেরই ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত আছে বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সমস্ত বিষয়ে

গ্রন্থ রচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইলে পাঠক পাওয়াও কঠিন ছিল। আমার মনে হয়, এই অসুবিধা ক্রমশঃ বিদূরিত হইতেছে। এখন পাঠকসংখ্যা বাড়িতেছে এবং আমার বোধ হয়, এরূপ পাঠকই এখন অধিক, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থ পাইলে জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদিগকে এখন আর অবহেলা করিলে চলিবে না। তবে পাঠকের সদ্ভাব হইলেই যে গ্রন্থকার তখনই উদ্ভূত হয়েন, এমন কোনও কথা নাই। বঙ্কিম বাবু যখন উপন্যাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থ অচির কালে লক্ষ লক্ষ লোকের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করিবে? রবীন্দ্রনাথ যখন একখানির পর একখানি করিয়া কবিতার পুস্তক মুদ্রিত করিতেছিলেন, তখন কি তিনি জানিতেন যে, অচিরে এমন দিন আসিবে যে, কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার গ্রন্থের আস্বাদন করিতে বিরত থাকিবে না? মোহিত বাবু যখন রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থের একখানি অতি সুন্দর ও মূল্যবান্ সংস্করণ বাহির করেন, তখনও সেগুলির ভবিষ্যৎ কীটেরাই নির্ণয় করিবে বা মানবে, তাহা নিশ্চিত ছিল না; তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই যে, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত পন্থা অনুসরণ করিয়া রবি-কবির আরও কত মূল্যবান্ (টাকা হিসাবে) সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং সে সকলের গ্রাহকের অভাব নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে গ্রন্থকারের আবির্ভাব যে পাঠকের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। সুনিপুণ শিল্পী যেমন জনগণের রুচিবিকাশে সহায়তা করেন, প্রতিভাবান্ গ্রন্থকারও তেমনই জ্ঞানপিপাসা সৃষ্টি করিয়া তাহা চরিতার্থ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

রুচির কথা বলিতে গিয়া মনে পড়িল, আজকালকার উপন্যাস-

সাহিত্যের কথা। আজ সভ্যতার ইতিহাসে আমরা এক অতি নূতন অধ্যায়ের সহিত পরিচিত হইতে বসিয়াছি সত্য। অনেক বিষয়ে এ অধ্যায়টি আমাদের অতীত সংস্কারজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান আদর্শ অতীত আদর্শকে গলা টিপিয়া বিদায় করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে। নিত্যনূতন আবিষ্কারে আমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। আমি বাল্যকালে যখন কলিকাতায় পড়িতে আসিতাম, তখন বিদ্যুতের আলোক দেখিবার জন্য কতবার গাড়ী ভাড়া করিয়া ইডেন গার্ডেনে ছুটিয়াছি! বেলুন দেখিতে গড়ের মাঠে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। দু'চারটি লোক সেই ভীড়ে খুন-জখম পর্য্যন্ত হইয়াছে। আর আজ! চারিদিকে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে! আমরা এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানাইয়া, ছন্দরক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছি না। তার উপরে টান পড়িতেছে আমাদের চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য লইয়া। সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতার ইতিহাস আমাদের চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্যমূলক সংস্কার গঠন করিয়া দিয়াছে; সহস্র সহস্র বৎসরের নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া একটি জাতির চিত্তবৃত্তি সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধাক্কা দিলে চিত্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে, সংসার-যাত্রা কোনও রূপে চলে না। তাই আহিতাগ্নিক ব্রাহ্মণ যেমন আজীবন অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতে চেষ্টা করেন, আমরাও তেমনই সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলি জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিতে চাহি।

ভালমন্দের বিচার এইরূপ একটি প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। যাহা ভাল, যাহা সৎ, তাহা আমাদের অসন্দিগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। যাহা মন্দ, তাহা হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। যে সাহিত্য এই ভাল-মন্দের বিচার-বুদ্ধিকে বিধ্বস্ত-বিপর্য্যস্ত করিয়া একাকার করিয়া তুলিতে চাহে,

সে বিপ্লবী সাহিত্য সমাজের ঘোর অনিষ্ট করে। মানবজাতি কত দিন বিবাহ-প্রতিষ্ঠানকে বরণ করিয়াছে, তাহা জানা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের উপর সমাজের ভিত্তি প্রোথিত। যে সাহিত্য সেই প্রতিষ্ঠানকে হেলায় লাঞ্ছিত, পদদলিত করিতে উদ্যত হয়, তাহা সাহিত্য নহে, সাহিত্যের ব্যভিচারমাত্র। আজকাল নানা গ্রন্থে এইরূপ বিপ্লবের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বাস্তবতার নামে বিকাইতেছে, কিন্তু ইহা বাস্তবতা নহে, বিভীষিকা। বিকারের ঘোরে যাহা বাস্তব বলিয়া মনে হয়, তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই অনাচারদুষ্ট সাহিত্যও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য হইতে পারে। বিবাহের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়া, ভালমন্দের ভেদ তুলিয়া দিয়া, ন্যায় অন্যায়ের বিবেক বর্জ্জন করিয়া কি বিষবৃক্ষের চাষ করা হইতেছে, তাহা অচিরে আমরা বুঝিতে পারিব। আমি শুনিয়াছি, নারীত্বের অধিকারের নামে অনেক রমণী সতীত্বে জলাঞ্জলি দেওয়া দোষের মনে করেন না। সতীত্ব যদি কথার কথা হয়, সুবিধা বা প্রয়োজনমত যদি উহা উপেক্ষা করা চলে, তবে গৃহের পবিত্রতা রক্ষিত হইবে কি করিয়া? নারীত্ব বা জননীত্বের মর্য্যাদাই বা কেমন করিয়া থাকিবে? মাতৃত্বের মর্য্যাদা না থাকিলে সংসার থাকে না, সংসার না থাকিলে সমাজ থাকে না। কি এক অস্বাভাবিক কুৎসিত অপ্রকৃত উত্তেজনাময়ী মনোবৃত্তির ফলে যে এই সাহিত্য জন্মলাভ করিতেছে এবং জন্মলাভ করিয়া তাহা অত্যল্প সময়মধ্যে বহু ব্যাপ্ত হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জগতের যত কাব্য-কবিতা, যত শিল্প-কল্পনা, তাহাদের মুখ্য অবলম্বন—প্রেম। মনুষ্যজীবনে প্রেমের ন্যায় এমন মধুর আর কিছুই নাই। সৃষ্টির মধ্যে জীবন চমৎকারিত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

জীবনে আবার প্রেমই পরম রমণীয় বস্তু। প্রেম ও কাম—বড়ই কাছাকাছি। প্রেম স্বচ্ছ, কাম মলিন। প্রেম অফুরন্ত মধু, কাম জ্বালাময়ী মদিরা। প্রেম সুন্দর, কাম কুৎসিত। মনোবৃত্তি হিসাবে দুইয়েরই আধিপত্য জীবনে বর্ত্তমান। ' বিশ্লেষণ দুইয়েরই করা যাইতে পারে সাহিত্যে। কিন্তু একের মন্থনে উঠে অমৃত, অপরের মন্থনে উঠে হলাহল। যাঁহারা উপন্যাসে বা কাব্যে মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া মানুষের কদর্য্য দিক্‌টার আবরণ উন্মোচন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা মানব-চরিত্রের মাধুর্য্য আস্বাদনে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। তাঁহারা যাহা খুসী করিতে পারেন বটে, কিন্তু সমাজ ও সাহিত্য তাঁহাদের বিকৃত রুচির প্রভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, মানুষের মন তরল। তরল পদার্থ যেমন পাত্রের আকারে আকারপ্রাপ্ত হয়, মানুষের মনও তেমনি যে ভাব-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত, সেই আকার লাভ করে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-গৌরবে যে ভাববেষ্টনী গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে অবস্থিত মন সেই সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-গৌরবে বিকসিত হয়। পক্ষান্তরে কুৎসিত কদর্য্য কলুষিত বেষ্টনীর মধ্যে যাহার জন্ম, সে পরিণামে তাহারই উপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। অমৃত-হ্রদে পড়িলে মক্ষিকাও মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়।

আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে ভাব-সম্পদ্ পাইয়াছি, একবার তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, আমরা কোথা হইতে কোথায় চলিয়াছি। আমরা যে ভাব-বেষ্টনীর মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছি, তাহা গৌরব করিবার মত। চিন্তা করুন সেই প্রাচীন-কালের কথা, যে সময়ে আমাদের ধ্যানপ্রণতচিত্ত ঋষিগণ উদাত্ত স্বরে উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এমন বাণী আর কেহ কোনও দেশে শুনে নাই। দেশে বিদেশে আজিও সেই বাণী বিদ্বৎকুলচূড়ামণিগণের সসম্ভ্রম

বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। বৌদ্ধ জাতকের গল্প, হিতোপদেশের মত কথা-সাহিত্য আর কোন্ দেশে হইয়াছে? ভাস-কালিদাস-মাঘ-ভবভূতির তুলনা একালে, সেকালে কোনও কালে মিলে কি? আমাদের পুরাণ সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-দর্শনের অকূল পারাবার। অন্য কোনও জাতির মধ্যে এমন একাধারে কাব্য-ইতিহাস-নীতিপূর্ণ বিপুল সাহিত্য আছে কি? রামায়ণ-মহাভারতের মত গ্রন্থ অন্য কোনও জাতির সাহিত্যে পাওয়া যায়? অতি অদ্ভুত মনে হয়। মনে হয়, যেন এই দেশ এবং এই জাতি বিধাতার বিশেষ কৃপালাভ করিয়াছিল। তাহা না হইলে এমনটি হইতে পারিত না।

এই সকল সাহিত্যসম্পদ্ আপনাদের স্মরণপথে আনিয়া দিবার চেষ্টা যে শুধু অতীত লইয়া গৌরব করিবার জন্য, তাহা নহে। আমি জানি, অতীতের গৌরব আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানকে বিসর্জ্জন দেওয়া কোনও ক্রমেই অনুমোদিত হইতে পারে না। আবার বর্ত্তমানকে আলিঙ্গন করিয়া অতীতকে তুচ্ছ করাও যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমানের দৈন্যকে অতীতের গৌরবে ঢাকিতে চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। বরং সেই গৌরবের উজ্জ্বল আলোকে বর্ত্তমান দৈন্য আত্মপ্রকাশ করে শতগুণ নগ্নভাবে। আমার বক্তব্য এই যে, অতীতের ইতিহাস বর্ত্তমানের পথপ্রদর্শক। কঃ পন্থা? এই প্রশ্ন মনে হইলেই স্বতঃই ভাবিতে ইচ্ছা করে, কুতঃ আয়াতঃ? কোথা হইতে আসিলে? আমরা যে পথ অতিবাহিত করিয়া আসিলাম, তাহা হইতে কি সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথের কোনও সন্ধানই পাইতে পারি না? যে পথে চলিয়া এককালে সিদ্ধির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছি, সে পথ কি একটি অন্ধ গলি মাত্র? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমাদের জাতির স্বভাবজ প্রতিভা ঐ অতীত

সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা সে সাহিত্যের ইঙ্গিত যদি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারি, তবে আমরা বিশ্বের হাটে হট্টগোলের মধ্যে পড়িয়া যাইব, ইহা নিশ্চিত।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, আমাদের সাহিত্য কিন্তু প্রদীপ-হস্তে ব্রতচারিণী গৈরিকবসনা ধাত্রীর ন্যায় মন্দিরের আঁধার কক্ষে পথ দেখাইবার জন্য সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফিরিতেছে। কিন্তু আমরা মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া যদি পার্শ্বের পয়োনালার মধ্যে পতিত হই, সে আমাদের অদৃষ্টের দোষে ব্যতীত আর কি বলিব? যাহা আছে, তাহাই থাকিবে, কেন না, তাহার প্রাণশক্তি আছে। আর উত্তেজনার বশে যাহা হঠাৎ আবির্ভূত হয়, তাহা তুবড়ির মত নিঃশেষে জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবেই। যে সাহিত্য এত দিন টিকিয়া আছে, তাহার জীবন কোন অদৃশ্য সোনার কৌটায় রক্ষিত আছে, তাহা প্রণিধানের বিষয় নহে কি? এই মর-জগতে অনিত্য নশ্বর পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতেই আমরা ব্যস্ত। দু'দিনের সম্বন্ধ দু'দিনেই চুকিয়া যায়। কিন্তু যাহা নিত্য শাশ্বত সনাতন, তাহা এমন শীঘ্র মিলাইয়া যায় না। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে এই সন্ধানটুকু বোধ হয় পাওয়া যায় যে, যাহা অবিনশ্বর সত্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাই আছে জীবন্ত। আর যত কিছু সব বুদ্‌বুদের মত দুদণ্ডের হাসি-কান্না লইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত কোন্ সাহিত্য পুস্তকের প্রতিষ্ঠা? ভগবদ্‌গীতা। বাঙ্গালীই হই আর আসামীই হই, গুজরাটী হই আর মারহাটী হই, আমাদের বক্ষের ধন ভগবদ্‌গীতা, শিক্ষার বাহন রামায়ণ-মহাভারত, আদরের সামগ্রী চৈতন্য-চরিতামৃত। এমনভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে আর কয়খানি গ্রন্থ? মহাকবি কালিদাস এই সত্য বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অমর কাব্য কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা। মানবের মর্ত্ত্যভূমির

অনেক ঊর্দ্ধে দেবতা বা নরদেবতার লীলা লইয়া তাঁহাদের কল্পনা বিচিত্র বিলাস করিয়াছিল। দেবতার লীলায় মানবতার কারুণ্য ও কোমলতা সঞ্চার করিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিলেন মহাকবি। মনে করুন সেই দৃশ্য—যেখানে উমা পদ্মের বীজের মালা গাঁথিয়া ধ্যানস্থ মহাদেবের পদাঙ্গুষ্ঠে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন! কি সুন্দর! কি মানবিক মধুরতা দেবতার লীলায়! উত্তররাম-চরিতের আলেখ্যদর্শনে ভবভূতি কি অপার্থিব কোমলতা ও করুণা সঞ্চার করিয়াছেন! মহাকবি তুলসীদাসের রামচরিত-মানস অমরতা লাভ করিয়াছে শুধু কবিত্বে নহে, দেবত্বের চিত্রে; অধ্যাত্মিকতার বিকাশে। পরা ভক্তির চিরন্তনী মূর্ত্তি বক্ষে ধরিয়া সে কাব্য অমর হইয়াছে। আগ্রা হইতে বেশী দূরে নয়, সুরদাস যে অমর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা পার্থিব কোনও আখ্যান লইয়া রচিত নহে। নিখিল রসামৃতসিন্ধু সর্ব্ব-কালোপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা তাঁহার সূরসাগরকে অমর মাধুর্য্য দান করিল। আপনারা হয় ত বিদ্যাসুন্দরের নাম করিলে অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু স্মরণ করুন, অমন চটুল রসের কাব্যও স্বাধীনভাবে সাহিত্যে স্থান পায় নাই। রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর। পাছে রুচির অসঙ্গতি-দোষে তাঁহার সাধের কাব্যখানি পরিবর্জ্জিত হয়, এই জন্য তিনি তাঁহার অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে ইহাকে বুনিয়া দিয়াছেন; পরমার্থের সহিত ইহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার বাতাস পাইয়া ইহা আজিও জীবিত আছে। বৈষ্ণব কবিরা যখন নির্জ্জন কুটীরে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া ভজন-সাধনের অন্তরালে লীলারস আস্বাদন করিতেন, তখন তাঁহারা জনসাধারণের কথা ভাবিতেন না। মুদ্রাযন্ত্র তখন পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্করণ জলস্রোতের মত বাহির করিয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হয় নাই। সংবাদপত্র

দেশ-বিদেশে তাহার ঢাক পিটাইয়া দিবার আয়োজনে তখনও নিযুক্ত হয় নাই। তথাপি সেই তালপত্রের কীটদষ্ট কালজীর্ণ অস্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল তাহারা কিসের জোরে? অবিনশ্বর পদার্থ তাহাদের উপজীব্য বলিয়া এখনও তাহারা হাজারে হাজারে বাঁচিয়া আছে। অধিক কি, সেদিনও খৃষ্টান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামচরিত্রের একটি অধ্যায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ী মেঘনাদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সাহিত্যের চিরপ্রবাহশীলা রসধারার মূল প্রপাত কোথায়! কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের অনুকরণে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আখ্যান-বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তাহা না হইলে মহাকাব্য হইত না। স্বীকার করি, কিন্তু ব্রজাঙ্গনায় তাঁহাকে পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কে বলিয়াছিল? ভাবিয়া দেখুন, ব্রজাঙ্গনা এত মধুরতা কোথায় পাইল? সাহিত্য কি অপূর্ব্ব ভাবধারার প্রেরণা পাইলে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে! আবর্জ্জনারাশি স্তূপীকৃত করিয়া আমরা যদি মনে করি যে, বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহা হইলে আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিমাপ আরাবল্লী পর্ব্বতেও করিতে পারিবে না।*

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর নবম (আগ্রা) অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমি কয়েক দিন উড়িষ্যায় একটি গণ্ডগ্রামে অতিথিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম। এক দিন রাত্রে সেই পল্লীতে কীর্ত্তনের কোলাহল শুনিতে পাইলাম।—কোলাহল বলিলাম—কেননা, তাহাতে সঙ্গীত অপেক্ষা চীৎকারই ছিল বেশী। উড়িষ্যার প্রত্যেক পল্লীতে একটি করিয়া 'যাতঘর-অ' অর্থাৎ সাধারণ বৈঠকখানা গোছের থাকে। সেইরূপ একটি যাতঘরে উড়িয়ারা মিলিয়া কীর্ত্তনানন্দ করিতেছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা পদাবলী গীত হইতেছে, স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। উচ্চারণের দোষে স্থানে স্থানে অবোধ্য হইলেও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি মিশ্রিত পদগুলি কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনেক দিন উড়িষ্যায় অবস্থান করিয়া, সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রোত বহাইয়াছিলেন তাহা জানিলেও, ঐ ঘটনার পাঁচ শত বর্ষ পরেও উড়িয়ারা অবিকল বাঙ্গালা পদকর্ত্তাদিগের গীত গায়িতেছে, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। আর এক দিন সমুদ্রতীরে বসিয়া এক মান্দ্রাজী বৈষ্ণবের মুখে সুন্দর সুরতান-লয়ে গীতগোবিন্দের কয়েক পদ শুনিয়াও আমি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম।

বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ। বাঙ্গালার কবি বাঙ্গালীর প্রাণের সহিত সুর মিলাইয়া প্রায় ছয় সাত শতাব্দী ধরিয়া এই পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাই আমাদের নিকট বৈষ্ণব পদ এত প্রিয়। বাঙ্গালী বৈষ্ণবই হউন, আর ব্রাহ্মই হউন, শাক্তই হউন, আর শৈবই হউন, এমন কি, বাঙ্গালী মুসলমান পর্য্যন্ত পদাবলীর

মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েন। যে রঙ্গিন কাচ দিয়া বাঙ্গালী তাহার এই কাব্য জগতের শোভা দেখিত, সে কাচ অনেক দিন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে; আমরা আর তেমন করিয়া "যমুনা-জলকূলে মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে" উপভোগ করিতে পারি না; কিন্তু তবুও পদাবলীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্য যেন কেমন এক মোহময় প্রপাত আমাদের জীবনে আজিও ছুটাইয়া দেয়, যাহার অনির্ব্বচনীয় রস-নিঃসেকে আমাদের মন-প্রাণ পরিপ্লুত হইয়া উঠে। এরূপ একটি বিচিত্র বিপুল পদ্য-সাহিত্য কোনও জাতির কোনও ভাষায় আছে বলিয়া আমি জানি না।

পদাবলী সাহিত্য যে কত বড়, তাহা কিছু দিন পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল না। কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে মুখে যে কতিপয় পদ চলিত, বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে সাধারণতঃ তাহাই বুঝাইত। কিন্তু কয়েক জন মনস্বী অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির চেষ্টায় আমাদের গৌরবের সম্পদ্ বাঙ্গালীর লুপ্ত রত্নরাজির উদ্ধার হইতেছে। ইহাঁদের মধ্যে জগদ্বন্ধু ভদ্র, গ্রিয়ার্সন সাহেব, অক্ষয়চন্দ্র সরকার রমণীমোহন মল্লিক, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বটতলার প্রেস্ এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অশেষ উপকার করিয়াছে। আমরা কিন্তু তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার কোনও ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। বটতলার প্রেস বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়াছে তাহার জন্য, আমার মনে হয়, কোনও স্মৃতিনিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বৈষ্ণব কবিতার সংগ্রহ-বিষয়ে যাঁহারা যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সম্যক্ সমাদর এখনও হয় নাই। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কীর্ত্তন-গায়কদিগের পরম্পরানুশ্রুত পদাবলী এরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহার পাঠোদ্ধার এবং অর্থ-পরিগ্রহ বহু শ্রম ও পাণ্ডিত্য-সাপেক্ষ হইয়া

পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা অধ্যবসায় সহকারে বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালীর ঋণ অপরিশোধনীয়।

বৈষ্ণব কবিতার সংগ্রহের চেষ্টা নূতন নহে। বহু দিন হইতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন। এইরূপ সংকলন-পুথি অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে,—নিমানন্দ দাসের পদরসসার, কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকর, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু প্রভৃতি এই জাতীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় অনেকগুলি সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের পদাবলী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের বিদ্যাপতি, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাস, শ্রীপদকল্পতরু, গৌরপদতরঙ্গিণী, দেবকীনন্দন প্রেসের ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার বিশ্বাস, এইরূপ সংগ্রহ-পুথি আরও অনেক আছে এবং চেষ্টা করিলে এখনও অনেক মহাজন-পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইহাতে শুধু যে আমাদের কাব্য-সম্পদ বাড়িবে, তাহা নহে, অনেক দুর্ব্বোধ ও বিকৃত পাঠের পঙ্কোদ্ধার হইবে। এই সম্বন্ধে আর একটি জটিল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। যাঁহারা পদাবলী-সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, প্রায় সকল পদেই পদকর্ত্তার ভণিতা থাকে। এই ভণিতা দিবার পদ্ধতি যে বাঙ্গালা প্রাচীন কবিগণের গানে ও কবিতায় কোথা হইতে আসিল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। অন্য কোনও দেশের কবিতায় কিংবা আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত কবিতায় এরূপ প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাই না। হিন্দুস্থানী পদাবলীতে সুরদাস, তুলসীদাসের ভণিতা দিবার

প্রথা আছে। আর আমাদের অঞ্চলের বৌদ্ধ দোহাবলীতে এই-রূপ রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য ইতিহাসের অন্ধকারময় বর্ম্মে এই ভণিতা যে আলোক নিক্ষেপ করে, তাহা অমূল্য; কিন্তু এই ভণিতার প্রলোভনে পড়িয়া কত যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। রামের পদ শ্যামের স্কন্ধে চাপিয়াছে, এরূপ ঘটনা ত সাধারণ। উপরন্তু 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' ব্যক্তিও কোনও পূর্ব্বসূরির আশ্রয় লইয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে এমন গোলযোগ ঘটিয়াছে যে, বিদ্যাপতি একাধিক ছিলেন, চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন, ইত্যাদি নানা অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনার সাহায্য লইয়া বৈষ্ণব কবিতার স্বরূপ বুঝিতে হয়। এইরূপ জটিল বিষয়ের স্থির মীমাংসা কখনও সম্ভবপর কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু পদাবলীর পুথি বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইলে হয়ত হইতেও পারে।

পদাবলী যত দূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্য বাহ্য প্রমাণাভাবে পদকর্ত্তৃগণের পারম্পর্য্য নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ সম্বন্ধে যত দূর জানা যায়, তাহাতে জয়দেবই পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে আদি কবি। জয়দেবের কবিতা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ইঁহারও পূর্ব্বে একটি পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছিল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালী কবি জয়দেব তাঁহার সংস্কৃত কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কেবল আমার কল্পনা-মাত্র। গীতগোবিন্দের আরম্ভ ও বস্তু-নির্দ্দেশ দেখিলেই যেন মনে হয় যে, পুরাণের কাহিনী অপেক্ষাও নিকটতর, কোনও প্রচলিত, সাধারণের সুবোধ্য ও চিরপরিচিত আখ্যান লইয়া তিনি তাঁহার 'কোমলকান্ত পদাবলী' রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়দেবের পূর্ব্বের কোনও পদাবলীর সন্ধান আমরা রাখি না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে 'বৌদ্ধগান ও

দোহা' সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় দোহাগুলিকে 'পদাবলী' সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং সেগুলিকে তিনি 'সংকীর্ত্তন' বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বৌদ্ধেরা গান গায়িতেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা বাঙ্গালা পয়ারছন্দে গীত রচনা করিতেন, ইহা স্বীকার না করিবার কারণ দেখা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধগান, গাথা এবং দোহাগুলি বৈষ্ণব পদাবলী হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, উভয়কে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া প্রচলিত সংজ্ঞার বিপর্য্যয় ঘটানো সঙ্গত বোধ হয় না। উভয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে তাহার সম্বন্ধে আমি পরে আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি ছিলেন, সুতরাং কিঞ্চিদধিক সাত শত বৎসর পূর্ব্বে গীতগোবিন্দের কবিতাবলী রচিত হইয়াছিল। তার পরে বিদ্যাপতি, প্রথম 'ভাষায়' পদাবলী রচনা করিলেন। বিদ্যাপতির কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক এবং তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ চলিত আছে, তাহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ বলিয়াই মনে হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মৈথিলকোকিল তাঁহার পঞ্চম তানে বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জ ধ্বনিত করিয়াছিলেন। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার মাতৃদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফিরিয়া আসেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য ভাবে গদগদচিত্তে বিদ্যাপতির একটি পদের কিয়দংশ আবৃত্তি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন,—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে সময়ে বিদ্যাপতির কবিতা সমধিক প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাও আমরা জানি যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীগৌরাঙ্গের বড় প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় ভক্তগণের সঙ্গে ইহাঁদের পদাবলী গান করিতে করিতে বিভোর হইয়া যাইতেন। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' নামক যে গীতিপুস্তক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অদ্ভুত নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষজ্ঞগণের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত। সুতরাং চণ্ডীদাসের কবিতাও বাঙ্গালীর মনোরাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, সেও প্রায় ছয় শত বছরের কথা। চণ্ডীদাসের অনেকগুলি কবিতায় জয়দেবের অনুকরণ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস কতকগুলি পদ সংস্কৃতেও রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, চণ্ডীদাস কবিত্ব হিসাবে জয়দেবকে অতিক্রম করিলেও, গীতগোবিন্দই তাঁহার কবিতার মূল প্রস্রবণস্বরূপ ছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতা যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা তৎকালের সাহিত্য হইতেই জানিতে পারি,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥—চৈতন্যচরিতামৃত,
মধ্যলীলা।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥
—ঐ, মধ্যলীলা।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরই গোবিন্দদাসের ও জ্ঞানদাসের পদাবলী আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস প্রায় সমসাময়িক লোক বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের পরবর্ত্তী লোক। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য। অতএব ইনি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালের বহু পরবর্ত্তী নহেন। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যেরূপ ভাবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের কবিতায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের পরেই বলরামদাসের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এ স্থলেও আমাদের সংশয়ের অন্ত নাই; কারণ অনেক-গুলি পদকর্ত্তার পদ বলরামদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে।

এই সকল প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ব্যতীত আরও অনেকগুলি পদকর্ত্তা আছেন, যাঁহাদের অতুলনীয় কবিত্ব-মাধুর্য্যরসে বঙ্গবাসীর মন অভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের সকলের নাম করা এ স্থলে সম্ভবপর নহে, তবে প্রচলিত কীর্ত্তন-সঙ্গীতে ঘনশ্যামদাস নরোত্তমদাস, লোচনদাস, যদুনন্দন, জগদানন্দ, বংশীবদন, চন্দ্রশেখর শশিশেখর, অনন্তদাস প্রভৃতির নামের সহিত আমরা সুপরিচিত। এই সকল কবি-মহাজন সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানিবার উপায় নাই। ইতিহাস ইঁহাদের জীবনী সযত্নে রক্ষা করে নাই। সমসাময়িক সাহিত্যও ইহাঁদের দুন্দুভি বাজাইয়া বড় একটা গৌরব করে নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। দুই একজন পদকর্ত্তার সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যথা—স্বয়ং শ্রীভগবান জয়দেবের হইয়া তাঁহার কবিতার পাদপূরণ করিয়াছিলেন; জগন্মাতা বাশুলী 'চাপড় মারিয়া' চণ্ডীদাসের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে সহজ ধর্ম্ম প্রচারে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তীর সংখ্যাও বেশী নহে। সুতরাং অনেক স্থলেই বৈষ্ণব কবিদিগের পরিচয় একমাত্র

তাঁহাদের পদাবলী। তাঁহারা তাহাদের রচিত পদাবলীতেই অমর হইয়া গিয়াছেন।

বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি সরল সহজ, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কেমন করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। আমার মনে হয় যে, আমাদের পুরাণ, দর্শন ও কাব্যের মধ্যে কোনও বিষয় আমাদিগকে তেমন অভিভূত করিয়া ফেলে নাই, যেমন এই বৈষ্ণব পদাবলী করিয়াছে। সমাজের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই কবিতার প্রভাব অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, ইহার তুলনা জগতের কোনও সাহিত্যে কোনও ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরাতন পদগুলির মধ্যে যেন কোনও যাদুমন্ত্রে চিরনবীনতা স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। চির 'নওল কিশোর কিশোরী'র আখ্যায়িকা যেন পুরাতন হইতে চাহে না। একবার যাহার মন-মধুপ বৈষ্ণব কাব্যকুসুমের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে "তহিঁ রহি গতি মতি খোই"—গতি মতি খোয়াইয়া সে তাহাতেই মজিয়া গিয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান যুগের কবিদিগের মধ্যেও সেই পুরাতন বৈষ্ণব কবিতার গীতিচ্ছন্দ নানা ভাবে, নানা ভঙ্গে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক কবিশ্রেষ্ঠ রবিবাবুর কবিতাই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, দেবেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, নবীন সেনের রৈবতক কুরুক্ষেত্রে সেই পুরাতন সুরেরই মীড়মূর্চ্ছনা আমাদের কানে বাজে। গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথি রায়, মধু কান এই কীর্ত্তনের প্রসাদেই আসরে পসার জমাইয়াছিলেন। এখনও আমাদের পাঁচালী ও থিয়েটারে, যাত্রা ও কথকতায় কীর্ত্তনের পদ, কীর্ত্তনের ভঙ্গী, কীর্ত্তনের রস, কীর্ত্তনের সুর বহুল পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য পেশাদারী

কীর্ত্তনের আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। সুরের জটিলতার জন্যই হউক বা গায়ক বাবাজীদিগের আড়ম্বর ও অভিমানের জন্যই হউক, প্রকৃত কীর্ত্তনের মর্য্যাদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন কীর্ত্তনের স্থলে ঢপ্ কীর্ত্তনের আমদানী হইয়াছে। আমরাও তাহার যোগ্য সমজদার,—কীর্ত্তনকে আদ্য শ্রাদ্ধে লাগাইয়াছি। ইহাতে অবশ্য আমাদের আদ্য শ্রাদ্ধ এবং কীর্ত্তনের আদ্য শ্রাদ্ধ, উভয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধ-বাসরের পূর্ব্বাহ্নে কীর্ত্তনের আসর হয়, তাহাতে হয় কোনও বাবাজী, না হয় কোনও নানাভরণ-ভূষিতা নর্ত্তকী কীর্ত্তন করেন। গৌরচন্দ্রিকার 'কচকচি' চুকিয়া গেলে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে সুরু করেন এবং কিছুক্ষণ এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া গৃহস্বামীর সহিত চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র একটি রজতখণ্ড গায়ক বা গায়িকার হস্তে দিয়া প্রস্থান করেন। সে সময় হয়ত গায়ক পদ ধরিয়াছে,—

খেনে খেনে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেনে খেনে হরিমুখ চাহ।
খেনে খেনে মনহি করত জানি ঐছন
নাহ সঞে জীবন যাহ॥

অক্রূরের রথে চড়িয়া মাধব মধুপুরে গমন করিতেছেন, আর শ্রীমতী সেই রথের আগে আছাড়িয়া পড়িতেছেন, জীবন যেন জীবিতনাথের সঙ্গে বাহিরিয়া যাইতে চাহিতেছে। আবার উঠিয়া,—

খেনে মুখে তৃণ ধরি রামক আগুসারি
আছাড়ি পড়য়ে নিজ অঙ্গে।
খেনে পুন মূরছই খেনে পুন উঠই
ডুবল বিরহ তরঙ্গে॥

রাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; আর অক্রুর—'ক্রুর নাহি যার সম'—রথ লইয়া 'কঅল পয়ান'। ইহার পূর্ব্বেই কিন্তু আমাদের বাবুরাও 'কঅল পয়ান।' সুতরাং গায়ক যে কি পদ গাহেন, তাহা প্রণিধান করিয়া বুঝিবার লোক-সংখ্যা বিরল। অথচ এই পদাবলী সম্বন্ধে একজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"কোনও ইংরেজ পরিবারে বাইবেলের যেমন আদর, বৈষ্ণব পদাবলীর তেমনি আদর বাঙ্গালীর গৃহে।"

আমার মনে হয়, বৈষ্ণব কবিতার সুপ্রচুর সমাদর হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালীর এমন নিজস্ব সম্পত্তি খুব কমই আছে, বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন আর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই; বাঙ্গালীর জীবন-যন্ত্রের সমস্ত কোমল পর্দ্দাগুলি এমন আর কোথাও পরিস্ফুট হইয়া বাজে নাই। বৈষ্ণব কবিতা আমাদের ভাষাকে গঠন করিয়াছে, ইহাকে বেদনা-প্রকাশের অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছে —বৈষ্ণব কবিতা আমাদের হৃদয়-কাননে ভাবের কুসুম-সম্ভার ফুটাইয়াছে—এক কথায় বৈষ্ণব কবিতা আমাদের নিমাইকে আনিয়া, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, আমাদের জন্ম ধন্য করিয়াছে। সেই জন্যই বৈষ্ণব কবিতার অনুশীলন ও বহুল পরিচয় বাঞ্ছনীয়।

বঙ্কিমবাবু বহু দিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার "জল-বায়ুর গুণে আর্য্যদিগের স্বাভাবিক তেজ যখন লুপ্ত হইতে লাগিল, তখন এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহ-সুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত গৃহ-সুখ-পরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতি-প্রণয়ের শেষ পরিচয়। এই জাতিচরিত্রানুকারিণী (?) গীতি-কাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।"

বৈষ্ণব কবিতার সমালোচনা বঙ্কিমবাবুর পরে আর বড় অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যে বিলাস-পরায়ণতা, যে কামপ্রবণতা দেখিয়াছেন, আমরাও এ পর্য্যন্ত তাহা বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। যিনি ভক্ত, যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম অপ্রাকৃত নায়ক- নায়িকার ইন্দ্রিয়বিলাসশূন্য মধুর লীলা বলিয়া গণনা করেন, তিনি এই প্রকার সমালোচনায় কর্ণপাত করেন না।

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করি এ শ্রবণগোচরে।

তিনি মনে করেন, আমার ভগবানের প্রেমলীলা, যাহা আমি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুক্ষণ ধ্যান করিয়া কৃতকৃতার্থ হই, তাহার সম্বন্ধে অন্যে কে কি বলিল, তাহা আমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সাধারণ লোকে যাহাকে 'মদন-মহোৎসব' বলিয়া মনে করেন, বৈষ্ণব তাহাকে পরম আদরের সহিত মধুর হইতেও মধুরতম মনে করিয়া ধ্যান করেন। এই জন্য যে বিপ্লব, বাদানু-বাদ বা রক্তপাত হয় না, তাহার কারণ, বৈষ্ণব ভক্ত-সম্প্রদায় চিরদিনই নিরীহ, শান্ত, চিন্তাশীল ও সহিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত। এক সময়ে বৈষ্ণবদিগের উপর অনেক অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে অনেক স্থলে হিংসার চোখে দেখেন। কিন্তু তথাপি এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নির্ব্বাক্ ক্ষমাশীলতার সহিত সর্ব্বপ্রকার মত-বৈষম্য ও সামাজিক নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া ধীরভাবে তাঁহাদের সাধন-ভজন প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও কপটাচার, ভণ্ডামী, তিলকমালার প্রাচুর্য্যময় ভক্তিহীনতা যথেষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রতিষ্ঠাপিত ভক্তি-প্রাণ সামাজকে অবনতির নিম্নতম

স্তরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে অবনতি ও দুর্গতির অপ্রীতিকর অধ্যায় ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ বৈষ্ণব-তত্ত্ব সম্বন্ধেও হিন্দু সমাজের অনুদারতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

এক্ষণে আর একটি ধুয়া উঠিয়াছে, সেটি আরও ভয়াবহ। আমরা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৌদ্ধ মহাযানের সহজপন্থা হইতে ভিন্ন নহে। রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা আমরা বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রেমের ভিতর দিয়া, স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগের ভিতর দিয়া যে ভগবানের উপাসনা, ইহা হিন্দু ধর্ম্মের নিজস্ব নহে। ইহাতে অন্ততঃ বৌদ্ধদিগের গোপন সাধন-প্রণালীর পরিস্ফুট মুদ্রাঙ্ক রহিয়াছে। সহজযানের মতে যে মহাসুখবাদ, তাহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সহজিয়াদিগের মতে যোষিৎসুখই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ, এই সুখের অনুশীলন সর্ব্বথা স্পৃহনীয়। এইরূপ ইন্দ্রিয়-সুখ হইতেই ক্রমে নির্ব্বাণলাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখের আকর—পরকীয়া-তত্ত্ব অর্থাৎ পরস্ত্রী-সঙ্গ হইতেই এই সুখ বহুল পরিমাণে জন্মে, অতএব পরকীয়া-তত্ত্ব দূষণীয় নহে।

বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে যে পরকীয়া রতি রহিয়াছে, তাহা নাকি সহজিয়ারাই প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। বৈষ্ণবেরা সেই পরকীয়া-তত্ত্ব অবাধে গ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপ একটি মতবাদ পরিস্ফুট বা অর্দ্ধপরিস্ফুটভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় ক্রমশঃ স্থান লাভ করিতেছে। আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে এইরূপ একটি অদ্ভুত মতবাদ গ্রহণ করিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, যদি ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কামুকতার চরম অভিব্যক্তি, সহজ-যানের ভজন-প্রণালীর সহিত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের কোনও সম্বন্ধ আছে, তবে ইহাকে বিষাক্ত ব্রণ-স্বরূপ মনে

করিয়া, ইহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিতে যদি আমাদের সমাজের অঙ্গচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়, তাহাও করা কর্ত্তব্য।

আমার কিন্তু মনে হয় যে, যে দেশে সীতা সাবিত্রীর নির্ম্মল আদর্শ রমণী-সমাজে জনপ্রবাদে বাহিত হইয়া বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, যে একমাত্র দেশে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ইহকালের সমস্ত সুখশান্তি-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন, সে দেশে সাত আট শত বৎসর ধরিয়া কামাতুর নায়ক-নায়িকার সম্ভোগোপভোগের চর্ব্বিতচর্ব্বণে একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের উদ্ভব হইল, ইহা উদ্ভট কল্পনা। প্রেম-সারসর্ব্বস্ব বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে অনেক আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে, ইহা সত্য। বঙ্গে বৌদ্ধ-প্রভাব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইহা হইতেই সহজ-যান, তান্ত্রিক পঞ্চম-কার প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নানা আকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মতত্ত্বের সারভূত রাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনা যে সহজ-যানের কামপরতন্ত্রতার দ্বারা প্রভাবিত, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। অন্ততঃ ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে এমন একটা দুরপনেয় কলঙ্ক থাকিলে, তাহা কখনই সাধারণের মনের উপর এরূপ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইত না।

আমরা সাহিত্য হিসাবে পদাবলীর সমালোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু পদাবলী কেবল সাহিত্য নহে। ভাষাতত্ত্বের অথবা ইতিহাসের উপাদান জোগাইবার জন্যও ইহা লিখিত হয় নাই। নৈষধচরিত বা শিশুপালবধের মত কাব্য হিসাবে ইহা সমাজে কোনও দিন আদৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; লক্ষ্মণসেনের রাজকীয় দরবারে গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এ জন্য কাব্য-রসামোদী পণ্ডিতগণ

ইহার খোঁজ রাখিতেন বটে। কিন্তু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস বা লোচনদাস কোন দিন এ সম্মান পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহাঁদের কবিতা গীতাত্মিকা, গায়কের মুখেই এগুলি বিচরণ করিত। তাহাও আবার যে সে গায়ক নহে; বৈষ্ণব ভক্ত গায়ক আহ্নিকের মত নিত্য ভজনের অঙ্গ হিসাবে পদাবলী গান করিতেন। ভক্তেরা মালা ফিরাইতে ফিরাইতে এ গান শুনিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের সাধন ভজন, তপ জপ, সন্ধ্যা আহ্নিক, সকলই এই পদাবলীর দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। মহাপ্রভু দিন রাত্রি যে এই পদাবলীর আলোচনায় মুগ্ধ থাকিতেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে লীলা-রস আস্বাদন॥

অন্তরঙ্গ নহিলে, ভক্ত নহিলে, লীলারস-কীর্ত্তন অনুচিত। নামসঙ্কীর্ত্তন ও রস-কীর্ত্তনের মধ্যে প্রভেদ অনেক। নাম সংকীর্ত্তনে প্রার্থনা আছে, কামনা আছে, অন্তরের বেদনার নিবেদন আছে। ভগবান্, আমাকে দয়া কর, আমি অকৃতি অভাজন, তুমি অগতির গতি, জীবের একমাত্র শরণ, তুমি কৃপা কর। আমরা পাপে ডুবিয়া রহিয়াছি, হে হরি, জগতের ত্রাণকর্ত্তা তুমি, শরণ্য তুমি, তুমি আমাকে তুলিয়া লইয়া চরণে স্থান দান কর। আমার ভক্তি নাই, আমি ভজন-পূজন কিছুই জানি না, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিব, তুমি দয়ার অনন্ত সাগর, আমাকে উদ্ধার করিও; শেষের দিন, যখন আমার সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়িবে, সে দিন তুমি দেখা দিও ইত্যাদি। এইরূপ প্রার্থনা, নিবেদন এবং স্তুতির নাম—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ভগবানের নাম ও স্তুতি এবং পদকর্ত্তা বা গায়কের দৈন্যসূচক বাক্য থাকে।

রসকীর্ত্তনে প্রায়ই এ সকল কিছুই থাকে না। রস-প্রধান পদাবলীই রসকীর্ত্তনের বিষয়। রস অর্থে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

রসকীর্ত্তনের একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার এই যে, ভগবৎপ্রেম রসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। 'অপূর্ব্ব ব্যাপার' কেন বলিলাম, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ভগবান্‌কে ঈশ্বর-জ্ঞানে যে ভজন-প্রণালী, তাহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। আমরা জীব সসীম, জগতের ধূলিকণা মাত্র। ভগবান্ অনন্ত, অসীম, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের পরমাশ্রয়। ন্যায়ের, ধর্ম্মের, সত্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। আমরা পাপে গঠিত, অধর্ম্মে পতিত, অধম জীব। ইহাই ত বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্মতত্ত্বের মূল সূত্র। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোথা হইতে যে এক অভিনব ধর্ম্মতত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী ভগবানের মুখে এই ধর্ম্মতত্ত্বের সার কথাগুলি দিয়াছেন,—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাইয়া॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥

বেদান্তের নীরস পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের স্রোত এক নূতন পন্থায় প্রবাহিত হইল—তাহার নাম প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের প্রধান সাধন-অনুভূতি। জ্ঞানের দ্বারা সত্যের সাক্ষাৎকার হয়, ঈশ্বরের তত্ত্ব বা সত্তা বুঝিতে পারাও যায়। তার ফলে মুক্তি বা মোক্ষপদ লাভ হইতে পারে বটে;

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ কল্পবৃক্ষের নিকটে ভক্ত সে ফল কামনা করেন না। মোক্ষের কথা দূরে থাক, "মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" চরিতামৃত বলেন,—

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ-বাঞ্ছা এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের চিন্তাপ্রণালী এই বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবেন না।

মোর পিতা মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই করে মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনারে বড় ভাবে আমাকে সম হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহারি অধীন॥—চৈতন্য-চরিতামৃত।

ভক্ত কখনও নন্দ বা যশোদার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার দুলাল পুত্রটিকে বক্ষে ধারণ করেন, শাসন করেন, পায়ে যাহাতে কুশাঙ্কুর না ফোটে, তাহার জন্য অনুক্ষণ সজল নয়নে তাহাকে অনুসরণ করেন, গোষ্ঠে যাইতে দিতে হইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়; যদি কোনও রূপে গোষ্ঠে পাঠাইতে হয়. তাহা হইলে সারাটি বেলা গোপালের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন। ভক্ত কখনও রাখালের ভাবে ভাবিত হইয়া, কৃষ্ণ-সখার সঙ্গে খেলা করেন, তাঁহাকে কাঁধে চড়াইয়া চড়িয়া, উচ্ছিষ্ট মিষ্ট ফলের একটুকু খাইতে দিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। রাখালেরা যেমন খেলা সাঙ্গ করিয়া, স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া, কানাই কানাই করিয়া ব্যস্ত হইত, তাহারা যেমন মাতৃকোলে ঘুমাইয়াও কানাই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত, ভক্তও তেমনি সখ্যভাবে ভগবান্‌কে লইয়া সারা দিন বিবিধ খেলা

খেলেন এবং যদি কখনও সংসারে লিপ্ত থাকিতে হয়, তার মাঝেও কানাই কানাই বলিয়া তাঁহার নয়নে শতধারা বহে।

সকল রসের সার মাধুর্য্যরস। মধুর রসের রসিক, ভগবান্‌কে পতি-ভাবে ভজনা করেন। নায়িকা যেমন নায়কের রূপ দেখিয়াই আত্মবিস্মৃত হয়, যেমন ব্যাকুলতার সহিত নায়কের সঙ্গে মিলন কামনা করে, বিরহে যেমন কাতর হয়, ভক্তও তেমনি ভগবানে তনু-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া, ভগবানের রূপমাধুরী আস্বাদন করেন, সেই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে সকল আনন্দ, সকল সুখের আকর জানিয়া, তাঁহাতেই একান্ত নিষ্ঠার সহিত মগ্ন হইয়া থাকেন। মিলনে তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, বিরহে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ। যেহেতু মিলন অপেক্ষা বিরহের ভাবই ভক্তির অধিকতর উৎকর্ষবিধায়ক, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব পত্নীভাবে না ভজনা করিয়া পরতন্ত্রা রমণীভাবে ভজনা করেন। কবিরাজ গোস্বামী এই মধুর রসের কথা কহিতে গিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন,—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

বৃদ্ধ গোস্বামী প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই পরকীয়া-তত্ত্ব সকলে নির্ম্মলভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই জন্য তিনি স্পষ্টাক্ষরে পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—

কাম প্রেমে দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও এই মহাভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন। যিনি রমণীর প্রেমলিপ্সা দূরে থাকুক, নারীর মুখ

দর্শন করা অপরাধে নিজ প্রিয়-শিষ্যকে নির্ব্বাসন করিলেন, তিনি কি উচ্ছৃঙ্খল পরকীয়া-তত্ত্ব সমর্থন করিবেন? এমন ত মনে হয় না।

এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে রাধাভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই। তিনি যে কৃষ্ণ বলিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, কৃষ্ণের উপর মান করিয়া বসিতেন, তাঁহার চিন্ময় রূপ দেখিয়া ভাবে গদগদ হইয়া ধরিতে ছুটিতেন, ইহার মধ্যে ভক্তিভাবের পূর্ণ লক্ষণ-সকল ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহার সংসার-ত্যাগ, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার আবেশ—সকল ভাবেতেই বিরহের সুর বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-জীবনে, আমার বোধ হয়, স্থায়ী ভাব বিরহ। সকল ধর্ম্মের মূল আকাঙ্ক্ষা অসীমের সহিত সসীমের মিলন। সেই মূল আকাঙ্ক্ষাটি শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে এক বিশ্বজনীনতা আনিয়া দিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে বিরহের মর্ম্মস্পর্শী বেদনাই ধ্বনিত হইয়াছে। এই বিরহ বাদ দিলে বৈষ্ণবপদাবলীর মূল্য অনেক নামিয়া যায়। কৃষ্ণসখা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, যশোদা বালগোপালের জন্য কাঁদিয়া আকুল, শ্রীমতী প্রিয়তমের রূপ দেখিয়া অবধি পাগল, বাঁশী শুনিয়া অধীরা, 'উজোর' হারে উন্মত্তা,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

স্বকীয়া রতিতে এ প্রকার আকুলতা কিছু বাড়াবাড়ির মত শুনায়। প্রাগ্‌বৈবাহিক প্রেমে এমনটা কদাচিৎ হইলেও, মিলনের পর আর এরূপ অনুরাগের উৎকট অবস্থা থাকে না। সেই জন্যই পরকীয়া-ভাবের কল্পনা। এ কল্পনায় ব্রহ্মচর্য্য আছে, কামুকতা

নাই। প্রেম আছে, কাম নাই। গৃহত্যাগ আছে, সুখসম্ভোগ নাই। শুদ্ধাচার বৈষ্ণব রমণী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন এবং কৃষ্ণপ্রসঙ্গে কাল কাটাইবেন। ইহা কি ভোগের পন্থা? ইহা হইতে কি সহজিয়ার 'কুলিশারবিন্দ-সংযোগাঙ্কুরের' * কথা মনে পড়ে? যদি স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সম্মিলন তাঁহাদের কামনার বিষয় হইত, বৈষ্ণব কবি বিরহের মধ্য দিয়া এমন ভাবে ভগবান্‌কে পাইতে চেষ্টা করিবেন কেন? শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনায় যদি হেরুকের যুগনদ্ধ মূর্ত্তির আভাস থাকিত, তাহা হইলে বৈষ্ণব ভক্ত তাহার আরাধ্য যুগলের অনুকরণে যুগল-লব্ধ সুখের অনুসরণ করিত। বৈষ্ণব কবিগণ এক বারও ত জীবনে ঐরূপ আচরণের একটি কথাও তুলেন নাই। সত্য বটে, বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় সম্ভোগের বর্ণনা আছে, রাসলীলার কথা আছে, বস্ত্র-হরণের প্রসঙ্গ আছে। কোনও কোনও কবি এই সকল বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সমাজের হিসাবে ইহাকে সমর্থন করা যায় না; করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। ভগবান "যখন ইচ্ছাক্রমে মানব-শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্ম্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্রী এবং তদভিগমন পরদার-পাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন।" †

বঙ্কিমবাবুর মত সমালোচকের অভিমত যখন এই প্রকার, তখন অন্যের পক্ষে ত খট্‌কা লাগিবারই কথা। আমরা জানি,

* বৌদ্ধগান ও দোহা।

† কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নবাব জাফর খাঁর সময়ে এই পরকীয়া-তত্ত্ব লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় হইতে পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়া এই তর্কের বিচার করেন। জয়পুরের মহারাজ সওয়াজি জয়সিংহের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এই বিচারে পরাস্ত হইয়া পরকীয়া-তত্ত্বের জয়পত্র লিখিয়া দিয়া যান। কি যুক্তির বলে তাঁহাকে পরাজিত করা হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা জানি যে, ইহার পূর্ব্বে রাধিকা সম্বন্ধে স্বকীয়া পরকীয়া দ্বিমতই প্রচলিত ছিল। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে পরকীয়াতত্ত্বেই জন্মলাভ করিয়াছিল, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। পরন্তু বৌদ্ধ-সংস্পর্শে আসিয়া স্বকীয়াতত্ত্ব যে পরকীয়াতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন বোধ হয় না। কারণ সহজিয়াদিগের যে পন্থা, তাহা ভোগের পন্থা; তাহারা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা ভোগের দ্বারা চরিতার্থ করিতে চাহে। বৈষ্ণবদিগের পন্থা ধ্যানের পন্থা; রাধাকৃষ্ণের লীলা অনুধ্যান করাই বৈষ্ণবের একমাত্র সাধনা। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বা কোনওরূপ বিলাস-ব্যসন বৈষ্ণবের সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এই জন্য বৈষ্ণবেরা সহজিয়াদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। সহজিয়ারাও তিলক কাটে, মালা গলায় দিয়া সাধন-ভজনের ভাণ করে, সেই জন্যই শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রিবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; সমস্ত বেদবিধি, ধর্ম্মনীতি অগ্রাহ্য করিয়া মুখে 'হরি হরি' বলিলেই হরি কৃপা করেন না; বরং তাহাতে উৎপাতের সৃষ্টি হয়। ইহা বৌদ্ধদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।

পরকীয়া-তত্ত্বে যদি কাহারও মন সন্দেহাকুলিত হয়, তবে

স্বকীয়াভাবে ভজন করিতে বাধা কি আছে? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" সম্ভোগ বা বিহার সম্বন্ধে যে সকল পদ আছে, তাহা তোমার আমার ভাল না লাগিতে পারে। অশ্লীলতা মনে হয়, সেগুলিকে পরিহার করিয়া, অন্য ভাবসম্বলিত পদ গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব কবির প্রাপ্য মর্য্যাদা তাঁহাদিগকে দিতে ত বাধা নাই। ভাগবতাদি পুরাণের দোহাই দিয়া, কাহারও ধারণা বদলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এমন আমার বিশ্বাস হয় না। যে সকল ভক্ত পুরাণাদির অভ্রান্ততা মানেন, তাঁহাদের নিকট কোনও যুক্তির প্রয়োজন নাই। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলাকে প্রত্যক্ষবৎ মনে করেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ধ্যানযোগে এই লীলা প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং তর্ক দূরে রহুক। আমি অনেক বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি, তথাকথিত অশ্লীলতাদোষদুষ্ট পদগুলি গাহিতে গাহিতে পুলকাশ্রুপরিপূর্ণলোচনে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, বৃদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তগণ নিশীথে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, নিতান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গে এই সকল পদ গাহিয়া ও শুনিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু মোচন করেন। সকলে সকল বিষয়ের অধিকারী নহে; সুতরাং এক জনের নিকট যাহা আদরণীয়, অপরের পক্ষে তাহা বর্জ্জনীয়, এ নিয়ম ত সর্ব্বত্র খাটে!

সকল ধর্ম্মেই anthropomorphism বা মানবিকতা আছে। কিন্তু এই মানবিক ভাব বৈষ্ণব ধর্ম্মে যত, তত আর কোনও ধর্ম্মে আছে কি না, সন্দেহ। ভগবান্‌কে জগৎপিতা, ন্যায়ের অধিষ্ঠাতা, প্রেমের আধার, দয়ার সাগর বলিয়া যখন আমরা বর্ণনা করি, তখন তাহার মূলে এই মানবীয় দৃষ্টিই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা নিজেরা যাহা করি, যাহা করিতে ভালবাসি, ভগবানের প্রতি সেই সকল কর্ম্ম বা গুণের আরোপ করিবার

একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের মূলেই নিহিত আছে। বৈষ্ণবদিগের ধারণা—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত।

ভাগবতের এই শ্লোকটির শেষাংশ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ভগবদ্‌ভক্তির প্রেরণা যাহাতে সহজে অনুভব করা যায়, তাহারই জন্য লীলাপ্রাকট্য। "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।" ভগবান্ সেইরূপ লীলা করেন, যাহা শুনিলে জীব তাঁহার অভিমুখী হইতে পারে। তাহা নহিলে, আসলে ত কিছুই নহে। ব্রহ্মসূত্রেও আছে—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং।" ভক্ত জানেন, শ্রীরাধিকা ভগবানেরই আনন্দময়ী শক্তি। আমরা যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিয়া, নিজের রূপে নিজেই মোহিত হই, তিনিও তেমনি নিজের অনন্ত শক্তি নিজের মধ্যেই অনুভব করিয়া, অপরকেও তাহা উপভোগ করিতে শিখান। এই মূল তত্ত্বটি নানা রসের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

যীশু খৃষ্টের মধ্যেও আমরা এইরূপ ভক্তিপরিপ্লুত কল্পনার সুপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। সূত্রধরের পুত্রকে আমরা প্রথমে মেষপালকরূপে দেখি; তার পরে সেই করুণার ও ক্ষমার মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ভক্তির দর্পণে বর্দ্ধিত হইয়া—ঐশ্বর্য্যময়, মহিমময় হইয়া উঠেন। একজন লেখক সত্যই বলিয়াছেন,—

It is but as the fragment which dropping into a saturated solution attracts molecule after molecule until it grows into a large and lovely crystal which all eyes admire.*

যীশুর মাতার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ইতিহাস

* Laing's Problems of the Future.

আমাদিগকে মেরী মাতার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলে না। তিনি একজন সাধারণ ছুতোরের স্ত্রী, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র। খৃষ্টের জীবনের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না। কিন্তু এই খৃষ্টজননী কল্পনার শানযন্ত্রে পড়িয়া এমন এক মাতৃমূর্ত্তি বা ম্যাডোনায় পরিণত হইলেন, যাহাতে সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বাৎসল্য-রস মূর্ত্তিমান্ হইয়া দেখা দেয়। র‍্যাফেলের Madonna di San Sisto, Murillo's Immaculate Conception, Mozart's সঙ্গীত Ave Maria সূত্রধর-পত্নীকে যুগপৎ মানবত্ব ও অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। সেইরূপ বৈষ্ণব কবিদিগের রাগাত্মিকা ভক্তি রাধাকৃষ্ণের লীলাকে সখ্যের মধ্য দিয়া, দাম্পত্যের মধ্য দিয়া, মানবিরহের মধ্য দিয়া, সম্ভোগ-বিহারের মধ্য দিয়া যথেচ্ছ ভাবে লইয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব কবিত্বময়ী মাধুরীর সৃষ্টি করিয়াছে।

মানবিকতার আদর্শে ভগবানের লীলা অনুধ্যান করিবার এই বিপুল চেষ্টাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগতের সমস্ত ধর্ম্মমতের মূলেই মানবীয় ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। অজানাকে জানার মধ্য দিয়াই বুঝিতে হয়। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তবে কথা হইতে পারে যে, তাহারও ত একটা সীমা আছে। মানবের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ ভাব, তাহা ভগবানে আরোপ করিতে হয় কর, কিন্তু তাহাকে প্রেমের ব্যভিচারে লইয়া গিয়া দাঁড় করানো কোনও ক্রমেই অনুমত হইতে পারে না। বৈষ্ণব কবি এবং পুরাণকার এ কাজ করিলেন কেন? আমার নিজেরই এ বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনে হয়, তখনকার রুচি বোধ হয়, এই প্রকার ছিল। অথবা কোনও গুপ্ত ভজন-পদ্ধতি ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া হয় ত ইহাকে এইরূপে রূপান্তরিত

করিয়াছে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে এ দেশে নানা বীভৎস, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক আচার ধর্ম্মের নামে চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে অনেক অনাচার ও কুরুচি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়েও তাহার প্রভাব কমে নাই। পাষণ্ড, নাস্তিক, তর্কবাগীশের দল ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়াছিল। সুরা ও আসুর ভাবের তরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইতে চলিয়াছিল। তাহারই কি ছাপ বৈষ্ণবধর্ম্মে পড়িয়াছে? অনেকে এই মত পোষণ করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এই মতের কোনও ভিত্তি নাই। প্রেম ও করুণার দ্বারা যাঁহারা ভগবদারাধনাকে সরস ও স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিপক্ষবাদীদিগের—নাস্তিকদিগের মতের সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় যে অংশ, তাহাই অবিকল গ্রহণ করিয়া, স্বীয় ধর্ম্মমতকে ধ্বংসের পিচ্ছিল পন্থায় দাঁড় করাইবেন, এরূপ মনে করা সঙ্গত বোধ হয় না।

বৈষ্ণবের পদাবলীতে প্রেম-কবিতার ছড়াছড়ি। ইহা কি সহজিয়াদের পুনরাবৃত্তি? শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাঁহার সুসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—

"সহজ সাধনে পরকীয়া রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী উত্তম আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, আপনা-দিগকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অথবা তাঁহার অনুগত সখী-জ্ঞানে বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ বিবিধ রসলীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন।"

ইহাতে ত মনে হয় যে, সহজিয়ারা বৈষ্ণবধর্ম্মের লীলারস আপনাদের প্রয়োজনোপযোগী করিয়া, তাহার ব্যভিচার ঘটাইয়াছে। বৈষ্ণবেরা যে উহাদের নিকট ঋণী, সে কথা ত

বুঝা যায় না। তারপর সমস্ত পদাবলী-সাহিত্য হইতে এমন একটি কথাও বোধ হয় পাওয়া যায় না, যাহাতে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রাকৃত জনের অনুকরণীয়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কাহ্নুপাদ বা লুইপাদাচার্য্যের দোঁহাবলী ত অনেক পুরাতন। সুতরাং বৌদ্ধ-চর্য্যাপদ হইতে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে—বসন্তবাবু এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ধারণাও ইহারই অনুরূপ। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া এ কথা কথঞ্চিৎ সত্য হইলেও ভাবের দিক্ দিয়া ইহা একান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যে চর্য্যাপদ ও দোহাবলী প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে, উভয়ের মধ্যে জাতিগত ও প্রকৃতিগত সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধাচার্য্যগণ সন্ধ্যাভাষায় পদাবলী রচনা করিতেন। সন্ধ্যাভাষা এক বিচিত্র আলো-আঁধারে ভাষা। ইহার কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। যেমন চণ্ডীদাসের,—

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষ অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।

চতুর হইয়া ছুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে ॥

* * * *

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

ভূসুকুপাদের একটি পদের সহিত তুলনা করুন,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভূসু বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥
ডহি জো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ তরুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
ণিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

ইহার অর্থ (শাস্ত্রী মহাশয়কৃত অনুবাদ) এই,—বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুই সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলি, যেহেতু নিজ ঘরণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলি। তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায়

গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটী ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই।

এই ত চর্য্যাপদের কবিতার নমুনা। ইহার অর্থ কি, তাহা বুঝি না; যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা শ্রোতব্য নহে; এতই অশ্লীল। ইহার পার্শ্বে ঐ চণ্ডীদাসেরই একটি বৈষ্ণব কবিতা রক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রীরাধা বলিতেছেন,—

আমি ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
(মোরে) রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
আমি দাঁড়াইব কাহার কাছে॥
আমার এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আর মোর কেহ নাই।
আমি শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও রাঙ্গা কমল পায়॥

এই পদ কি সহজিয়া চণ্ডীদাসের রচনা? রজকিনীর সহিত যিনি সহজধর্ম্ম সাধনা করিয়াছিলেন, বাশুলী বা বৌদ্ধ বজ্রশুলী বা বিশালাক্ষী যাঁহাকে সহজ মত প্রচারে আদেশ করেন, যিনি বৌদ্ধদেবী নিত্যার আদেশে সহজ-ভজন যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি অবন্তীপুরে পড়ুয়ার অবস্থায় 'রসের নায়রি' দেখিয়া প্রেমে মজিয়া গেলেন, ইনি কি সেই চণ্ডীদাস, যাঁহার কবিতারস-মাধুরী আস্বাদনে ভক্তের শরীর কদম্ব-কেশরের মত কণ্টকিত হইয়া উঠে?

যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
পদ্য গদ্যময় গীত।

প্রভু মোর গৌর- চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত ॥
—বৈষ্ণবদাস কৃত মহাজন-বন্দনা

চণ্ডীদাসের সহজিয়া-অপবাদ 'প্রবাদের মতই চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাতে সন্দেহ নিঃক্ষেপ করিতে যাওয়া অসীম সাহসিকতার কার্য্য। তবে ইহাও নিঃসন্দেহ যে, অনেক-গুলি সহজিয়া পদ বাশুলীর কৃপায় "কলির ভূতের" মত* চণ্ডীদাসের স্কন্ধে চাপিয়াছে। কারণ, সে কবিতাগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাতে চণ্ডীদাসের কেন, তৃতীয় শ্রেণীর কবিত্বও নাই। চণ্ডীদাসের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অনেক জাল চণ্ডীদাস বঙ্গদেশে গজাইয়া উঠিয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে এক চণ্ডীদাসই সহজিয়া প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চণ্ডীদাস সম্বন্ধেই আবার অভিজ্ঞদিগেব মত যে, ইহাঁর কবিতায় কামলিপ্সার গন্ধ নাই। ইনিই কৃষ্ণ-প্রেমকে অনাবিল স্বচ্ছ ভক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু, জয়দেব ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।' দীনেশবাবু বলেন, "Chandidas sang in a still higher strain, unmistakably pointing out that the song of Radha Krishna had a symbolical significance for man's love for God."†

---

* চণ্ডীদাসের একটি পদের ভণিতায় আছে,—

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুন হে দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত ॥

† বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়ের ভূমিকা।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে ত সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। চণ্ডীদাসের চরিত্র আরও জটিল হইয়া পড়িল। এমন হইতে পারে যে, চণ্ডীদাস প্রকাশ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং গোপনে সহজিয়াদিগের ভজন-প্রণালীর অনুসরণ করিতেন। কর্ত্তাভজা, ঘোষপাড়া, কৌপীনছাড়া প্রভৃতি নানা গুপ্ত ভজন তখন দেশে প্রচলিত ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস কি নিজ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের জন্য এইরূপ এক ভজন-রীতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন? কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

তবে আমরা সমস্ত বৈষ্ণব কবির মধ্যেই এই দুইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন তত্ত্ব দেখিতে পাই। রসের মধ্য দিয়া, বিশেষতঃ মাধুর্য্যের দ্বার দিয়া ভগবানের উপলব্ধি এবং মানবীয় ভাবে ভগবানের রতি-বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর, সকল মাধুর্য্যের অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাঁহার প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান গুণ এই যে, তিনি সুন্দর, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র পাইয়া বিশ্ব-সংসার সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মধুরতার একটি ধারায় নিখিল জগতের যত আনন্দ, যত মধুরিমা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর বিন্দু রসে জগৎ ভাসে। শ্রুতি তাঁহাকেই "রসো বৈ সঃ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তিনিই শ্রুতির মধু, মধু, মধু। মধুর রস মধুরতম হইয়া উঠে—প্রেমে। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে ভক্তি, তাহাতে ভয় মিশ্রিত থাকে। সখার সঙ্গে সখার যে সৌহার্দ্দ, তাহাতে তন্ময়তা পূর্ণমাত্রায় হয় না। পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ নিম্নগামী। সমানে সমানে নহিলে রসের সামঞ্জস্য হয় না। সুতরাং মানব-হৃদয়ের মধুরতম বৃত্তি—প্রেম। প্রেমের ন্যায় সুন্দর, প্রেমের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী, প্রেমের ন্যায় আত্মপর ভেদ-রহিত বৃত্তি ত্রিজগতে নাই। আমরা ঈশ্বরকে

ভালবাসার কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু সে ভালবাসার স্বরূপ কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমরা মনে করি, জীবকে জীব যে প্রেম দিয়া ভালবাসে, তদতিরিক্ত কোনও প্রকার প্রেম বোধ হয় আছে, যাহা ভগবানে অর্পণ করা যায়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। প্রেমের রীতি একই প্রকার। যে প্রেম আমাদের আছে, যে প্রেমের সহিত আমরা সকলেই জীবনের এক শুভ সন্ধিক্ষণে পরিচিত হই, সেই প্রেমই প্রেম। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত, সেই প্রেম অর্পণ করিয়া ভজনা করেন। এখানে ভগবানের ভগবত্তা নাই। ভগবান্‌কে নিজের সমান জ্ঞান করিয়া, সেই সমতা-বুদ্ধি হইতে সখী বা গোপাঙ্গনা ভাবে ভালবাসিতে হয়। সখীগণ কৃষ্ণরাধিকার প্রেম দেখিয়া, তদ্‌গতচিত্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করেন; ইহাতে কামনা নাই, বাসনা নাই, লোকলজ্জা নাই, সংসার-বন্ধন নাই। এই অবিচল প্রেমের নাম ভক্তি। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

গ্রীক দার্শনিক ও ঋষি প্লেটো প্রেমের এমনই একটা আভাস পাইয়াছিলেন। "Symposium" গ্রন্থে তিনি সক্রেটিসের মুখ দিয়া প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ আবার ডাইওটিমা নামে একজন অপরিচিতা রমণীর নিকটে প্রেমের এই নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করেন। সেই রমণী বলিতেছেন যে, প্রেম, রূপ ও সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়, সৌন্দর্য্যের উপাসক প্রেম। প্রেম অসুন্দরকে, কুৎসিতকে ঘৃণা করে। সুন্দরের অন্বেষণেই প্রেমের জন্ম। প্রেম, রূপের ভিতর দিয়া অনন্তের আস্বাদন পায়, সেই জন্য প্রেম মানব-হৃদয়ের একটি চির অতৃপ্ত বৃত্তি। ইহা ক্রমাগতই রূপের সন্ধানে, গুণের সন্ধানে, মাধুর্য্যের আস্বাদনের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আনন্দ, মাধুর্য্য, রূপ, ইহা ত সীমাবদ্ধ জীবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া

যায় না। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

For he who has been instructed thus far in the things of love and who has learned to see the beautiful in due order and succession, when he comes toward the end will suddenly perceive a nature of wondrous beauty and this, Socrates, is that final cause of all our former toils, which in the first place is everlasting—not growing and decaying or waxing and waning but beauty only, absolute, separate, simple and ever lasting, which without diminution and without increase or any change, imparted to the ever-growing and perishing beauties of all other things. He who under the influence of true love is rising upward from these begins to see that beauty is not far from the end.

ইহাই বৈষ্ণব কবিতারও নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণবদিগের মত সক্রেটিস্ এই প্রেমের ব্যাখ্যায় স্ত্রীপুরুষ-মিলন-ঘটিত প্রেমের কথাও আনিয়াছেন। যে প্রেমে মৃত্যুময় জগতে অমরতার আস্বাদ আনিয়া দেয়, তাহা সখ্যে (friendship) এবং যৌন সম্মিলনে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। সন্তানলাভ-কামনা এই প্রেমেরই একটি অধ্যায়। সন্তানের দ্বারা দৈহিক অমরত্ব লাভ করা যায়—"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি।" সুতরাং যে প্রেম ভগবানে, absoluteএ, গিয়া পৌঁছে, তাহা স্ত্রীপুরুষের প্রেমেরই চরম অভিব্যক্তিমাত্র। প্লেটোর চিন্তাপ্রণালীতে রূপ এবং শিব একই পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং তিনি যাহাকে absolute beauty বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিকটে Highest good এবং তাহাই

Ultimate Truth. সুতরাং সত্য, শিব এবং রূপ অথবা সচ্চিদানন্দই প্রেমের আরাধ্য দেবতা। বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা রূপবান্, মাধুর্য্যময়, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈষ্ণব পদাবলীকে সাহিত্যের হিসাবে দেখিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া কঠিন হইবে। ইহা মেঘনাদবধ, বিদ্যাসুন্দর বা ফাল্গুনীর মত কাব্য নহে। ইহা তান লয় সহকারে গীত হইত বটে, কিন্তু ইহা যাত্রার পালা নহে, সাধারণের রুচি অনুসারে, জনসাধারণের করতালি লাভ করিবার জন্য রচিত হয় নাই। ইহা ন্যায়দর্শনও নহে। প্রকৃতি-পুরুষের লীলা বিবৃত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনপ্রশস্তিও ইহা নহে। ব্রহ্ম ও মায়ার বিবর্ত্ত দেখাইবার ভাণও ইহাতে নাই। ইহা সরল, ধর্ম্মপ্রাণ, ভক্তিপ্রণত হৃদয়ের সাধন মাত্র। অনুভূতির উপর ইহার ভিত্তি; প্রেম ইহার মন্ত্র; রূপ ইহার আধেয় এবং রসই ইহার সিদ্ধি। ইহা অন্য কোনও প্রকার সিদ্ধির কামনা করে না। "পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" জয়দেব কবি নমস্ক্রিয়া ব্যপদেশে যখন,—

শ্রিত-কমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল
জয় জয় দেব হরে।

বলিয়া গান ধরিয়াছিলেন, তখন তিনি রসিকতা করিতেছিলেন না।

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদি-দিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
ন্নানৈর্ম্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দ-সুন্দর-গলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে॥

বলিয়া জয়দেব যখন ইন্দ্রপ্রভৃতির মুকুটমণি-চুম্বিত-চরণ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন তিনি, শৃঙ্গার-রসোদ্দীপক—

"তালফলাদপি গুরুমতি সরসম্
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ ॥"

পদের দ্বারা তাঁহাকে পরিহাস করেন নাই। বিদ্যাপতি যখন গাহিলেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক ॥

তখন তিনি প্রেমের মধ্য দিয়া আরাধ্য দেবতার ধ্যান করিতেছিলেন নয় কি?

বৈষ্ণব কবিরা পদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব বা ব্যাখ্যাকে স্থান দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণকে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি ভাবে গোপীরা, প্রেমময় সখাভাবে রাখালেরা ভজনা করিতেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তারাও সেই ভাবে ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন। তবে পদের ভণিতায় তাঁহাদের ভক্তির ভাব কখনও কখনও ধরা পড়িয়া গিয়াছে,—

'চণ্ডীদাসে কয় বঁধুর পিরীতি জগৎ হইল সুখী।'
'চণ্ডীদাসে বলে লোকের বচনে কিবা সে করিতে পারে।

আপন সুখের মনের মানসে নিরবধি জপ তারে ॥'
'চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরীতি জগতে কি আর হয়।
এমন পীরিতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয় ॥'

জ্ঞানদাসেও এরূপ ভক্তিগদগদচিত্ত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়,—

'জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব ॥'
'জ্ঞানদাসের মন অনুখন ভাবই
রাধার পরাণ কানু।
'কোটি ইন্দু জিনি বয়ন মনোহর
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত ও রূপ অবিরত
ভাবিতে গত মোর কাল ॥'

গোবিন্দদাসের একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া আমি বিদায় লইব,—

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥
প্রেমে আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনীকান্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ মন্দিরে সান্ত ॥

* * *

কঞ্জলোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ-কিশলয়-নিলয় গোবিন্দদাস ॥*

* সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা।